প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : শিক্ষা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 02 : 1 & 2

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	ড. দীপেশ চন্দ্র নাথ	অধ্যাপক প্রণব কুমার চক্রবর্তী
পর্যায় 2	অধ্যাপক নৃসিংহ কুমার ভট্টাচার্য	অধ্যাপক প্রণব কুমার চক্রবর্তী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 02

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়—1

একক 1 □ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান 7-20

একক 2 □ শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ 21-40

একক 3 □ শিখন প্রক্রিয়া 41-62

একক 4 □ শিখনের সঞ্চালন 63-68

একক 5 □ স্মৃতি ও বিস্মৃতি 69-84

পর্যায়—2

একক 6 □ শিক্ষার্থীর বুদ্ধি 87-104

একক 7 □ শিক্ষার্থীর প্রেষণা 105-112

একক 8 □ শিক্ষার্থীর মনোযোগ 113-122

একক 9 □ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য 123-141

একক 10 □ ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা 142-152

পর্যায় — 2

গ্রন্থপঞ্জি (References)

১। Chauhan, S.S. (1997) – Advanced Educational Psychology

২। Gray, Peter (2002). Psychology. New York : Worth Publishers

৩। Hurlock, E.B. (1982). Developmental Psychology. New York : Mc Graw-Hill.

৪। Morgan, C.T., King, R.A., Weisz, J. R. and Schopler, J. (1997). Introduction to Psychology. New Delhi : Tata Mc Graw-Hill.

৫। Rao, S. N. (1990) – Educational Psychology.

৬। Sharma, R. N. and Sharma, R. K. (1996)–Advanced Educational Psychology.

৭। ঘোষ অরুণ—শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

৮। চট্টোপাধ্যায় প্রীতিভূষণ—মনোবিদ্যা

৯। রায় সুশীল—শিক্ষা মনোবিদ্যা

১০। সরকার নীহাররঞ্জন—মনোবিজ্ঞান ও জীবন

১১। সেনগুপ্ত প্রমোদবন্ধু, হালদার গৌরদাস এবং রায় ঋতেন্দ্রকুমার—শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান।

পুনরুৎপাদন বা প্রত্যাহ্বান করা যায়) সঙ্গে যুক্ত করবে পরবর্তী সময় তা পুনরুৎপাদন বা প্রত্যাহ্বান করার কালে **'এর'** যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। কোনো নতুন তথ্য শিখনকালে এটি যতবেশি তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারবে পরবর্তী সময়ে তা প্রত্যাহ্বান করা (retrieve) তত সহজ হবে। উল্টো ঘটনাটি ঘটলে তা ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

৫.৯.৪ অ্যাসুবেলের শিখন তত্ত্ব ও বিস্মৃতি

শিখনের আধুনিক তত্ত্বের মধ্যে অ্যাসুবেলের অর্থপূর্ণ মৌখিক বা ভাষাভিত্তিক শিখনের তত্ত্ব শিক্ষাবিদদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। তাঁর মতে অর্থপূর্ণ শিখন তখনই হয় যখন শিক্ষার্থী নতুন তথ্যকে তারা পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ, নতুন তথ্য যখন স্থায়ী স্মৃতিতে অবস্থিত একটি স্কিমার (schema) সঙ্গে যুক্ত করতে শিক্ষার্থী সক্ষম হয়, তখনই অর্থপূর্ণ শিখন হয়ে থাকে। যদি শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী এই কাজে ব্যয় হয়, তা হলে অর্থপূর্ণ শিখন হবে না। সে ক্ষেত্রে শিখন হবে যান্ত্রিক ও অর্থহীন শিখন। আর এই ধরনের যান্ত্রিক শিখন আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই। অর্থাৎ অর্থপূর্ণ শিখন না হলে তা প্রত্যাহ্বান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না দীর্ঘকাল বাদে, এমনকি স্বল্পসময়ের ব্যবধানেও।

প্রশ্নাবলী

১। স্মৃতি ও বিস্মৃতির সংজ্ঞা দাও। স্মৃতি উপাদানগুলি বিশদভাবে আলোচনা করো। (Define memory and forgetting. Critically discuss the factors of memory.)

২। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেলের সাহায্যে স্মৃতির ব্যাখ্যা করো। (Explain memory with the help of Information Processing Model.)

৩। বিস্মৃতির প্রচলিত কারণগুলির বর্ণনা দাও। (Describe the current causes of forgetting.)

৪। স্মৃতি ও সংগঠনের আন্তর্জাল মডেলটি ব্যাখ্যা করো। (Explain the Network model of memory organization.)

৫। মানসিক অনুষঙ্গ ও স্মৃতির পুনদ্রেকের সহায়ক সংকেত নিয়ে তুমি যা জান লেখো। (Write what you know about mental associations and memory retrieval cues.)

৬। বিস্মৃতির কারণ হিসাবে প্রতিবন্ধক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও। (Explain briefly the interference theory to account for the cause of forgetting.)

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ

(ক) সক্রিয় স্মৃতি (Working memory)

(খ) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)

(গ) ধৃতির মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (Psychological theory of retention)

(ঘ) ধৃতির শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Plysiological theory of retention)

(ঙ) স্পল্পস্থায়ী স্মৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (STM and LTM)

(চ) অ্যাসুবেলের শিখন তত্ত্ব ও বিস্মৃতি (Ausubel's learning theory and forgetting)

(concept) সঙ্গে যুক্ত এবং এই সাধারণ ধর্মের মাধ্যমে এদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত। এই মডেলটিকে বিস্তৃতি সক্রিয়কারক (spreadng-activation) মডেল বলা হয়। ধারণাগুলোর মধ্যে সাধারণ ধর্ম যত বেশি এবং দূরত্ব যত কম, তাদের একটি উপস্থাপিত করলে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘস্মৃতি থেকে অন্যান্য ধারণাগুলোর পুনরুৎপাদন বা প্রত্যাহ্বান তত সহজ। উল্টোটি হলে, ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা হবে প্রবল।

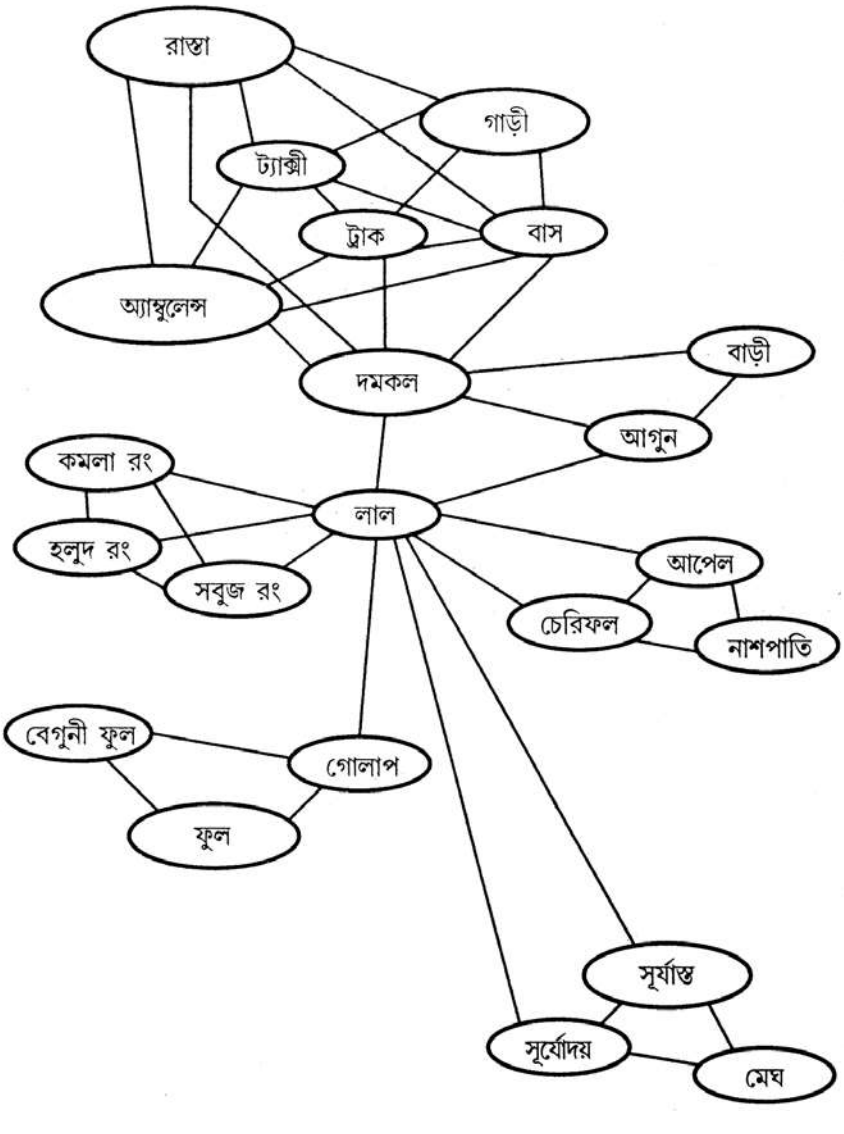

সংকেতায়নের সময় উপস্থিত ধারণাসমূহ পুনরুৎপাদন বা প্রত্যাহ্বানের সংকেত হিসাবে দারুণ কাজ করে (Concepts Present at Encoding Become Excellent Retrieval Cues)

কোনো নতুন **তথ্য** তুমি **'কীভাবে'** অন্যান্য তথ্য-জালের (যা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সঞ্চিত আছে এবং অতি সহজেই

in space) এবং কাল সান্নিধ্য (contiguity in time)।

যে সমস্ত অভিজ্ঞতা বা তথ্য স্থান বা কালের দিক দিয়ে সন্নিকট অবস্থায় অনুষঙ্গে আবব্ধ, ওই অভিজ্ঞতা বা তথ্যসমূহের একটা ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করলে এর সঙ্গে অনুষঙ্গে আবব্ধ আরও অনেক তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণে এসে যায়। যেমন, হাওড়া বললেই হাওড়া ব্রিজের কথা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে মনে এসে যায়। এটা স্থান বা দেশ সান্নিধ্যের জন্য। আবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বললে ১৯৪৭ সালের কথা মনে পড়ে যায়। এটা কাল সান্নিধ্যের জন্য।

কিন্তু শুধু সান্নিধ্য নীতি (Law of contiguity) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে এক তালিকা 'লাল' বস্তুর নাম কিংবা প্রারম্ভে 'A' আছে এমন একটি তালিকা বস্তু বা বিষয়ের নাম মনে করিয়ে দিতে পারে না। এর জন্য আরেকটি নীতি দরকার যা হচ্ছে সাদৃশ্যের মাধ্যমে অনুষঙ্গ (Association by similarity)। এই নীতির সার কথা হচ্ছে সদৃশ বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে কিছু সাধারণ ধর্ম (common properties) বর্তমান থাকে যা এই সদৃশ বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে একটা সংযোগ সৃষ্টি করে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে— বস্তু বা বিষয়সমূহ একই স্থানে (বা কাছাকাছি স্থানে) এবং একই সময়ে প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও। তুমি যদি আপেলের কথা ভাবো তা হলে হয়তো তোমার স্মৃতিতে ভেসে আসতে পারে দমকলের (Fire engine) কথা যদিও কোনদিন তুমি আপেল ও দমকল হয়তো একসাথে দেখোনি। এমনটি কেন হল? তার কারণ আপেল এবং দমকলের মধ্যে সাধারণ ধর্ম 'লাল রং' বর্তমান। অর্থাৎ রং-এর দিক দিয়ে দেখতে গেলে আপেল এবং দমকল সদৃশ্য।

৫.৯.৩ স্মৃতি সংগঠনের আন্তর্জাল মডেল (Network model of memory organization)

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সঞ্চিত তথ্য ভাণ্ডারে তথ্যের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত আকারে সংযুক্ত হয়ে আছে বলে জ্ঞানবাদী মনোবিদগণ (cognitive psychologists) মনে করেন। এই সংযুক্ত অবস্থাকে অনুষঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে অথবা অনুষঙ্গেরই নামান্তর। কিন্তু জ্ঞানবাদী মনোবিদগণ একে অনুষঙ্গ না বলে 'নির্দেশক' (Pointers) বলে অভিহিত করে থাকেন। অ্যালান কলিন্স এবং এলিজাবেথ লফ্‌টাস্ স্মৃতি সংগঠনের জালসদৃশ একটা মডেল উপস্থাপন করেছেন। এঁরা এই মডেলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন শব্দ উপস্থাপন করে ব্যক্তি তা তৎপরতার সঙ্গে অতিদ্রুত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে বিশেষ বিশেষ শব্দ স্মরণ করতে পারে তা দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন ব্যক্তির নিকট 'বাস' শব্দটি পূর্বে উপস্থাপন না করে যদি 'নাশপাতি' কিংবা লাল শব্দটি করা হয় তাহলে 'আপেল' শব্দটির প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) তার কাছে দ্রুততর হয়। কলিন্স ও লফ্‌টাস্-এর মতে দুটো শব্দ বা ধারণা অনুষঙ্গের মাধ্যমে যতবেশি মাত্রায় সংযুক্ত হবে, তাদের একটিকে মনে পড়লে অন্যটির মনে পড়ার সম্ভাবনাও তত দ্রুত হবে।

পূরের কলিন্স ও লফ্‌টাস-এর মডেলটি যথাসম্ভব ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর করে উপস্থাপন করা হল।

পরের মডেল-এ দুটো ধারণার (Concept) মধ্যে দূরত্ব যত কম, তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ-বন্ধন তত জোড়ালো। মডেলটি লক্ষ্য করো কেমন করে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্ম (common properties) এদের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরস্পর সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। গোলাপ, চেরিফল, আপেল এবং দমকল এদের প্রত্যেকেই 'লাল' এই ধারণাটির

তথ্য এটির পুনরুৎপাদনে (Retrieval) বাধার সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন বর্তমান ও অতীত তথ্যের উপস্থিতি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে (STM) তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে যেমন বাধার সৃষ্টি করে তেমনি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে (LTM) সংরক্ষিত তথ্যের পুনরুৎপাদনেও (retrieval) বাধার সৃষ্টি করে। ধরা যাক তুমি প্রথমে একটি বিদেশি ভাষা শিখেছ এবং তারপর আরেকটা। তা হলে দেখতে পাবে কারও সঙ্গে বাক্যালাপের সময় দ্বিতীয়বার শেখা ভাষাটির পরিবর্ত প্রথম বার শেখা ভাষাটি সুন্দরভাবে মনে করতে পারছ এবং তাতেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছ। প্রথমবার শেখা কোন তথ্য দ্বিতীয়বার শেখা কোন তথ্যকে যদি আংশিক বা পূর্ণ ভুলিয়ে দেয় তাকে আমরা বলে থাকি সম্মুখমুখী বাধা (proactive inhibition)। যদি উল্টোটি ঘটে অর্থাৎ দ্বিতীয় বার শেখা তথ্য প্রথমবারের শেখা তথ্যকে ভুলিয়ে দিলে তাকে আমরা বলে থাকি পশ্চাদ্মুখী বাধা (retroactive inhibition)।

পরীক্ষার উত্তর পত্রে কিছু লিখতে গিয়ে ভুলে যাওয়া ও পরে মনে করতে পারা কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোনো শব্দ বা তথ্য ভুলে যাওয়া ও পরে মনে করতে পারা পুনরুৎপাদনমূলক প্রত্যহ্বান মূলক ব্যর্থতা তত্ত্বের উদাহরণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রক্ষিত তথ্যাবলী আমরা সত্যিই কখনও 'ভুলে যাই না' কিন্তু মাঝে মাঝে যে কিছু কিছু তথ্যাবলী স্মরণ করতে পারি না অর্থাৎ পুনরুদ্রেক করতে পারি না তার কারণ হল কোনো কিছুর প্রতিবন্ধকতা (intereference) বা বিচলিত প্রাক্ষোভিক অবস্থা (emotional states)।

৫.৯.১ মানসিক অনুষঙ্গ ও স্মৃতির পুনরুদ্রেকের সহায়ক সংকেত (Mental associations and Memory retrieval cues)

তথ্যের পুনরুৎপাদনের জন্য এদের সুবিন্যাস প্রয়োজন। অভিধানের শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমিক সুবিন্যস্ত থাকার ফলে যে কোন শব্দ তথা তথ্য অতি সহজেই পুনরুৎপাদন অর্থাৎ বার করা যায়। অভিধানে যে সমস্ত শব্দের প্রারম্ভে 'A' অক্ষরটি আছে তাদের প্রত্যেকটিকেই বার করা সহজ কিন্তু অভিধান থেকে প্রত্যেক ফলের নাম বার করা সহজ নয়। কিন্তু বড়ো বড়ো বাজারে পণ্যদ্রব্য সুসজ্জিত থাকে অন্যভাবে। সেখানে প্রত্যেকটি ফল খুঁজে বার করা সহজ কিন্তু 'A' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন প্রত্যেকটি আইটেম বার করা শক্ত। এই ব্যাপারটাকে আমরা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে (LTM) রক্ষিত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যদি তোমাকে বলা হয় 'A' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন কতকগুলো জিনিসের নাম বল, তুমি অতি সহজেই একের পর এক অনেক জিনিসের নাম মনে করতে পারবে। যদি তোমাকে বলা হয় কতকগুলোর ফলের নাম বল, তাও অতি সহজেই অনর্গল বলে যেতে পারবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য (category) দীর্ঘস্মৃতি থেকে উপযুক্ত তথ্যসমূহ স্মরণে পুনরুৎপাদন সহায়ক সংকেত (retrieval cues) হিসাবে কাজ করে। মানুষ দীর্ঘস্মৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কীভাবে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ সুবিন্যস্থ অবস্থায় সেখানে রাখা হয়। তথ্য যত সুবিন্যস্ত অবস্থায় ব্যক্তি দীর্ঘস্মৃতিতে ধরে রাখবে স্মরণক্রিয়াও তত সহজ হবে। অন্যথায় ভুল হবে বেশি।

৫.৯.২ পুনরুৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে মানসিক অনুষঙ্গ (Mental associations as bases for retrieval)

মানসিক অনুষঙ্গ দুই প্রকার। যথা—সান্নিধ্যের মাধ্যমে অনুষঙ্গ (Associations by contiguity) এবং সাদৃশ্যের মাধ্যমে অনুষঙ্গ (Associations by similarity)। সান্নিধ্য অনুষঙ্গ আবার দুই প্রকার। যথা—স্থান সান্নিধ্য (contiguity

হয়, সেই বিষয়বস্তু ভুলতেও অনেক বেশি সময় লাগে অর্থাৎ বিস্মৃতির হার কম। এর কারণ হিসাবে বলা যায় এখানে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বিস্মৃতিকে প্রভাবিত করে। যে জিনিস শিখতে দেরি হয় তাতে পুনরাবৃত্তির বেশি প্রয়োজন হয় বলেই তা ভুলতেও দেরি হয়।

(২) ঠিকঠাক ভাবে না শেখা— যে সব বিষয় শিখনে এটা থাকে বা শিখনের সময় যে সব বিষয়ে বোধগম্যতার অভাব থাকে সেগুলো আমরা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ভুলে যাই।

(৩) মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে চৈতন্যলোপ (shock amnesia)—আমাদের স্মৃতি নির্ভরশীল মস্তিষ্কের কাজের উপর। ফলে মস্তিষ্কে খুব আঘাত পেলে অনেক সময় আমাদের ধারণক্ষমতার (retention) অবলুপ্তি ঘটে ও ফলে ভুলে যাই। যেমন ধরা যাক কোনো ছেলে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মাথায় খুব চোট পেল এবং অচৈতন্য হয়ে গেল। শুশ্রুষার পর ছেলেটির চৈতন্য ফিরে এলে দেখা যাবে খেলার সম্বন্ধে জিগ্যেস করলে সে কিছু বলতে পারছে না। শক্ অ্যামনেশিয়া অবশ্য খুব আগের ঘটনাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য এরকম দুর্ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে স্মৃতি একেবারে লোপ পেয়েও যেতে পারে।

(৪) ওষুধের প্রতিক্রিয়া—অনেক সময় খুব বেশি উত্তেজক ওষুধ খেলে কিংবা মদ্যপান করলে বিস্মৃতি ঘটে; মানুষ অনেক জিনিস তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। যে সব ওষুধ মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোকে খারাপ করে দেয়, সেগুলো আমাদের বিস্মৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৫) ইনিহিবিসান বা বাধা (inhibition) —কোনো কিছু শেখার পর অন্য কোন কিছু শিখলে পরের শিখন বিষয়টি প্রথম শিখনের অনেক বিষয় ভুলিয়ে দেয়। একে ইংরেজিতে retroactive inhibition এবং বাংলায় বলা যায় পশ্চাদ্মুখী বাধা। আবার এর উল্টোটিও ঘটে। প্রথম শিখনের বিষয় পরের শেখা বিষয়ের অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়। একে ইংরেজিতে বলে Proactive inhibition এবং বাংলায় বলা যেতে পারে সম্মুখমুখী বাধা।

(৬) দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজের প্রভাব—দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজ অন্য কাজের মনে রাখায় ব্যাঘাত ঘটায়।

(৭) অবসাদ—মানসিক অবসাদের ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ঠিক মতো মনে রাখতে পারি না।

(৮) অবদমন (repression)—ফ্রয়েডের মতে 'আমরা মনে রাখতে চাই না' এমন অনেক অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু অবদমিত হয়ে মনের অবচেতন স্তরে চলে যায়। অবশ্য মনঃ সমীক্ষণের (psychoanalysis) দ্বারা মনের অবচেতন স্তরে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া অনেক বিষয়কে চেতনস্তরে অর্থাৎ স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়।

৫.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক মতবাদের ভিত্তিতে বিস্মৃতির স্বরূপ (Nature of forgetting according to information processing and other cognitive views)

বিস্মৃতির স্বরূপ বা আমরা কেন ভুলে যাই তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটি মতবাদ স্মরণের ভিন্ন ভিন্ন স্তর কিংবা তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের বিশেষ একটি দিকের উপর আলোকপাত করেছে।

প্রতিবন্ধক তত্ত্ব (Interference Theory) অনুযায়ী, আমরা যে কোন কিছু তথ্য ভুলে যাই তার কারণ অন্য কোন

(২) অনেক সময় আমরা অল্পস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডার থেকেও তথ্য প্রত্যাহ্বান করে থাকি। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে তথ্য খুঁজে বার করার উদাহরণ হল অল্পক্ষণ পূর্বে প্রাপ্ত বা অব্যবহিত অতীতের তথ্য খুঁজে বার করা। এসব তথ্য স্বল্পকালীন স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা থাকে এবং চাক্ষুষ প্রতিরূপের মাধ্যমে বা শাব্দিক প্রতিরূপের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে এগুলি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা হতে পারে। তথ্যসমূহ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারের কোন স্থানে তা অনুসন্ধান করার নামই হল 'স্মৃতির স্কানিং করা' বা মেমোরি স্ক্যান (Memory Scan)।

(৩) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে তথ্য প্রত্যাহ্বান করা হয় দুই পর্যায়ে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমে কতকগুলি অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যকে বাদ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অল্পসংখ্যক এবং আরো নির্দিষ্ট কতকগুলি তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়।

সক্রিয় স্মৃতি (Working Memory)—অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারকে বলা হয় সক্রিয় স্মৃতি। কারণ এই ভাণ্ডারে সংবেদী স্নায়ুপথের মাধ্যমে আগত তথ্য রাশিকে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরে রাখা হয়, আবার দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকেও তথ্যকে এখানে এনে প্রত্যহ্বান কার হয়। স্বল্পস্থায়ী সব সময়ই সক্রিয় থাকে। বাইরে থেকে আগত তথ্যকে এখানে সংকেতায়ন ও সঞ্চয় করার জন্য অল্পক্ষণের জন্য ধরে রাখা হয়। আবার দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে কোনো তথ্যকে এখানে প্রত্যাহ্বান করে কার্যকরী করা হয়। মনে করা যাক, আমার বন্ধুর ঠিকানা আমাকে স্মরণ করতে হচ্ছে। এখন দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে উক্ত ঠিকানাটি আহ্বান করে আমি অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে নিয়ে এসেছি, অর্থাৎ উক্ত ঠিকানাটি এখন সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এবং আমি এটিকে মানসিক প্রতিরূপের মাধ্যমে স্ক্যান করতে পারি। প্রতিক্রিয়ার সূচি নির্ধারণ (Response Programming) তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার সর্বশেষ ধারা হল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। এটা হল সক্রিয় স্মৃতির সঙ্গে একটি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ স্থাপন। প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন, একটি শব্দ উচ্চারণ অথবা একটি বোতামে চাপ দেওয়া, অথবা শল্য চিকিৎসকের ছবি চালিয়ে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপাচারের মতন একটি জটিল প্রক্রিয়া।

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তীস্থানে একটি প্রতিক্রিয়া উৎপন্নকারী ব্যবস্থার (Response Generator) কল্পনা করা হয়েছে। এ ধরণের একটি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বা ফিডব্যাক (Feedback) অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে আমরা প্রায়শ ভুল করি সেহেতু মনে হয়, অনেকগুলি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে একটি শুদ্ধ প্রক্রিয়াকে নির্বাচন করা হয়। এই শুদ্ধ প্রতিক্রিয়া নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সম্পর্কিত জ্ঞান বা ফিডব্যাক (feed back) ব্যবস্থা আমাদেরকে সাহায্য করে।

৫.৭ বিস্মৃতির কারণ (Couses of Forgetting)

এটা আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা যে সব কিছু সব সময় আমরা মনে রাখতে অর্থাৎ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি না। এর মানে আমরা অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় ভুলে যাই। এই ভুলে যাওয়ার পেছনে অনেক কারণ বর্তমান। নিম্নে এই ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতির কয়েকটি বিশেষ কারণ আলোচনা করা হল।

(১) অধীত বস্তুর গুণ— যে সব বিষয়বস্তু শিখতে আমাদের দেরি হয়, তাদের ভুলিও সহজে। গদ্য আমরা কবিতার চেয়ে বেশি হারে ভুলি। বিষয়বস্তুর অর্থ ছন্দ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ব্যাপারটি ঘটে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনা ঘটতেও দেখা যায়। কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, যে বিষয়বস্তু শিখতে বেশি সময়ের প্রয়োজন

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control System)। সংবেদী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে অল্পস্থায়ী ভাণ্ডারে প্রেরণ করতে হলে প্রত্যেকটি তথ্যকে অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চিত পূর্ববর্তী তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। এভাবে মিলিয়ে দেখার ফলে আগত তথ্যসমূহের অর্থবোধ হয়। অর্থাৎ যখন সংবেদী তথ্যকে অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হয় তখন সংবেদী তথ্যটির একটি অর্থবোধ হয়। যেমন কয়েকটি লাইনকে একটি অর্থপূর্ণ অক্ষর হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্যাটার্ন পরিচিতি হল এমন একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যার সাহায্যে সংবেদী তথ্যসমূহের অর্থবোধ হয় এবং অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করার উপযোগী করা হয়।

অল্পস্থায়ী স্মৃতির দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি হল মনোযোগ (Attention)। মনোযোগের কাজ হল সংবেদী স্নায়ুপথে আগত অসংখ্য তথ্যের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে ছেঁকে নেওয়া। আমরা প্রতি মুহূর্তে সংবেদী স্মৃতিতে যে অসংখ্য তথ্য লাভ করছি ‘মনোযোগ’ সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করছে। মনোযোগ শুধুমাত্র নির্ধারিত কতকগুলি তথ্যকে অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করছে। অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে কিছু তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হয়। আবার অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে কিছু তথ্য প্রত্যাহ্বান (Retrieve) করে অল্পস্থায়ী স্মৃতিতে নিয়ে আসা হয় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য।

অল্পস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব সংবেদী স্মৃতির চেয়ে কিছুটা বেশি হলেও, মোটামুটি সীমিত। আমরা জানি যে একজন ব্যক্তি একবার মাত্র দেখে বা শুনে ৫-৯টির বেশি তথ্য মনে রাখতে পারে না। এটাই তার অল্পস্থায়ী স্মৃতির পরিসর (Span of Memory)। বার বার পুনরাবৃত্তি করা হলে অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার তথ্যসমূহকে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাখা সম্ভব। তবে পুনরাবৃত্তির সাহায্যে এর স্থায়িত্ব না বাড়ালে ২০ সেকেন্ডের বেশি এখানে তথ্য ধরে রাখা যায় না। এখান থেকে তথ্যসমূহকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব প্রায় অসীম।

৫.৭.২.২ প্রত্যাহ্বান (Retrieval)

প্রত্যাহ্বান হল তথ্যের পুনরুদ্রেক (Reproduction or Recall)। আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে যে অসংখ্য তথ্য জমা হয়ে আছে তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। স্মরণ ক্রিয়ার আমরা এই বিপুল তথ্য ভাণ্ডার থেকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ প্রত্যাহ্বান করি। সবগুলি স্মৃতি ভাণ্ডার থেকেই তথ্য রিট্রিভ করা হয়। রিট্রিভ করার অর্থ হল স্মৃতি ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তথ্য খোঁজা এবং এসব তথ্যের অবস্থা নির্ণয় করা। প্রত্যাহ্বান প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম ধাপ হল স্মৃতির ভাণ্ডারে প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্য থেকে প্রয়োজীনীয় তথ্যটি খুঁজে বার করা। এটা অনেক ক্ষেত্রেই খুব তাৎক্ষণিক ও সরাসরি প্রক্রিয়া। যেমন, আমরা কোনো অনুষ্ঠানে একজন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সুতরাং অনুষ্ঠানে কথাবার্তা বলার সময় আমরা উক্ত ব্যক্তির নামটি বার বার ব্যবহার করার জন্য অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করি যাতে তার নামটি আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে স্মৃতিপটে উদয় হতে পারে। কিন্তু অনেক তথ্য আমরা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করি, তখন সেগুলিকে প্রয়োজনে খুঁজে পেতে বেশ দেরি হয়। স্মৃতির তিনটি ভাণ্ডার থেকে আমরা তথ্য প্রত্যাহ্বান করে থাকি ঃ

(১) সংবেদী তথ্য ভাণ্ডার থেকে সরাসরি তথ্য খুঁজে বের করা হয়। যেমন, আমরা একটা দৃশ্য দেখছি বা একটা শব্দ শুনেছি। এখন যাতে এই দৃশ্য বা শব্দটির স্মৃতি হারিয়ে না যায় বা মুছে না যায় তার জন্য আমরা দৃশ্যটিকে স্ক্যানিং করি (Scanning) বা শব্দটিকে বার বার আবৃত্তি করি। Averbach বলেছেন যে, কতকগুলি অক্ষর একত্র সারি বেধে উপস্থিত করা হয় বলে সেগুলি আমরা খুব দ্রুত গতিতে স্ক্যানিং করি (প্রতি অক্ষরের জন্য ১০ মিলি সেকেন্ড)।

(১) এককোডিং বা সংকেতায়ন (Encoding),

(২) স্টোরেজ বা সংরক্ষণ (Storage) এবং

(৩) রিট্রিভ্যাল বা প্রত্যাহ্বান (Retrieval)।

Input → Encoding → Storage → Retrieval/Decoding → Output/Response

এনকোডিং বা সংকেতায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা বাইরের উদ্দীপক বা প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে কোন সংবাদ বা তথ্যকে স্মৃতিতে সঞ্চিত করে রাখার উপযোগী করে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন আমরা যখন ক্লাশে কোনো বক্তৃতা শুনি তখন বক্তৃতার সবগুলি কথা মনে না করে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাগুলি বা বক্তৃতার সারমর্ম গ্রহণ করি, অন্যগুলি বর্জন করি। এটাই সংকেতায়ন প্রক্রিয়া। স্টোরেজ বা সংরক্ষণ হল দীর্ঘদিন যাবৎ তথ্যসমূহকে সংরক্ষণ করা। তবে এভাবে সংরক্ষণের জন্য তথ্যসমূহকে কোনো প্রতিরূপের (sensory image) মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। প্রত্যাহ্বান (retrieval) হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তথ্য অনুসন্ধান করে বা খুঁজে আনি এবং পুনরায় ব্যবহার করি।

সংকেতায়ন (Encoding) — অল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ভাণ্ডারে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোন তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য সংবেদী তথ্য সমূহকে (input) বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এসব প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল সংকেতায়ন। সংকেতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এখানে বাহ্যিক জগৎ থেকে আগত তথ্যসমূহকে (input) শ্রেণিবিভাগ করা হয়, নির্বাচন করা হয়, কোন কোন সময় একটা ভাষাগত 'লেবেল' দেওয়া হল, কোন কোন সময় আগত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা হয়। সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করার জন্য আগত তথ্যসমহূকে সংকেতায়ন করা অত্যন্ত কার্যকরী ও পরিশ্রম-লাঘবকারী প্রক্রিয়া। সংকেতায়নে বিভিন্ন ধরনের সংকেত (code) ব্যবহার করা হয়। যেমন, বস্তুর শারীরিক প্রতিরূপ (Physical Image), ভাষাগত নাম প্রতিরূপ (Verbal Name Codes), সাংকেতিক প্রতিরূপ (Symbolic Codes), গতি সম্পর্কিত (Motor codes) প্রতিরূপ ইত্যাদি।

৫.৭.২.১ সংরক্ষণ (Storage)

স্মৃতির সংগঠনের তিনটি পর্যায়েই অর্থাৎ সংবেদী তথ্য ভাণ্ডার, অল্পস্থায়ী স্মৃতি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি এইগুলির সব পর্যায়েই তথ্য সংরক্ষিত হতে পারে।

সংবেদী তথ্য ভাণ্ডারে বাইরের জগৎ থেকে আগত তথ্যসমূহ ক্ষণকালের জন্য জমা থাকে। কোন উদ্দীপক সংবেদী কোষে (Afferent Nerve Cell) আঘাত করলে তা একটি স্নায়ু প্রবাহে রূপান্তরিত হয় (Transduction)। স্নায়ুপ্রবাহের এই উত্তেজনা এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য সংবেদী স্নায়ুকোষে বর্তমান থাকে। সেজন্য সংবেদী স্মৃতি ভাণ্ডার (Sensory Memory) খুবই স্বল্পস্থায়ী এবং এর ধারণ ক্ষমতাও সীমিত। একসঙ্গে ৪/৫টির বেশি তথ্য ধারণ করতে পারে না। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, সংবেদী তথ্য ভাণ্ডারে তথ্যগুলি যেভাবে আসে ঠিক তেমনি ভাবেই জমা থাকে। কিন্তু অল্পস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারের উপস্থিত হওয়ার পর তথ্যসমূহকে আরেক দফা প্রতিক্রিয়াজাত করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াজাত করণে দুটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করে—(১) প্যাটার্ন পরিচিতি (Pattern Recognition) এবং (২) মনোযোগ।

প্যাটার্ন পরিচিতি হলে সংবেদী স্মৃতি ভাণ্ডার (Sensory Memory) এবং অল্পস্থায়ী স্মৃতি ব্যবহার মধ্যবর্তী একটি

মন্দগতিতে ঘটে এবং পরিণামে আর ঘটেনা কিংবা নগণ্য হারে ও গতিতে ঘটে। এবিংহাউস্-এর মতে শিখনের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং একমাসে শিক্ষালব্ধ বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের বিস্মৃতি ঘটে।

৫.৭ স্মৃতির তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model of Memory)

স্মৃতির এই মডেলটির ভিত্তি হল তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ তত্ত্ব (Information Processing Theory)। তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী স্মৃতিকে সাধারণত দুটি প্রধানত উপাদানে ভাগ করা হয় ঃ (১) স্মৃতির সংগঠন (Memory Structure) এবং (২) স্মৃতির প্রক্রিয়া (Memory Process)। স্মৃতির কাঠামো বা সংগঠন হল মানুষের স্মৃতির স্থায়ী অংশ, যার সীমার মধ্যে স্মৃতির প্রক্রিয়াগুলি কাজ করে।

৫.৭.১ স্মৃতির সংগঠন (Memory Structure)

স্মৃতির সংগঠনকে কয়েকটি ভাণ্ডার বা উপাদানে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) সংবেদী তথ্য ভাণ্ডার (Sensory Information Store)

(খ) অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার (Short Term Memory)

(গ) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার (Long Term Memory)

সংবেদী তথ্য ভাণ্ডার—মানুষের স্মৃতির প্রথম পর্যায় হল সংবেদী তথ্য ভাণ্ডার। এটা হল এমন ব্যবস্থা (system) যা বাহ্যিক উদ্দীপক সমূহের সংবেদী প্রতিরূপ (sensory) সমূহকে অতি অল্পক্ষণের জন্য ধরে রাখে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পথ (sensory channels) সমূহই এইসব তথ্য ধরে রাখে।

অল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার—তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ার এটি হল কেন্দ্রস্থল। এটিকে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সমূহের একটি সংযোগস্থলও বলা চলে। সংবেদী-ভাণ্ডার থেকে তথ্য সমূহকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রাখার উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডারে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার থেকে তথ্য সমূহকে এখানে প্রত্যাহ্বান করে এনে নতুন তথ্যের সঙ্গে খেলানো (interact) হল; তাছাড়া তথ্য সমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে এখানে সঞ্চিত করে রাখা হয়। এই ভাণ্ডারের ধারণক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডারের তথ্য সমূহ সংগঠিত ও প্রক্রিয়াজাত হয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য সঞ্চিত থাকে। এই ভাণ্ডারের তথ্য ধারণ ক্ষমতা অসীম। এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত তথ্য সমূহের কিছু সংখ্যক অল্প প্রচেষ্টাতেই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে ফেরত আনা যায় এবং প্রত্যাহ্বান করা যায়। যেমন, আমার পিতামাতার নাম আমি যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাহ্বান করতে পারি, কিন্তু আমার ছোটোবেলার নাম শুধুমাত্র বিশেষ শর্তাবলীর উপস্থিতিতে প্রত্যাহ্বান করতে পারি।

৫.৭.২ স্মৃতির প্রক্রিয়া (Memory Process)

স্মৃতির প্রক্রিয়াকে তিনটি মৌলিক প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত বলে মনে করা হয়।

অনুসারে মনে করিয়ে দেয়, সেই নিয়মসূত্রকে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ সূত্র বলে। যেমন বামন বা খর্বকায় লোক দেখে বিরাটবপু লোকের কথা মনে পড়ে কিংবা অসমতল পার্বত্যপথে চলতে চলতে সমতলভূমির কথা মনে উদিত হয়, কারণ এদের একটি অপরের বিপরীত।

৫.৬ বিস্মৃতির ধারণা (Concept of forgetting)

সারা জীবন ধরে যা প্রত্যক্ষ করি বা শিখি তার সবকিছু আমাদের মনে থাকে না। কিছু শেখার পর বা প্রত্যক্ষ করার পর যত সময় যেতে থাকে বা আমরা যত নতুন বিষয় শিখতে থাকি কিংবা প্রত্যক্ষ করতে থাকি, তখন পূর্বের শেখা বা প্রত্যক্ষ করা বিষয়গুলির আর সবকিছু মনে থাকে না। একে আমরা বলি ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃতি (forgetting)।

সাধারণত স্মৃতিশক্তিকে সম্পদ এবং বিস্মৃতিকে আপদ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। স্মৃতির মতো বিস্মৃতিও মানসজীবনে প্রয়োজনীয়। প্রথমত সঠিক বা প্রাসঙ্গিক স্মৃতি সম্ভব হয়। অনেক অনাবশ্যক বিষয় ভুলের মাধ্যমে। যখন যেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু মনে করতে হলে, জ্ঞাতবিষয়ের নিষ্প্রয়োজনীয় অংশটুকু ভুলে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত বিস্মৃতি মানবজীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। পরমাত্মীয়ের মর্মান্তিক শোক কিংবা কোনো অপমান বা ক্ষতির অসহনীয় বেদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিস্মৃতির সুকোমল স্পর্শে। তৃতীয়ত বিস্মৃতি নতুন স্মৃতিকে সাহায্য করে, মনের সঞ্চিত অবাঞ্ছিত আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে।

কিন্তু বিস্মৃতির উপরিউক্ত তিন প্রকার গুণ সত্ত্বেও, এটি যে অনেক সময় মানসজীবনের অন্তরায়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলে যাওয়া দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলে যাওয়া ক্ষতিকর।

তাই বিস্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কিছু প্রতিকারের প্রয়োজন। এই প্রতিকারার্থে নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) একটি জ্ঞাত বিষয় যাতে অপর জ্ঞাত বিষয়কে ব্যাহত না করে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

(২) স্মৃতির পারস্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রয়েছে একটি স্মৃতিরেখা মনে বদ্ধমূল না হতেই, অন্য স্মৃতিরেখা দ্বারা মনকে প্রভাবিত করা। সুতরাং একটি স্মৃতিরেখাকে মনে বদ্ধমূলভাবে বসে যাবার সুযোগ দিতে হলে, এর পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

(৩) অনভ্যাসজনিত স্মৃতিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হলে, অর্জিত বা জ্ঞাত বিষয়ের পুনরনুশীলন দরকার।

(৪) বেদনা-দায়ক অভিজ্ঞতার বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পেতে হলে, এটি কেন বেদনাদায়ক তা বুঝবার অভ্যাস করতে হয়। এই কারণ বুঝতে পারলে, এটি অবদমিত বা বিস্মৃতি হবে না।

(৫) জ্ঞাত বিষয়টি ভাষা বা বাচিক অনুষঙ্গের (association) সাহায্যে জ্ঞাত হলে, এটির বিস্মৃতি ঘটবে না।

(৬) সর্বোপরি জ্ঞাত বা অর্জিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে মনে রাখতে হলে, এটির অতিরিক্ত শিখন (overlearning) দরকার।

বিস্মৃতির হার প্রসঙ্গে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বলা যায়, শিখনের অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশি মাত্রায় বা হারে এবং খুব শীঘ্র ঘটে, কালক্রমে এটি অল্প হারে এবং

উপস্থিত হলেই, এই প্রবণতা সক্রিয় পুনরুৎপাদনে পরিণত হয়। এই মতবাদকে অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তনবাদ (theory of subconcious mental modification) বলে।

৫.৫ পুনরুৎদ্রেকের বিশ্লেষণ (Analysis of Recall)

স্মৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়েরই সংরক্ষণই নয়, কার্যকালে সংরক্ষিত বিষয়ের ব্যবহারও বটে। মনের কথা মনেই থেকে গেলে, একে পুনরুদ্রেক করে মনে না করলে, স্মৃতি কার্যকর হয় না। কিন্তু অসংখ্য পূর্বজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ের ছাপ বা প্রতিরূপই তো মনে রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অসংখ্য সংরক্ষিত প্রতিরূপ তো একই সময়ে মনে করবার দরকার হয় না।

বিশাল সংরক্ষণ ভাণ্ডার থেকে যখন যতটুকু 'মনে করা' বা পুনরুৎপাদন করা দরকার, ঠিক ততটুকুর পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে প্রয়োজন।

পুনরুৎদ্রেক বা 'মনে করা' কতকগুলো নিয়মসূত্রে গ্রথিত বা নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো যে সম্বন্ধে সম্বন্ধ, এই নিয়মগুলো অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠ শিখনকালে 'রাত পোহালো ফর্সা হলো' ছত্রটির শব্দগুলোকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় অভ্যাস করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে অপর শব্দের পূর্বাপর সম্বন্ধ রয়েছে। সংরক্ষিত অবস্থায়ও এদের প্রতিরূপগুলো এদের বাস্তব সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে। ফলে একটি শব্দের প্রতিরূপ মনে আসলেই পরবর্তী শব্দগুলোর প্রতিরূপ মনে উদিত হয় এবং এই পূর্বাপরক্রমে পুনরুৎপাদন চলতে থাকে। সম্বন্ধ, এবং পূর্বাপর ক্রমে পুনরুৎপন্ন হয়, সেই নিয়মকে অনুষঙ্গ নিয়ম বা অনুষঙ্গ-সূত্র (Law of association) বলা হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্রধানত তিন প্রকার অনুষঙ্গসূত্র স্বীকৃত হয়েছে, যথা সান্নিধ্যসূত্র, সাদৃশ্যসূত্র এবং বৈপরীত্য সূত্র।

(১) পূর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু বা বিষয় দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরা জ্ঞাত হয়েছিল, এদের প্রতিরূপগুলো সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্রে সমন্ধ হয়। যেমন অতীত শিখনে 'রাত পোহালো' অংশের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরূপে 'ফর্সা হলো' অংশটি পঠিত হয়েছিল। এই শব্দগুলো দেশ এবং কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পর নিকটবর্তী, এদের প্রতিরূপগুলোও তেমন অনুযক্ত হয়। সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্র বলতে বোঝায় পরস্পর নিকটবর্তী প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যার ফলে এদের একটি মনে পড়লে, আর একটিও মনে পড়ে যায়।

বলা বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানের অনুষঙ্গ বলতে বস্তুর বা বিষয়ের সঙ্গে বস্তুর বা বিষয়ের সম্বন্ধ বোঝায় না। প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাত বস্তুর বা বিষয়ের সম্বন্ধ অনুযায়ী এদের প্রতিরূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাকেই বলা হয় মনোবিজ্ঞানিক অনুষঙ্গ।

(২) সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ (Association by Similarity) দুই বা ততোধিক বস্তুর একটি অপরটির সদৃশ বলে জ্ঞাত হলে এদের প্রতিরূপগুলোও পরস্পর সদৃশ বলে যে সম্বন্ধ অনুষঙ্গ হয়, একে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ বলে। যেমন যদু এবং মধু দুটি যমজ ভাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলে জ্ঞাত হওয়ায়, পরবর্তীকালে একজনকে দেখলে বা স্মরণ করলেই, আর একজনের কথা মনে পড়ে।

(৩) বৈপরীত্য অনুষঙ্গ (Association by constrast) বস্তু বা এর প্রতিরূপ বিপরীত বস্তু বা এর প্রতিরূপকে যে নিয়ম

সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন এই যে, পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ কী প্রকারে বা কোথায় সংরক্ষিত হয়। এটি কি মানসিক বা শারীরিক ব্যাপার? কিংবা এটি কি মনেরই এক প্রকার বিকার বা পরিবর্তন অথবা স্নায়ুতন্ত্রের এবং বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কেরই বিকার বা পরিবর্তন?

(১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Physiological Theory) শারীরবৃত্তীয় মতে ধৃতি স্নায়ুতন্ত্রের এবং গুরুমস্তিষ্কের বিকার বা পরিবর্তন বিশেষ। এই মতটি সুয়েন্‌স্টারবার্গ, জ্যাস্ট্রো, কার্পেন্টার, মিল্, লুইস, জেম্‌স, ওয়াট্‌সন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ সমর্থন করেছেন। শারীরবৃত্তীয় মতো প্রধানত তিন শ্রেণির, যথা, মিল্ কার্পেণ্টার প্রভৃতির, জেম্‌স্ প্রভৃতির এবং ওয়াট্‌সন প্রভৃতির।

(ক) মিল্, কার্পেন্টার্ প্রভৃতির মতে সংরক্ষণ এক প্রকার অচেতন গুরুমস্তিষ্কীয় (cerebral) প্রক্রিয়া বা কম্পন (vibration) বিশেষ। এঁরা মনে করেন যে শিখন, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বা কম্পনের সূচনা হয় এবং ওই সকল মানসবৃত্তির অবসানের পরও ওই মস্তিষ্কক্রিয়া বা কম্পন অস্পষ্ট ও অচেতনভাবে চলতে থাকে। এই অচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বা কম্পনকেই বলা যায় সংরক্ষণ বা ধৃতি। পুনরুৎপাদন এই অস্পষ্ট মস্তিষ্ক-ক্রিয়াকে স্পষ্ট বা তীব্র করার নামান্তর। ধৃতি বা সংরক্ষণ বলতে বোঝায়, স্থায়ী মস্তিষ্ক-ক্রিয়া (permanent vibration in the brain) অথবা অচেতন মস্তিষ্ক-স্পন্দন (unconscious cerebral vibration)। ধৃতির এই শারীরবৃত্তীয় মতবাদকে বলা হয় স্থায়ী-অচেতন-ক্রিয়াবাদ (theory of permanent unconscious unconscious cerebration)।

অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেমস্ মনে করেন যে, ধৃতি মস্তিষ্ক-গঠনের স্থায়ী বিকার বা পরিবর্তন (permanent cerebral modification)। শিখন বা প্রত্যক্ষণ যে যে মস্তিষ্ক-অংশগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওই ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মস্তিষ্কাংশের গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মানসবৃত্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এই কারণে, পূর্বে যে কাজটি সম্পাদন করতে বেশি সময় লাগত, পরে তা সম্পাদন করতে অপক্ষাকৃত কম সময় লাগে। জেম্‌স্-এর মতে এইরূপ স্থায়ী সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্কপথ স্থাপিত হবার নামই সংরক্ষণ বা ধৃতি। তাঁর মতবাদের নাম স্থায়ী-মস্তিষ্ক-গঠন বিকারবাদ (theory of permanent cerebral modification)।

(গ) ওয়াট্‌সন প্রভৃতি আচরণবাদীগণ (behaviourists) মনে করেন যে, সংরক্ষণ বা ধৃতি এক শ্রেণির নির্জ্ঞান বা অচেতন শারীরিক বিকার (unconscious bodily modification)। এই মতো শারীরিক কারণকে শুধু মস্তিষ্কে বা স্নায়ুতে সীমাবন্ধ রাখে না, বরং সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের, গ্রন্থির এবং মাংসপেশীর ক্রিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে।

(১) **মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (Physiological Theory**) সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতবাদটি হল মনোবৈজ্ঞানিক। এই মতবাদ অনুসারে মনের চেতন স্তরের নীচে একটি অবচেতন স্তর রয়েছে। প্রত্যক্ষণ, শিখন প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন স্তর ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু এই সকল অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো অন্তর্নিহিত হলেও, মনের অবচেতনে স্তরে এগুলোর প্রতিরূপ থেকে যায়। এই প্রতিরূপ বলতে বোঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (subconscious mental modification)। বস্তু বা বিষয়গুলো মনের চেতন স্তরে ক্রিয়া করবার ফলে, এরা মানস পরিবর্তনের আকারে মনের গভীরতর অবচেতন স্তরে তলিয়ে যায়। স্টাউট্-এর (stout) ভাষায়, ওই বস্তু বা বিষয়সমূহ এদেরকে পুনরায় জানবার একটা প্রবণতা (Pre-disposition) মনে রেখে যায়।

তাহলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিষয় প্রতিরূপের আকারে মনে থেকে যায় বলতে আমরা বুঝব মনের এমন কোনো পরিবর্তন, যার ফলে ওই বিষয়কে পুনরায় জানবার প্রতি একটা প্রবণতা জন্মে এবং ভবিষ্যতে কোনো উদ্দীপক

উদ্দীপক এদের পুনরুস্থাপিত করতে পারে একে বলা হয় অনুষঙ্গ (association)।

৫.৩.২.৩ প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)

শুধু পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের ধারণ এবং পুনরুৎপাদন স্মরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হয়েছিল, পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপ যে এরই প্রতিরূপ, এই পুনর্জ্ঞানও স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। স্মরণে এর প্রতিরূপকে কোনো পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিরূপ বলে চিহ্নিত করা বা পুনরায় জানা চাই। যে বিষয়টি পূর্বে জানা হয়েছিল, তা-ই যে পুনর্বার জ্ঞাত হচ্ছে, এইরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়া স্মরণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হয়তো পূর্বজ্ঞাত বিষয়টির সঠিকভাবেই পুনরুৎপাদন হল, অথচ একে পূর্বজ্ঞাত বলে চিনতে পারা গেল না। কিংবা যে বস্তু বা বিষয়টি পূর্বে জেনেছিলাম, সেই বস্তু বা বিষয়টিকেই পুনরায় জানাচ্ছি বা স্মরণ করছি, এই প্রকারের প্রত্যভিজ্ঞতা ঘটল না। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদন হওয়া আর না হওয়া সমান। সুতরাং পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ।

৫.৩.২.৪ স্থান-কাল নির্দেশ (localisation)

কোনো বস্তুর বা বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞতায় এর প্রতিরূপটি যে প্রতিরূপ, এই প্রকার বোধ অনিবার্য। প্রতিরূপের স্থান-কাল নির্দেশ না হলে, এই প্রকারের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় না। শুধু সংরক্ষিত বস্তুর বা বিষয়ের প্রতিরূপ পুররুৎপাদন হলেই হল না। বস্তুটি বা বিষয়টি কোথায়, কবে বা কখন জ্ঞাত হয়েছিল, সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুরুৎপাদন হওয়া চাই। স্থান-কাল-নির্দেশসহ বস্তুর বা বিষয়ের পুনরুৎপাদন না ঘটলে এর পরিচিতিবোধ (feeling of familiarity), যাকে টিশ্‌নার প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণরূপে আখ্যায়িত করেছেন, তা ঘটে না। দূর থেকে একটি লোককে দেখে তাকে যেন চিনি বা জানি বলে মনে হয়। কিন্তু এই সংশয়মিশ্রিত জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা নয়। প্রত্যভিজ্ঞা হয় তখনই, যখন ওই লোকটিকে কোন স্থানে কবে বা কোন সময় দেখেছিলাম, এই স্থান-কাল-নির্দেশ ঘটে।

সুতরাং স্মৃতি বলতে বোঝায় সেই স্মরণ করবার ক্ষমতা, যা পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থান-কাল-নির্দেশের ফলে ঘটে। এবার স্মৃতির অঙ্গগুলির বিশ্লেষণ ও আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করলে স্মৃতি-প্রক্রিয়া (process of memory) বুঝতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

৫.৪ সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ (Analysis of retention)

আপাতদৃষ্টিতে ধৃতি বা মনে রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলে মনে হয়। একে সহজ বলে মনে হওয়ার কারণ হল জড়জগতের জ্ঞানলব্ধ দৈশিক সংস্কার। জড়জগতের সমস্ত বস্তুই থাকে দেশে বা স্থানে। যেমন বইটি আছে বলতে আমরা বুঝি যে এটি ঘরে টেবিলের উপর আছে। তেমনই আমরা মনে করি যে মনও ঘর বা টেবিলের মতো একটি দীর্ঘ বা স্বল্প পরিসর স্থান, যেখানে পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থাকে।

কিন্তু জড়বস্তুর মতো মনে প্রতিরূপের দৈহিক পরিণাম নেই। একটি পাঁচ ফুট দীর্ঘ লাঠির প্রতিরূপ পাঁচফুট লম্বা নয়। আবার উষ্ণ বস্তুর প্রতিরূপ উষ্ণ নয়। বাহ্যবস্তু শরীরে মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না। অথচ পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা একেবারে মুছে যায় না, বরং মনে এর ছাপ রেখে যায়। সংরক্ষণ বা ধৃতি কীরূপে ঘটে, তা সহজবোধ্য নয়। তথাপি এটি বাস্তবিকই ঘটে থাকে।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

আলোচ্য এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- স্মৃতি ও বিস্মৃতির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- স্মৃতির উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেলের সাহায্যে স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বিস্মৃতির প্রচলিত কারণগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- জ্ঞানমূলক তত্ত্বের সাহায্যে বিস্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

৫.৩ স্মৃতি (Memory)

৫.৩.১ স্মৃতির সংজ্ঞা (Definition of Memory)

অতীত প্রত্যক্ষ (Perception) বা অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলো (Images) অবিকলভাবে পুনরুৎপাদন করবার ক্ষমতাকে স্মৃতি বলে। এবং এই পুনরুৎপাদন করবার ক্রিয়াকে বলা হয় স্মরণ (remembering)।

৫.৩.২ স্মৃতির উপাদান (Factors of Memory)

স্মৃতি কতকগুলো অঙ্গ বা অংশ নিয়ে গঠিত। স্মৃতির অঙ্গ প্রধানত চারটি, যথা ধৃতি (retention), পুনরুৎপাদন (recall), প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) এবং স্থান-কাল নির্দেশ (localisation)।

৫.৩.২.১ ধৃতি (retention)

সংবেদন (Sensation), প্রত্যক্ষ (Perception), শিখন (learning) প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক (acquisitive) বৃত্তি। এদের সহায়তায় মন নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহৃত জ্ঞান অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেলে, জ্ঞানের বিকাশ বা বৃদ্ধি সম্ভব হোত না। এটি মনে সংরক্ষিত (retained) থাকে বলেই, এর ভিত্তিতে উচ্চতর জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। অবশ্য আহূত জ্ঞানের সবটাই সব সময় সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে সংরক্ষিত থাকে না। ধৃতি মনের এই সংরক্ষণমূলক শক্তি। যা চেতনাকে স্পর্শ করে, তাই প্রতিরূপের আকারে মনে সংরক্ষিত থাকে।

৫.৩.২.২ পুনরুদ্রেক (recall)

কিন্তু প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত থাকলেই এদের স্মরণ হয় না। নানা অভিজ্ঞতার ফলে নানা প্রতিরূপই তো মনে হয়েছে। যে বিষয়টি স্মরণ করতে হবে, তার প্রতিরূপগুলোকে এদের অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত করা দরকার। মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত প্রতিরূপ ব্যক্ত করাকে বলে পুনরুদ্রেক।

পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক সূত্র (eue) বা অভিভাবের (suggestion) সাহায্যে। উদ্দীপক প্রতিরূপগুলোকে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস প্রভৃতি অনুযায়ী পুনরুপস্থাপিত করে। প্রতিরূপগুলোর মধ্যে যে সম্বন্ধের ফলে

একক ৫ ❑ স্মৃতি ও বিস্মৃতি (Introduction)

গঠন (structure)

৫.১ সূচনা
৫.২ উদ্দেশ্য
৫.৩ স্মৃতি
৫.৩.১ স্মৃতির সংজ্ঞা
৫.৩.২ স্মৃতির উপাদান
৫.৩.২.১ধৃতি
৫.৩.২.২পুনরুদ্রেক
৫.৩.২.৩ প্রত্যভিজ্ঞা
৫.৩.২.৪ স্থান-কাল নির্দেশ
৫.৪ সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ
৫.৫ পুনরুদ্রেকের বিশ্লেষণ
৫.৬ বিস্মৃতির ধারণা
৫.৭ স্মৃতির তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ মডেল
৫.৭.১ স্মৃতির সংগঠন
৫.৭.২ স্মৃতির প্রক্রিয়া
৫.৭.২.১সংরক্ষণ
৫.৭.২.২প্রত্যাহ্বান
৫.৮ বিস্মৃতির কারণ
৫.৯ তথ্য প্রক্রিয়া করণ ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক মতবাদের ভিত্তিতে বিস্মৃতির স্বরূপ
৫.৯.১মানসিক অনুষঙ্গ ও স্মৃতির পুনরুদ্রেকের সহায়ক সংকেত
৫.৯.২ পুনরুদ্রেকের ভিত্তি হিসাবে মানসিক অনুষঙ্গ
৫.৯.৩ স্মৃতি সংগঠনের আন্তর্জাল মডেল
৫.৯.৪ অনুবেলের শিখন তত্ত্ব ও বিস্মৃতি

৫.১ সূচনা (Introduction)

শিখনের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে যে মানসিক প্রক্রিয়াটির কথা এসে পড়ে তা হল, স্মৃতি ও বিস্মৃতি—মনে রাখো ও ভুলে যাওয়া। শিখনের মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি যদি তা আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে না পারি তবে, শিখন অর্থহীন। মনোবিজ্ঞানের আদি লগ্নে প্রথম যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল স্মৃতি ও বিস্মৃতি তার অন্যতম। স্মৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেলেও এখনও অনেক কিছু অজানা। এখানে স্মৃতি ও বিস্মৃতির প্রচলিত ধারণাও ব্যাখ্যার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব সংক্ষেপে বলা হল।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি শিখনের সঞ্চালন যে যে ক্ষেত্রে ঘটে— যেমন (ক) বিষয়বস্তুর অভিন্নতা থাকলে, (খ) পদ্ধতিগত অভিন্নতা থাকলে, (গ) মৌলিক তত্ত্ব বা মূলগত সূত্রের দিক দিয়ে অভিন্নতা থাকলে এবং (ঘ) উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রের সমাবেশের ক্ষেত্রে—তা শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহলে শিক্ষক যে যথেষ্ট সার্থক ও সন্তোষজনকভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালনের সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে পারবেন এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সহজ, দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্নাবলী

১। শিখনের সঞ্চালন বলতে কী বোঝ? কখন এবং কীভাবে শিখন সঞ্চালিত হয়? এই প্রসঙ্গে শিখনের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করো। (What do you mean by transfer of learning? When and how transfer of learning takes place? In this connection discuss different types of transfer of learning.)

২। থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব এবং জাডের সামান্যীকরণের তত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। কোন্ তত্ত্বটি তোমার মতে অধিক গ্রহণযোগ্য? (In connection with transfer of learning provide a comparative discussion between Thorndike's theory of identical elements and Judd's theory of generalisation. According to you which theory is more acceptable?)

৩। গেস্টাল্টবাদীদের শিখন সঞ্চালনের উপর প্রদত্ত অভিস্থাপন তত্ত্বের বিষদ আলোচনা করো। Criticallly discuss the gestalt theory of transposition on transfer of learning.)

৪। শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে সঞ্চালনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের কী করা উচিত তা আলোচনা করো। (In order that transfer of learning takes place properly, discuss what should a teacher do in teacher do in teaching-learning environment.)

৫। শিখনের সঞ্চালন বলতে কী কী বোঝায় তা সুস্পষ্ট কর। (Clarify the concept of transfer of learning.)

৬। শিখনের সঞ্চালন কত প্রকার ও কী কী? (How many types of transfer are there? What are these?)

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ

(ক) অভিস্থাপন (Transposition)

(খ) অভিন্ন উপাদান (Identical elements)

(গ) সদর্থক সঞ্চালন (Positive transfer)

(ঘ) শূন্য সঞ্চালন (Zero transfer)

শিম্পাঞ্জীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনেরর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে শিম্পাঞ্জীটি তার প্রথম দিনের শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির যথা খাঁচা, কলা, দুটি বাঁশের খন্ড ইত্যাদির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ধারাটি উপলব্ধি করেছিল দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সেই সম্বন্ধের ধারাটিকেই সে অভিস্থাপন করল এবং এর ফলে মুহূর্তেই সে সমস্যার সমাধান করতে লাগল। সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ ধারাটিরই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চালন ঘটেছে। এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধে ধারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিকে অভিস্থাপন করাকেই গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের সঞ্চালন বলে থাকেন। বলা বাহুল্য জাড্-এর সামান্যীকরণ তত্ত্বের সঙ্গে মৌলিক সূত্রের দিক দিয়ে এই তত্ত্বটির প্রচুর মিল আছে।

৪.৫ শিক্ষণ-শিখনে সঞ্চালনের প্রয়োগ (Uses of transfer in teaching-learning)

শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে সঞ্চালনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের কী করা উচিত তা নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমত, শিখন সঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ কিনা, কোন্ পরিস্থিতিতে কী শিক্ষা করলে সেটি অন্য পরিস্থিতিতে কোন বিষয় শিখনে সহায়ক হয় এবং শিখন সঞ্চালন মোটামুটি কী কী শর্তের উপর নির্ভরশীল, সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া শিক্ষার্থী কী শিখছে, কেন শিখছে সে সম্পর্কে শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে অবহিত করা। **দ্বিতীয়ত,** সব মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিখন সঞ্চালনের সাফল্য নির্ভর করে শিখনের গভীরতা ও সম্পূর্ণতার উপরে, কাজেই এই ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয় বোধগম্য হলেই তার সঞ্চালন সহজতর হবে। শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয়। **তৃতীয়ত,** যে পরিস্থিতি থেকে শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, সেই দুটি পরিস্থিতির পশ্চাতে যে মূল সূত্র ক্রিয়া করছে, সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে। **চতুর্থত,** পাঠ্য বিষয়ের অর্থ অবধারণ। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোধ এবং দুটি পরিস্থিতির অভিন্ন উপাদানগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী যাতে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। সঞ্চালনের জন্য বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে যে মিল, তার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্যাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা। **পঞ্চমত,** শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পাঠ্য বিষয়ের সংগঠন সুসংগতিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে মূলগত ধারণা ও মতবাদগুলি সহজে অনুধাবন করতে পারবে। **ষষ্ঠত,** অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ শিখন সঞ্চালনের সহায়ক প্রক্রিয়া। সে কারণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সাধারণ সূত্র গঠন করার ক্ষমতা শিক্ষার্থী লাভ করে। **সপ্তমত,** পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ প্রভৃতিই এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, কাজেই এগুলির প্রয়োজনের উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

আরেক দিক দিয়ে শিখন সঞ্চালনে শিক্ষকের সাহায্য বিশেষ পূর্বগঠিত কোন অভ্যাস শিক্ষার্থীদের নতুন কোনো দক্ষতা বা জ্ঞান অর্জনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালন শিক্ষার্থীর সন্তোষজনক শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে। যথা বাধাসৃষ্টিকারী অভ্যাসটি যাতে পরিত্যাগ করার পন্থা অবলম্বন করা যায় তার উপায় শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীকে বোতলে দেবেন যাতে অভ্যাসটি শিক্ষার্থীর নতুন শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

মতোই প্রচুর ভুল করল। হেনড্রিকসন এবং স্ক্রাভার জাডের ওই একই পরীক্ষণকার্য অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের উপর চালান করে ডাড্-এর মতো ওই একই ফল পান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণমূলক দলগুলির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলগুলির ক্ষেত্রে কোনোরূপ সঞ্চালনই হয়নি। জাড্-এর মতে তাঁর পরীক্ষণমূলক দলটির এই সাফল্যের মূল কারণ হল যে প্রতিসরণের মূলনীতিটি তাদের জানা থাকার জন্য তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা বা সূত্র গঠন করতে পেরেছিল এবং এরই ফলে তারা লক্ষ্যভেদ অনেক কম ভুল করেছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলটির প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় তারা সমস্যাটি সম্বন্ধে কোনো অন্তর্নিহিত সূত্র গঠন করার সুযোগ পাননি এবং এর ফলেই তারা প্রচুর ভুল করেছিল। তাই প্রমাণ হচ্ছে যে যেখানে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য সূত্র গঠনে সক্ষম হয় সেখানেই শিখনের সঞ্চালন ঘটে।

জাড্-এর এই পরীক্ষায় থর্নডাইক-এর অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটি স্পষ্টই ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে দু-দলের প্রথমবারের লক্ষ্যভেদ ও দ্বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ—এই দুটি শিখন পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর অভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রিত দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ পরীক্ষণমূলক দলটির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিন্নতা যদি সঞ্চালনের কারণ হত তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলটির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হত। তার কারণ সেখানে দুটি ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণ অভিন্ন উপাদান বর্তমান ছিল। বস্তুত জলের নীচে রক্ষিত লক্ষ্যবস্তুর গভীরতার পার্থক্য ছাড়া দুটি ক্ষেত্রে অন্য কোনো পার্থক্যই ছিল না। অতএব পরীক্ষণমূলক দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা নয়। প্রথম পরিস্থিতি থেকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্যীকরণ বা সামান্যসূত্র গঠনই শিখন সঞ্চালনের প্রকৃত কারণ।

৪.৪.৩ গেস্টাল্ট তত্ত্ব (Gestalt Theory)

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীগণ তাঁদের সমগ্র আকৃতি বা সংগঠন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিখনের সঞ্চালনের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন তত্ত্ব (Theory of transposition) বলেও উল্লেখ করা হয়।

তাঁদের তত্ত্বানুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোনো বিষয়বস্তুই তার অংশগুলির নিছক যোগফল নয়, সেগুলির যোগফলের উপরেও আরও অতিরিক্ত কিছু এবং সেই 'অতিরিক্ত কিছু' এবং সেই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে নিছক যোগ করে বা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না। কোনো কিছু শেখার অর্থ হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুটির এই অন্তর্নিহিত সমগ্র রূপট সম্যকভাবে প্রত্যক্ষণ ও উপলব্ধি করা এবং এভাবে যে শিখন ঘটে শিখনই সত্যিকারের বা বাস্তব শিখন। আর এই ধরনের শিখনের ফলেই ঘটে স্বাভাবিক ও 'স্থায়ী' সঞ্চালন। এই জন্যেই গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ ধারাটি পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে অভিস্থাপনকে (transposition) সঞ্চালন বলে থাকেন।

কোহ্লালের পরীক্ষণে আমরা দেখতে পেয়েছি যে শিম্পাঞ্জী যখন দুটি বাঁশের খণ্ড একসঙ্গে জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেইজন্য ওই শিখনটি একবার আয়ত্ত হবার পর তা স্থায়ীভাবে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখন তাকে ওই ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই দেখা গেছিল যে ওই কৌশলটি অবলম্বন করতে তার একটুও দেরি হয়নি।

৪.৪.১ অভিন্ন উপাদান তত্ত্ব (Theory of Identical Elements)

এই তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন থর্নডাইক। একটি শিখন পরিস্থিতি আর একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে এতটুকুই প্রভাবিত করতে পারে, যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পরিস্থিতি ও পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে যে উপাদানটুকু অভিন্ন, পূর্ব পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে সেই উপাদানটুকুরই সঞ্চালন ঘটবে। থর্নডাইক এই সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটি শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যাও দেন। তাঁর মতে শিখন ঘটার সময় দুটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন স্নায়ুমূলক সংযোজন সংঘটিত হয়। ঠিক ততটুকুর ক্ষেত্রেই শিখন সঞ্চালন ঘটে থাকে। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মতে শিখনের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতাও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন ছাত্রের যোগ অঙ্কে ব্যুৎপত্তি তাকে গুণ অঙ্কে পারদর্শী করে তুলবে। কেননা গুণ অঙ্ক কষতে গেলে যোগ অঙ্কের সহায়তা লাগবেই। গুণ অঙ্কের একটা অংশের সঙ্গে যোগ অঙ্কের রয়েছে পুরোপুরি অভিন্নতা। থর্নডাইকের মতে এই অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রেই শিখনের সঞ্চালন ঘটবে।

৪.৪.২ সামান্যীকরণ তত্ত্ব (Theory of Generalisations)

সামান্যীকরণের ভিত্তিতে ডাড্ (Judd) শিখন সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাড-এর মতে উপাদানের অভিন্নতার ফলশ্রুতিতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। তাঁর মতে ব্যক্তি নিজে তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্য ধারণা বা সামান্যীকরণ করতে পারলো তার উপর নির্ভর করে শিখনের সঞ্চালন। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের প্রকৃত অর্থ হল বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে, সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে এইগুলি সম্পর্কে সাধারণ সূত্র বা (general principles) গঠন করা। জাড্-এর মতে যে যত বেশি তার অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম সামান্য সূত্র প্রস্তুতে সক্ষম তার ক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন তত বেশি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একটি ছাত্র পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে একটি পরীক্ষণকার্যে সফলতা লাভ করল। যদি ছাত্রটি ওই পরীক্ষণকার্যে যে সূত্রগুলি কার্যকর হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত না হয়, তাহলে তার শিখনকে নতুন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করতে পারবে না।

জাড্-এর সামান্যীকরণ তত্ত্বের সমর্থনে তাঁর একটি বিখ্যাত পরীক্ষণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির দু-দল ছাত্রকে (একটি পরীক্ষণমূলক দল ও অন্যটি নিয়ন্ত্রিত দল) জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তির ছুঁড়তে বলা হল। বলা বাহুল্য তির ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে বলা হল। বৈজ্ঞানিক সত্য এই জলের নীচে কোনো বস্তু রাখলে আলোর প্রতিক্ষরণের (refraction) ফলে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যে জায়গায় অবস্থান করে ঠিক সেখানে দেখা যায় না। সেখান থেকে একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের ওই রহস্য ছেলেদের কাছে অজ্ঞাত ছিল বলে দু-দল ছেলেই, লক্ষ্যভেদে ভুল করল। পরীক্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে পরীক্ষক প্রতিসরণের সূত্রটি ও তার ফলে জলের নীচে রাখা কোনো বস্তুর অবস্থানের কী বিচ্যুতি ঘটে বলে মনে হয় তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। নিয়ন্ত্রিত দলটিকে পরীক্ষক কিছুই বললেন না। তার পরে ওই দু-দলকেই আবার ওইভাবে জলের চার ইঞ্চি নীচে রাখা একটি লক্ষ্যবস্তুতে ওই একইভাবে তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করতে বলা হল। ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

পরীক্ষণমূলক দলটি (যারা প্রতিসরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে) প্রথমবার অপেক্ষা এবার লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করল কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলটি (যাদের আলোর প্রতিসরণের সূত্র সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করা হয়নি) আগের

প্রভাবকেই শিখনের সঞ্চালন বলা হয়। শিখনের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে একটি বিষয়ের শিখনের ফলাফল পরবর্তী একটি বিষয়ের শিখন বা সম্পাদনে সঞ্চালিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হতে পারে। এক পরিস্থিতিতে যা শেখা যায় পরবর্তী কোনো নতুন পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করা যায় বা কাজে লাগানো যায়। উদাহরণ'স্বরূপ, কোনো ব্যক্তি প্রথমে প্রথমে বাংলা ভাষা শিখল। তারপর ইংরেজি ভাষা শিখল। শিখনের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে বাংলা ভাষার শিখন ইংরেজি ভাষার শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত করবে। অর্থাৎ এই মতবাদটির মূল বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক কোনো এক ব্যক্তি সাইকেল চালানো শিখলো। সে যদি পরে মোটর বাইক চালানোর প্রশিক্ষণ নেয় তবে সাইকেল চালানোর শিখন প্রক্রিয়া মোটর সাইকেল বা বাইক চালানোতে সঞ্চালিত হবে অর্থাৎ মোটর বাইক চালানোরূপ কাজকে প্রভাবিত করবে।

৪.৩.১ শিখন-সঞ্চালনের প্রকারভেদ (Types of transfer of learning)

এই সঞ্চালন বা প্রভাব তিন-প্রকারের হতে পারে। যথা অস্তিত্বমূলক সঞ্চালন, নেতিমূলক সঞ্চালন এবং শূন্য সঞ্চালন। যদি প্রথম বিষয়ের শিখন দ্বিতীয় বিষয়ের শিখনকে সহায়তা করে বা সহজ করে তোলে তাহলে সেই প্রভাবকে অস্তিত্বমূলক বা সদর্থক সঞ্চালন বলা হবে। যেমন সাইকেল চালানোর শিখন পরবর্তী পর্যায়ে মোটর সাইকেল চালানোর শিখনকে সহজতর করে তোলে। সুতরাং এটি হল অস্তিমূলক বা সদর্থক সঞ্চালনের (positive transfer) একটি উদাহরণ।

যদি প্রথম বিষয়ের শিখন দ্বিতীয় বিষয়ের শিখনে বাধার সৃষ্টি করে তাকে বলা হবে নেতিমূলক বা নঞর্থক সঞ্চালন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ইংরেজি অর্থহীন একস্বরবিশিষ্ট শব্দ (Nonsense synable) যেমন LON, RES, DAP এইরকম বারোটি শব্দ কোন ব্যক্তিকে শিখিয়ে কোন বিশ্রাম না দিয়ে যদি সেই ব্যক্তিকে আবার এইরূপ কিন্তু ভিন্ন আর বারোটি ইংরেজি অর্থহীন একস্বরাবিশিষ্ট শব্দ শেখানো হয় তাতে দেখা যায় ব্যক্তির প্রথম বারোটি শব্দ শিখতে যতটা সময় লেগেছিল পরবর্তী সময়ে বারোটি শব্দ শিখতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। এতে বোঝা যায় প্রথম শিখনের প্রভাব দ্বিতীয় শিখনের উপর নেতিমূলক বা নঞর্থক (Negative transfer)।

আবার এমনও হতে পারে পূর্ববর্তী শিখনের কোনও প্রভাব পরবর্তী শিখনের উপর আদৌ নেই। যদি এমন হয় তা হলে আমরা বলবো এক্ষেত্রে শিখনের সঞ্চালন 'শূন্য' (zero transfer) । ধরা যাক্ কোনো ব্যক্তি প্রথমে সাঁতার কাটা শিখলো এবং পরে এরোপ্লেন চালানো শিখলো। সাঁতার শেখার প্রভাব যদি এরোপ্লেন চালানো শেখার উপর আদৌ না থাকে অর্থাৎ এরোপ্লেন চালানো শেখায় সহায়তা কিংবা বাধার সৃষ্টি কোনোটাই না করে তাহলে আমরা বলবো সাঁতার শেখার সঞ্চালন এরোপ্লেন চালানোর শেখার উপর শূন্য।

৪.৪ শিখনের সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of transfer of learning)

শিখনের সঞ্চালন কীভাবে ঘটে, তার ব্যাখ্যারূপে নীচে কয়েকটি মতবাদ বা তত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

একক ৪ ❑ শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Learning)

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা
৪.২ উদ্দেশ্য
৪.৩ শিখনের সঞ্চালন বলতে কী বোঝায়
৪.৩.১ শিখন সঞ্চালনের প্রকার ভেদ
৪.৪ শিখনের সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব
৪.৪.১ অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব
৪.৪.২ সামান্যীকরণের তত্ত্ব
৪.৪.৩ গেস্টল্ট তত্ত্ব
৪.৫ শিক্ষণ-শিখনে সঞ্চালনের প্রয়োগ

৪.১ সূচনা (Introduction)

একথা ঠিক যে মানুষের শিখন ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন তবুও কোনো বিশেষ মুহূর্তে পূর্ববর্তী শিখনের সঙ্গে পরবর্তী শিখনের উপযুক্ত সাযুজ্য হলে শিখনের কাজটি সহজ হয় এবং স্মৃতিতে বা আচরণে তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন শিক্ষকরা তাঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়টি জানতেন। কিন্তু শিখনের গবেষণার পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানীর এই বিষয়টির উপরও যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। আলোচ্য এককে এই প্রসঙ্গটিও সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু সঞ্চালন প্রক্রিয়া শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ, যেহেতু এই বিষয়টিও শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জানা প্রয়োজন।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা—

- শিখনের সঞ্চালনের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- সঞ্চালনের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব জানতে পারবেন।
- সামান্যীকরণ ও গেস্টল্ট তত্ত্বের কথা জানতে পারবেন।
- সঞ্চালনের প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪.৩ শিখনের সঞ্চালন বলতে কি বোঝায় (Concept of transfer of learning)

কোনো একটি বিষয় শিখনের পর পরবর্তী একটি বিষয়ে শিখনের বা সম্পাদনের উপর প্রথম বিষয়টি শিখনের

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ

(ক) প্রত্যক্ষণমূলক শিখন (Perceptual learning)

(খ) আদর্শের শিখন (Learning of ideals)

(গ) অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response)

(ঘ) শিখনের 'প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি' (Trial and error learning)

(ঙ) শক্তি সঞ্চারক উদ্দীপক (Reinforcer)

(চ) জ্ঞানমূলক মানচিত্র (Cognitive map)

ত্রিভূজের প্রত্যেকটির তিনটে কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(৩) যৌগিক সম্পর্ক—এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি সাদৃশ্য (similarity)। নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থায়ী অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে, এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী যে নীতিগুলো স্থায়ী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলো নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এই যুক্তিতে, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

আসুবেল যদিও শিখনের ক্ষেত্রে, নতুন বিষয়বস্তু ও স্থায়ী ধারণার মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন, তিনি অধীন সম্পর্কের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্থায়ী ধারণাটি যত ব্যাপক হবে, নতুন অভিজ্ঞতা আয়ত্তীকরণের কাজ তত সহজ হবে এবং শিখনও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

১। শিখন বলতে কী বোঝ? শিখনের শর্তাবলী ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করো। (What do you understand by learning? Discuss in detail about the conditions and types of learning.)

২। প্যাভ্‌লভের অনুবর্তনবাদ ও শিক্ষায় এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। (Explain Pavlovian conditioning and its importance in education.)

৩। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ ব্যাখ্যা করো। এবং শিখনে তাঁর মুখ্য ও গৌণ সূত্রগুলি বর্ণনা করো। (Explain Thorudike's Theory of connectionism and describe his primary and secondary laws of learning.)

৪। শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় আলোচনা করো। (Discuss how thorndike's laws of learning can applied in the field of education.)

৫। স্কিনারের স্বতঃক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের বিবরণ দাও এবং শিক্ষায় এই তত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। (Describe Skinner's operant conditioning and explain its significance in education.)

৬। শিখনের গেস্টল্ট তত্ত্বটি উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করো। (Discuss the Gestalt theory of learning with suitable examples.)

৭। হালের আচরণ পারস্পর্যের তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো। (Discuss briefly Hull's systematic theory of learning.)

৮। সংক্ষেপে টলম্যানের সংকেত গেস্টল্ট তত্ত্বটি বর্ণনা করো। (Describe briefly Tolman's singgestalt theory of learning.)

৯। ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো। (Explain Bruner's cognitive development theory of learning.)

১০। অসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো। (Explain Ausuber's theory of meaningful verbal learning.)

৩.৫.৮ আসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখাতত্ত্ব (Ausubel's theory of meaning ful verbal learning)

আসুবেলের মতে অর্থপূর্ণ শিখন তখনই হয় যখন শিক্ষার্থী নতুন তথ্যকে তার পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ নতুন তথ্য যখন স্থায়ী স্মৃতিতে অবস্থিত একটি স্কিমার সঙ্গে যুক্ত করতে শিক্ষার্থী সক্ষম হয়, তখনই অর্থপূর্ণ শিখন হয়ে থাকে। শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী এই কাজে ব্যর্থ হলে অর্থপূর্ণ শিখন (meaningful learning) হবে না। সে ক্ষেত্রে যে শিখন হবে তা হবে নেহাতই যান্ত্রিক ও অর্থহীন অর্থাৎ শিখন হবে ইংরেজিতে যাকে বলে রূট লার্নিং (rote learning)।

মনোবিজ্ঞানী আসুবেলের মতে অর্থপূর্ণ শিখন তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এইগুলো হল—

(১) শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু (শেখার জন্য) প্রদান করতে হবে।

(২) এই অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক সংগঠনে প্রয়োজনীয় ধারণা বা স্কিমা (schema) থাকা বাঞ্ছনীয়। নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করার মতো পূর্ব ধারণ বা স্কিমা না থাকলে প্রকৃতি শিখন বলতে যা বোঝায় তা সম্ভব নয়।

(৩) অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানসিক অবস্থা (mental set)।

আসুবেল দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষার্থী যখন অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুকে অর্থাৎ যৌক্তিক দিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুকে (logically significant and meaningful subjectectmatter) তার স্থায়ী স্মৃতি বা বৌদ্ধিক সংগঠনে অবস্থিত কোনো ধারণার সঙ্গে স্থায়ীভাবে এবং নির্দ্বিধায় সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা করে তখনই অর্থপূর্ণ শিখন হয়। অর্থপূর্ণ তথা যুক্তিপূর্ণ বিষয়বস্তুর শিখন ও সংরক্ষণ বৌদ্ধিক সংগঠনের দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এই শিখনের জন্য বৌদ্ধিক সংগঠনে উপস্থিত থাকবে (১) একটি নির্ভর যোগ্য স্থায়ী ধারণা (anchoring idea) (২) যা অবশ্যই হবে অপরিবর্তনীয় (stable) এবং স্পষ্ট (clear)। নতুন তথ্যবলীর অর্থপূর্ণতা নির্ভরশীলতা ওই নতুন তথ্যের সঙ্গে বৌদ্ধিক সংগঠনে উপস্থিত নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ধারণার (anchoring idea) যৌক্তিক সম্পর্কের (logical relation) উপর। এই সম্পর্কের যৌক্তিকতা যত কমতে থাকে শিখনও তত যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং তার স্থায়িত্ব ও কম হয়। আসুবেলের এই মতবাদ থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান, অর্থপূর্ণ শিখনের জন্য স্থায়ী স্মৃতিতে অবশ্যই একটি ব্যাপক অপরবর্তনীয় ধারণার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এবং শিক্ষার্থীকে সবসময় ওই নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ধারণার (anchoring idea) সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সুমঞ্জসসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

আসুবেল ও রবিনসন্ স্থায়ী ধারণা ও নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) অধীন সম্পর্ক—এই ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতাকে স্থায়ী ধারণার অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন আমরা বলি 'মানুষ শরণশীল' রাম একজন মানুষ। তাই যখন বলি রাম একজন মানুষ, একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না সেও মরণশীল।

(২) ঊর্ধ্বমুখী সম্পর্ক—এখানে স্থায়ী স্মৃতিতে অবস্থিত মূল ধারণার থেকে নতুন অভিজ্ঞতাটি ব্যাপক হয়। আমরা আরোহী পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করি। যেমন সমবাহু ত্রিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিন কোণের সমষ্টি ২ সমকোণ শেখার পর যে শিক্ষার্থী যে কোন ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ২ সমকোণ এই সত্যটি শেখে, সেই তার নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই ধরনের উর্ধ্বমুখী সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এখানে শিক্ষার্থী আরোহী পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণ করে সিদ্ধান্তে এল সমকোণী, সূক্ষ্মকোণী ও স্থূলকোণী

'বৌদ্ধিক বিকাশ' বলতে **বৌদ্ধিক সংগঠনের গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে** বুঝিয়েছেন। তবে ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি স্তরে (পিঁয়াজের মত) ভাগ করেন নি। তাঁর মতে, মানুষের জীবন-বিকাশ পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের প্রতিস্থাপন সিস্টেম (representation system) বা সাংকেতিকীকরণের প্রক্রিয়া আয়ত্ত করার উপর নির্ভর করে। ব্রুনারের মতে, প্রতিরূপ (representation) হল একগুচ্ছ নীতি বা নিয়ম যার ভিত্তিতে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করে। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাংকেতিকীকরণ এবং স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য (ব্রুনারের মতে) তিনটি তন্ত্র (system) বা মাধ্যমের প্রয়োজন। এগুলো হল— (১) ক্রিয়া (actions), (২) কল্প বা ভাবমূর্তি (images) এবং (৩) সংকেত (symbols) । ব্রুনার প্রক্রিয়া বা ক্রিয়া মাধ্যমগুলির নাম দিয়েছেন— (ক) সক্রিয়তাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব (enactive representation), (খ) ইকনিক্ প্রতিনিধিত্ব (inconic represntation) এবং (গ) সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব (symbolic representation)।

সঞ্চালনমূলক স্তরে শিশুর অভিজ্ঞতা-অর্জন প্রক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্যের কথা পিঁয়াজে উল্লেখ করেছেন, তাকেই ব্রুনার বর্ণনা করেছেন সক্রিয়তাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব (enactive representation) হিসেবে। বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এই সময় শিশু বস্তুর প্রতি দৈহিক বা সঞ্চালনমূলক প্রতিক্রিয়া (sensori-motor activity) করে। একজন শিশু সাপ দেখে, পরে সেটিকে বোঝানোর জন্য হাতটি এঁকে বেঁকে দোলায়। বৌদ্ধিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এইভাবে দৈহিক সক্রিয়তাভিত্তিক সংকেতের মাধ্যমে কোন অভিজ্ঞতা। স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

'ইকনিক প্রতিনিধিত্ব' বলতে কল্পের (image) মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সাংকেতিকীকরণ বুঝায়। কোনো বস্তু বা ঘটনার কল্প (image) সেই বস্তুর বা ঘটনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এই জাতীয় কল্পের মাধ্যমে শিশু তার বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারে।

'সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব' (symbolic representation) মূলত ভাষাভিত্তিক ও বিমূর্ত (abstract) প্রকৃতির। এই ভাষা সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতাকে স্থায়ী স্মৃতিতে ধারণ করে বৌদ্ধিক সংগঠনকে দৃঢ় করতে পারে। যেমন বই, টেবিল, অক্সিজেন, জল ইত্যাদি ভাষা-সংকেত বস্তুটি নির্দেশ করে।

ব্রুনারের তত্ত্বের দুটো বিশেষ দিক এইরূপ ঃ

(১) ব্রুনার বলেছেন, অভিজ্ঞতার সাংকেতিকীকরণ রীতির, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি ঘটলেও একটি পর্যায়ে এলে নিম্নবর্তী পর্যায়টি চলে যায় না। মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে তিন ধরনের সাংকেতিকীকরণ ক্ষমতাই সহাবস্থান করে। অর্থাৎ, শিখনের জন্য তিন ধরনের প্রতিনিধিমূলক সাংকেতিকীকরণ প্রয়োজন হয় এবং অভিজ্ঞতার পুনরুৎপাদনের জন্যও শিক্ষার্থী প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

(২) ব্রুনোর তাঁর মতবাদে বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশ তথা শিখন কৌশল (learning technique) নির্ভর করে ভাষার দক্ষতা বা ক্ষমতা বিকাশের উপর।

ব্রুনারের ও কেনির বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে এই সিন্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে—অভিজ্ঞতার আয়ত্তীকরণ ও সংরক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীর একান্ত নিজস্ব আন্তরিক ভাষামূলক নীতি থাকা প্রয়োজন। সাংকেতিক প্রতিনিধিত্ব কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণের (perception) মাধ্যমে সম্ভব নয়। আর এই সর্বোচ্চ স্তরে ভাষাভিত্তিক সাংকতিকীকরণ তখনই আরম্ভ হয়, যখন ইকনিক্ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করা যায় না।

প্রাণীর অধিকাংশ আচরণই জটিল প্রকৃতির এবং বহু টুকরো টুকরো কাজের সমষ্টি। আচরণটির প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে হলে আচরণটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে এবং সেটির সম্পাদনের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে তাও দেখতে হবে।

প্রাণী তার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আচরণের মধ্যে কোন বিশেষ পরিবেশিক উপকরণের সাহায্য নেয়। এটিকে লক্ষ্যের উপকরণ বলে বর্ণনা করা যায়। টল্‌ম্যান-এর মতে আমাদের পরিবেশে নানা পথ, উপকরণ, বাধা-বিপত্তি ইত্যাদি ছড়ানো আছে। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এগুলিকে মনে মনে সাজিয়ে নিতে হয় এবং সেটিকে যেভাবে ব্যবহার করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব সেইটিকে সেইভাবে ব্যবহার করে থাকি। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রাণী তার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে একটি 'জ্ঞানমূলক মানচিত্রের' (cognitive map) আকারে সাজিয়ে নেয় এবং সেই মানচিত্র অনুযায়ী তার আচরণ সম্পন্ন করে। নিছক কতকগুলো উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে তার আচরণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। পারিবেশিক উপায় বা পন্থাগুলোর মধ্যে যেটি আমাদের দ্রুত ও সহজে লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ করে সেটিকে আমরা বেছে নেই।

সংক্ষেপে বলা যায় প্রাণীর আচরণ সবসময় উদ্দেশ্যমুখী। নতুন আচরণের ক্ষেত্রে টল্‌ম্যান সংকেত বা প্রত্যাশার (expectation) শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কোনো উদ্দীপক ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়। কোন উদ্দীপক লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে কি করবে না সে বিবেচনা করেই ব্যক্তি তাকে প্রত্যক্ষণ করে। তাঁর মতে শিখন হল উদ্দীপকের সংকেত নির্ণয় করা। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথই শিখনের চাবিকাঠি। সাধারণত কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি উদ্দীপকগুলিকে বিচার করে দেখে কোনটা তার সমস্যা সমাধানে বা তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

টল্‌ম্যানের সংকেত শিখনের বৈশিষ্ট্য হল যে গোঁড়া আচরণবাদীদের অনুবর্তনভিত্তিক শিখন প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি গেস্টাল্টবাদীদের সামগ্রিকতার ধারণার মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর শিখন তত্ত্বের মধ্যে প্রাণীর আচরণের পেছনে উদ্দেশ্যমূলক সচেতনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং প্রাণী যখন কোনো কিছু শেখে তখন সে তার প্রতিটি আচরণের উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝে।

টল্‌ম্যানের এই ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষার্থী যেন ভালোভাবে জানে যে সে কেন একটি বিশেষ ধরনের আচরণ আয়ত্ত করছে। তবেই শুধু সে তার বর্তমান আচরণের পরবর্তী আচরণটির প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে। সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রতিটি আচরণের অর্থ বুঝতে পারে এবং সেইভাবে তার পরবর্তী আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

টল্‌ম্যানের শিখন তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যে সব সংকেতগুলো শিখবে সেগুলো তার কাছে সুস্পষ্ট করে উপস্থাপিত করতে হবে। শিক্ষার্থী এই সংকেতগুলোর সাহায্যে একটি 'জ্ঞানমূলক মানচিত্র' (cognitive map) তৈরি করতে সমর্থ হবে। শিক্ষার্থী যত কার্যকরীভাবে এই 'জ্ঞানমূলক মানচিত্রটি' তৈরি করতে পারবে তার শিখনও তত দ্রুত ও সুসংহত হবে।

৩.৫.৭ জিরোমি ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশের তত্ত্ব (Jerome Bruner's Cognitive Development Theory)

ব্রুনার বৌদ্ধিক বিকাশের তত্ত্ব উদ্ভাবনে পিঁয়াজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও পিঁয়াজের মতো

নির্ণীত হয়। তাঁর মতে প্রাণীর মধ্যে যখন গরজের দরুন অসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন অনেক উদ্দীপক তাকে (প্রাণী) উত্তেজিত করে এবং তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় কিছু কিছু উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সংযোগ প্রাণীর তাড়না (drive) নিবৃত্তিতে সহায়তা করে এবং তার চাহিদা (need) চরিতার্থ হয়। এবং এইভাবে বিশেষ কতগুলি উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সংযোগ পুরস্কৃত হয় (rewarderd) চাহিদার পরিতৃপ্তি বা চরিতার্থতার মাধ্যমে। ফলে ওইসব সংযোগগুলি দৃঢ়তর হয়।

হাল বলেছেন, উদ্দীপক বা উদ্দীপক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন বা ওই বন্ধনের শক্তি (The strengthening or the establishment of connection between responses of an organism and particular stimulating conditions) দুটি ঘটনার উপর নির্ভর করে। এই দুটি ঘটনা হল—

(১) উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপনের সময়ের দিক থেকে নৈকট্য (The close proximity in time of the stimulus and response) এবং পুরস্কৃত অবস্থা, যে অবস্থা ব্যক্তির চাহিদাকে হ্রাস করে (need reduction)। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদা (need) তার (ব্যক্তির) মধ্যে গরজ (drive) সৃষ্টি করে। এর ফলে সে আচরণ (behaviour) সম্পাদন করে পরিবেশের উপযুক্ত অংশের প্রতি এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার গরজের হ্রাস পায়। এখন যে আচরণ (behaviour) ও গরজের হ্রাস (drive reduction) এর মধ্যে সাযুজ্য আছে, তার সঙ্গে বন্ধনযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি শিখনরূপে স্থায়ী হয়। ফলে বলেছেন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গরজ (drive) তার মধ্যে কতকগুলি আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়া (response) সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়াগুলিই পরবর্তী স্তরে উদ্দীপক (stimulus) হিসাবে কাজ করে। ফলে, শিখন পরিস্থিতির উদ্দীপক সম্পর্কে সব সময় নিশ্চিন্ত করে কিছু বলা যায় না।

হাল ছিলেন অতিমাত্রায় আচরণবাদে বিশ্বাসী। তিনি বিশেষভাবে প্রাণীর আচরণের একটি তত্ত্ব স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি একদিকে প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তনের (classical conditioning) এবং অন্যদিকে থর্নডাইকের (thorndike) ফললাভের সূত্রের (law of effect) মধ্যে সামঞ্জস্য বিবিধ করেছেন।

হাল-এর এই তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তিনি অনুবর্তনের শিখনের কৌশল হিসেবে মেনে নিলেও, শিক্ষার্থীর চাহিদা (need), তাড়না (drive) এবং পুরস্কারের (reward) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সেই চাহিদা পূরণে আগ্রহী করা। শুধু মাত্র যথাযোগ্য উদ্দীপক বা পাঠ্যবস্তু উপস্থাপন করে চর্চার দ্বারা অনুবর্তন করতে পারলে শিক্ষা হবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র যান্ত্রিক অভ্যাস (mechanical habit) তৈরি করা নয়। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আরও নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে—তবেই শিখন হবে গতিশীল, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সার্থক।

৩.৪.৬ টল্‌ম্যান-এর সংকেত গেস্টাল্ট তত্ত্ব (Tolman's Sign-Gestalt Theory of Learning)

টল্‌ম্যান তাঁর শিখন তত্ত্বে থর্নডাইক-এর 'ভুল ও প্রচেষ্টা', 'অনুবর্তন' ও 'গেস্টাল্ট' এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রাণীর সব আচরণই লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে থাকে। কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো কিছু থেকে সরে আসার উদ্দেশ্যেই সব আচরণ সংগঠিত হয়ে থাকে। প্রাণীর আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী যে আচরণটি করছে তার অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে।

সর্বাঙ্গীন সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রথম ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জীটিকে না দেখিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি খাদ্যবস্তু পাওয়ার সঙ্গে বাক্সের কি সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু একবার দেখিয়ে দেওয়ার পর তা সে উপলব্ধি করেতে পেরেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, বোকা শিম্পাঞ্জীটি তার নিজের বুদ্ধির দ্বারা বাক্স এবং লাফানো ছাড়া, অন্য কোন কিছুকেই সামগ্রিক আচরণের অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারেনি। তার সামগ্রিকতার বোধ আসেনি বলে সে সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

কোয়েলের তাঁর পরীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিক রূপ উপলব্ধির ফলেই প্রাণী সমস্যা সমাধান করে থাকে। এই উপলব্ধি 'হঠাৎ' শিক্ষার্থীর মধ্যে আসে। সমস্যামূলক পরিস্থিতির সামগ্রিকতার 'হঠাৎ' এই প্রত্যক্ষণকে গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন অন্তর্দৃষ্টি (insight)। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই অন্তর্দৃষ্টিই শিখনের মূল কথা। অন্তর্দৃষ্টির জন্য সামান্যীকরণ এবং পৃথকীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পৃথকীকরণের (discrinination) ক্ষমতা যেমন নতুন সমস্যা-সমাধানে প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণও (generalization) দরকার। কোনো কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বাধাপ্রাপ্ত হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে এক অতৃপ্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন শিক্ষার্থী তার এই অস্বস্তিকর অবস্থার সমাধানের জন্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্যেকার সার বা মূল অংশটি গ্রহণ করে। এর ফলে তার সামনে সম্পূর্ণ সমাধান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৩.৪.৪.১ শিক্ষাক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের তাৎপর্য (Educatioinal Implication of Gestalt Theory)

(১) বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই মতবাদ সহজেই প্রয়োগ করা চলে। আধুনিক শিক্ষার দুটি মূল নীতি — ''সমগ্র থেকে অংশের দিকে' (from general to particular) এবং ''মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে' (from concrete to abstract), এই গেস্টাল্ট মতবাদ বা সমগ্রতাবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

(২) এই মতবাদ অনুযায়ী অন্তর্দৃষ্টি আসে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে অংশগুলোর মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে। সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য হবে এই সম্বন্ধ স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া। অর্থাৎ বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করতে সক্ষম হয়।

(৩) গেস্টাল্ট মতবাদ বা তত্ত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা (Active Participation) ও আগ্রহ। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার্থীও শিখন পরিস্থিতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করা শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য। এই সাহায্যই শিক্ষার্থীকে সমস্যা-সমাধানে আগ্রহী করে তোলে এবং তার ফলশ্রুতিতে শিখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

(৪) সমগ্রতাবাদীগণের মতে সত্যিই শিখন হল সামান্যীকরণ ও পৃথকীকরণের ফলশ্রুতি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটো কৌশলকে প্রয়োগ করার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা শিক্ষকের মুখ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৩.৪.৫ হাল-এর আচরণ পারস্পরিকের তত্ত্ব (Hull's Systematic Behaviour Theory)

হাল-এর মতে উদ্দীপক (stimulaus) এবং প্রতিক্রিয়ার (response) মধ্যে সংযোগ প্রাণীর তাড়না (drive) দ্বারা

(familiarity) ও মানসিকভাবে পূর্ণতা প্রত্যক্ষণের প্রবণতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত শর্তের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক উদ্দীপক একটি সমগ্র আকৃতি হিসাবে প্রতিভাত হয়। এ জন্যই আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে থেকে কয়েকটিকে আমরা 'জিজ্ঞাসা চিহ্নের নক্সা' আকারে দেখি, নাম দিই 'সপ্তর্ষিমণ্ডল'।

সমগ্রতাবাদীরা মনোবিজ্ঞানে একটি নতুন চিন্তাধারার সূচনা করেন। এই চিন্তাধারার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষায় সমগ্রতাবাদের প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমসাময়িককালে আচরণবাদীরা উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ হিসাবে শিখনের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শিখন নামক উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া এই দুই খণ্ডাংশের যোগফল মাত্র। সমগ্রতাবাদীরা এরই প্রতিবাদে শিখন প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন এবং তাঁদের মতবাদকে শিখনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্রতাবাদীরা শিখন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টি (Inright) নামক একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করেন। অন্তর্দৃষ্টির অর্থ হল আকস্মিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির একটি সমগ্র রূপ প্রত্যক্ষণ করা বা অনুভব করা। অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দুটি মানসিক ক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে। এর একটি হল পৃথকীকরণ (Discrimination) অর্থাৎ শিখন পরিস্থিতির মধ্যেকার অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়া; আর অপরটি হল সামান্যীকরণ (generalization) অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সাহায্যে একটি সাধারণ সূত্র তৈরি করা। বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন এই গেস্টল্ট মনোবিজ্ঞানী বা সমগ্রতাবাদীদের মধ্যে বিশেষ করে কোয়েলার (kohler)। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গেস্টল্টবাদীদের শিখনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠত হয়েছে।

কোয়েলারের বিখ্যাত পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হয় শিম্পাঞ্জীদের উপর। এখানে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষাগুলির মধ্যে দুটির অবতারণা করা হবে। এই পরীক্ষণের দিনটিতে তিনি একটি শিম্পাঞ্জীকে সকালবেলা কোনো কিছু খেতে না দিয়ে একটা খাঁচার মধ্যে ঢোকালেন। তার খাঁচার মধ্যে উপর থেকে খাদ্যবস্তুটা ঝুলিয়ে রাখা হল এবং খাঁচার মধ্যে খাদ্যবস্তু থেকে দূরে এক কোণে একটি কাঠের বাক্স রাখা হল। এই বাক্সটা এমন উঁচু ছিল যে, সেটাকে খাদ্যবস্তুর ঠিক নীচে এনে রেখে যদি শিম্পাঞ্জী তার উপর দাঁড়ায়, তাহলে খাদ্যবস্তুটা পাড়তে পারে। এরকম পরীক্ষণমূলক পরিস্থিতিতে কোয়েলার শিম্পাঞ্জীটার আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেন। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে অনেক চেষ্টা করল লাফিয়ে খাদ্যবস্তুকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুতেই তার কাছে পৌঁছতে পারলো না। বাক্সটি যেখানে ছিল, সেখান থেকেই তার উপরে উঠে লাফ দেওয়ার চেষ্টাও করল, কিন্তু কিছুতেই যখন খাদ্যবস্তুর কাছে পৌঁছতে পারলো না, তখন হতাশ হয়ে শিম্পাঞ্জীটি বসে রইলো। তখন কোয়েলার নিজে খাঁচার মধ্যে ঢুকলেন। বাক্সটি খাদ্যবস্তুর কাছে টেনে আনলেন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে খাদ্যবস্তুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। পরে বাক্সটি আবার যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শিম্পাঞ্জীটি বাক্স টেনে নিয়ে অনুরূপভাবে খাদ্যবস্তুটা পেড়ে নিল। যখন শিম্পাঞ্জীটি এইভাবে খাদ্য পাড়ার চেষ্টা করছিল তখন অন্যান্য শিম্পাঞ্জী এনে কোয়েলার খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখালেন তার কাজ। এবং পর পর এক একদিন পর্যায়ক্রমে একটি করে নতুন শিম্পাঞ্জীকে এইভাবে ভেতরে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, তারা কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই নিজেরা সমস্যার সমাধান করতে পারে। এরপর তিনি একদিন অপেক্ষাকৃত বোকা একটি শিম্পাঞ্জীকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ওই শিম্পাঞ্জীটি বহুদিন ধরে তার সঙ্গীদের সমস্যা সমাধান করতে দেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিম্পাঞ্জীটি কিছুই শেখেনি, বাক্সটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকেই লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। এইসব পরীক্ষা থেকে, কোয়েলার সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিখনের জন্য পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে

নীতিকে শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী করে তুলতে হলে, শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষণ পরিবেশ রচনা করতে হবে। যে পরিবেশ শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তুলতে পারবে। সেটাই হবে আদর্শ শিখন পরিবেশ। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষক যে প্রতিক্রিয়াগুলিকে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী করতে চান, সেগুলিকে শক্তিদায়ক উদ্দীপক দিয়ে বা পুরস্কৃত করে শক্তিশালী করে তুলবেন। এইভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে পারলে, শিক্ষার্থীদের কাছে শিখন অনেক সহজ ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পঞ্চমত এই তত্ত্বে বলা হয়েছে, একটি পরিপূর্ণ সামগ্রিক আচরণ কতকগুলি অপারেন্টের (operants) সমন্বয় শৃঙ্খল (chain)। ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামগ্রিক আচরণ সৃষ্টি করতে হলে, তার অন্তর্গত অপারেণ্ট প্রক্রিয়াগুলিকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করতে হবে। আর অপারেণ্ট প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট ক্রমে সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক পর্যায়ে উপযুক্ত শক্তিদায়ক উদ্দীপক (reinforcer) নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কাজটি পরিকল্পিত হওয়া দরকার। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন শক্তিদায়ক উদ্দীপক নির্বাচনের এই কাজকে স্কিনার বলেছেন ‘shaping’ বা অবয়ব গঠন। সুতরাং শিক্ষক হিসাবে আমাদের কাছে এই নীতির তাৎপর্য হল এই যে মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষণ প্রচেষ্টাগুলিকে উপযুক্ত পরিকল্পিত রূপ দিতে হবে। প্রোগ্রাম পদ্ধতিতে বা কমপিউটর সহযোগী শিক্ষণে, প্রোগ্রাম রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমানে এই কাজ করা হয়।

পূর্বোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়াও অপারেণ্ট অনুবর্তন বা স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের তত্ত্বকে নানাভাবে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে, বিভিন্ন আচরণ শিক্ষনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্ব, মানুষের আচরণের প্রকৃতি ও তার পরিবর্তন সংক্রান্ত বহু তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছে।

৩.৪.৪ শিখনের গেস্টাল্ট তত্ত্ব (Geslalt theory of learning)

গেস্টাল্ট (gestalt) শব্দের অর্থ হল প্যাটার্ন বা অবয়ব। এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষণের (perception) প্রকৃতি অনুশীলন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের প্রত্যক্ষণ ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিন জন জার্মান মনোবিজ্ঞানী ওয়ার্দাইমার (wertheimer), কফ্‌কা (koffka) ও কোয়েলার (kohler) এই মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের পূর্বে বা তাঁদের সমসাময়িক কালে মানুষের মানসিক ক্রিয়াকলাপকে একজন রসায়নবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাঁরা বলছিলেন এই উপাদানগুলিকে বুঝলেই মানসিক ক্রিয়াকেও বোঝা যাবে। কারণ উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া এই উপাদানগুলিরই সমষ্টি মাত্র।

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বা সমগ্রতাবাদীরা এরই প্রতিবাদে তাঁদের তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁরা বলেন উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। তারও অতিরিক্ত কিছু। আমরা যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষণ করি তখন তার সামগ্রিক রূপটিই আগে প্রত্যক্ষণ করি তারপর তার অংশ বিশেষ নিয়ে চিন্তা করি। একটি বাড়ি কেবলমাত্র অনেক ইট কাঠের সমষ্টি মাত্র নয়। বাড়িটিকে আমরা ইটের সমষ্টি বলি না যদিও ইট বাড়ির উপাদান, এতে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি, সাতটি সুরের সমষ্টিমাত্রই সংগীত নয়। নির্বাচিত সুরের একটি নক্সা (pattern) সামগ্রিকভাবে আমাদের কাছে সংগীত হিসাবে ধরা দেয়, আনন্দ দেয়। উপাদানগুলিকে (অর্থাৎ সুরগুলিকে) আলাদ আলাদা ভাবে বুঝতে চাইলে সেটি আর সংগীত থাকবে না।

কীভাবে আমাদের সমগ্রতার অনুভূতি হয়, সে সম্বন্ধেও তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কয়েকটি নিয়ম বা সূত্রের কথা বলেছেন। সাদৃশ্য (similarity), নৈকট্য (proximity),ধারাবাহিকতা (contimity) প্রভৃতি বাহ্যিক শর্ত এবং পরিচিতি

পুস্তক (Programmed text), শিক্ষণ যন্ত্র (Teaching Machine) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, আধুনিক শিক্ষামূলক কারিগরি বিদ্যার (Instructional technology) বিকাশে মনোবিজ্ঞানী স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, স্কিনারের তত্ত্বের এই যন্ত্রনির্ভর প্রয়োগ, সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবাস্তব। কারণ, এই কৌশল ব্যয় সাপেক্ষ এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষকের পক্ষে এই নীতিতে কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই বাস্তব অসুবিধার কথা মেনে নিলেও, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই তত্ত্বের অন্তর্গত মূল নীতিগুলিকে শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সাধারণ অবস্থায়ও প্রয়োগ করতে পারেন এবং শিক্ষাদানের কাজকে অনেক বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এই তত্ত্বের মৌলিক নীতিগুলিকে কীভাবে কার্যকরী করে তুলতে পারেন, সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত এ অপারেণ্ট অনুবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল এই যে, শাস্তির (punishment) দ্বারা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহিত করা যায় না। শাস্তি, শক্তিদায়ক (reinforcer) নয়। শাস্তির ভয়ে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করে, তার দ্বারা প্রকৃত শিখন হয় না। অনুবর্তনের নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে হবে যার দ্বারা তার শিখনলব্ধ আচরণ সম্পাদনের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য শিক্ষকের কাছে এই যে, শিক্ষণের সময় শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা ত্যাগ করে, উপযুক্ত শক্তিদায়ক উদ্দীপক উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবে পোগ্রাম পদ্ধতিতে বা কমপিউটার সহযোগী শিক্ষণে (CAI) শিক্ষার্থীকে তার কাজের ফল সম্পর্কে অবগত করে বা বিভিন্ন ধরনের শ্লোগানের মাধ্যমে, শক্তিদায়ক উদ্দীপক পরিবেশন করে শিক্ষার্থীর শিখনকে কার্যকরী করে তোলা হয়।

দ্বিতীয়ত স্বতঃক্রিয়া অনুবর্তনের নীতিতে বলা হয়েছে প্রাণীর আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হলে, নতুন আচরণ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে বা তাকে শক্তি সঞ্চারক উদ্দীপক (reinforcer) দিতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের শিখনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করতে না পারলে, তাদের শিখনও কার্যকরী হবে না। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক ব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীদের যে পুরস্কৃত করার রীতি প্রচলিত আছে তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ আচরণ সম্পাদনের পর দীর্ঘ সময় ব্যবধানে ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়। এর ফলে শক্তি সঞ্চারক উদ্দীপকের (reinforcer) শক্তি হ্রাস পায়। ফলে এই ব্যবস্থায় আমরা খুব ভালো ফল পাই না। তাই এই নীতি অনুযায়ী শিখনকে কার্যকরী করতে হলে শক্তি সঞ্চারক উদ্দীপকের উপস্থাপন তাৎক্ষণিকভাবে করতে হবে। আধুনিক শিক্ষণ যন্ত্রগুলিতে (teaching machines) এই ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক নিজে একটু তৎপর হলে যান্ত্রিক সহযোগিতা ছাড়াও, সাধারণভাবে শ্রেণিকক্ষে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত এই নীতিতে বলা হয়েছে, আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি উপাদন প্রধান পূর্বাবস্থা (Antecedents), আচরণ (Behaviour) এবং শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Reinforcer)। অর্থাৎ শিখন এখানে শূন্য (Zero) অবস্থা থেকে শুরু হয় না। শিক্ষার্থীর পূর্ব প্রস্তুতি তার মধ্যে নতুন আচরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইপ্সিত আচরণ সৃষ্টি করার জন্য, তাদের মধ্যে পূর্ব প্রস্তুতি আনার প্রয়োজন। শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে যদি প্রয়োজনীয় সহযোগী তথ্যগুলির শিক্ষার্থীদের পরিচিত করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজেই আত্মপ্রচেষ্টায় শিখতে পারে।

চতুর্থত স্বতঃক্রিয় অনুবর্তনে শিক্ষার্থীর নতুন আচরণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মধ্য থেকে নিঃসৃত হয়। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা প্রয়োজন। এই তত্ত্বে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী পরিবেশের মধ্যে সক্রিয়তার দরুন নতুন আচরণ সম্পাদন করে বা আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং এই

কাজটিই খাদ্যের উপস্থাপন ঘটাচ্ছে।

সেইজন্য প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়াটিকে টাইপ-এস (Type-S) বা উ-শ্রেণিভুক্ত এবং স্কিনারের অনুবর্তন পক্রিয়াটিকে টাইপ-আর (Type-R) বা প্র-শ্রেণিভুক্ত অনুবর্তন বলা হয়। এখানে ‘উ’ অক্ষরটি উদ্দীপকের জন্য এবং ‘প্র’ অক্ষরটি প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

স্কিনারের এই স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্র খুবই সীমিতসংখ্যক।

বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আচরণই অপারেন্ট বা স্বতঃক্রিয়াশীল প্রকৃতির। অর্থাৎ বিশেষ কোনো উদ্দীপকের উত্তরে তার আচরণগুলি সংঘটিত হয় না। তার চারপাশে যে পরিবেশটি থাকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে সে আচরণ সম্পন্ন করে। সেই কারণে তার আচরণটি যে কি প্রকৃতির হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকে না। যেমন খাবার খাওয়া, গাড়ি চালানো, চিঠি লেখা, টেলিফোন ধরা, ইত্যাদি কোন কাজটিই রেস্পন্ডেন্ট বা প্রতিক্রিয়াধর্মী নয়। অর্থাৎ এগুলি বিশেষ কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের উত্তরে সম্পন্ন হয় না। আচরণটি করার সময় ব্যক্তির পরিবেশ যে প্রকৃতির থাকে তার দ্বারাই আচরণটির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

এই ধরনের অনুবর্তন ঘটে তখনই যখন কোনো আচরণের সম্পাদনের ফলে বিশেষ কোনো একটি পুনরূস্থাপনমূলক উদ্দীপক আবির্ভূত হয়। তখন সেই আচরণটি আবার ঘটার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন, টেলিফোন ধরলে যদি কোন প্রিয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় তাহলে টেলিফোন ধরা রূপ কাজটি আবার ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং যত বেশি ক্ষেত্রে এই পুনরুস্থাপন দেখা দেবে তত এই অনুবর্তিত আচরণটি দৃঢ়বন্ধ ও অধিক সংখ্যক হবে।

মানুষের বিভিন্ন আচরণ যদি পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে এ ধরনের অপারেণ্ট কন্ডিসনিং বা স্বতঃক্রিয়াধর্মী অনুবর্তনের ক্ষেত্র অসংখ্য পাওয়া যাবে।

৩.৪.৩.১ স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implication of Operant Conditionin)

স্কিনার ইতর প্রাণীর উপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশেষ বিশেষ পরীক্ষাগার পরিস্থিতিতে প্রাণীর আচরণ বিশ্লেষণ করে আচরণ সংক্রান্ত কতকগুলি নীতি গঠন করেন। এই নীতিগুলি তিনি পরবর্তীকালে মানুষের আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন কৌশল যেহেতু প্যাভলভীয় অনুবর্তন কৌশলের মতো যান্ত্রিক নয়, সেহেতু তার দ্বারা মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। যদিও স্কিনার তাঁর এই আচরণগত ব্যাখ্যায়, মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেন নি তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ সম্পাদনে, এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই কৌশলে শিখতে গিয়ে মানুষ পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজের চাহিদাগুলি চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। তাই শিখন প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই শিখন কৌশলের উপর আধুনিক কালে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই শিখন কৌশলকে বিদ্যালয়ে শিশুদের শিখনের ক্ষেত্রে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য বর্তমানে স্বয়ং শিক্ষণের পদ্ধতির (Auto instructional technique) প্রবর্তন করা হয়েছে। স্কিনার যে শিক্ষণ কৌশল তাঁর এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন, তাকে বলা হয় প্রোগ্রাম, পদ্ধতি (Programmed instruction)। এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য বর্তমানে শিক্ষণের জন্য প্রোগ্রাম

প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ উদ্দীপকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, যদিও উদ্দীপকটি প্রাণীর পরিস্থিতির একটি অঙ্গ রূপে কাজ করে থাকে। প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের মাত্রা ও তীব্রতা উদ্দীপকের মাত্রা ও তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের মাত্রা ও তীব্রতার উপর আচরণের মাত্রা বা তীব্রতা নির্ভরশীল নয়।

প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শক্তির পরিমাপের দ্বারা আচরণের শক্তির পরিমাপ করা যায়। কিন্তু স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দীপক না থাকার জন্য উদ্দীপকের শক্তির দ্বারা আচরণের শক্তির পরিমাপ করা যায় না। বরং এখানে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বা তীব্রতার পরিমাপের দ্বারা উদ্দীপকের শক্তির বা তীব্রতার পরিমাপ পাওয়া সম্ভব হয়।

স্কিনার তাঁর অনুবর্তনের তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত পরীক্ষণের দ্বারা। তিনি একটি বিশেষ ধরনের বাক্স তৈরি করেন যেটি স্কিনার বাক্স নামে পরিচিত। এই বাক্সের মধ্যে একটি লিভার বা হাতল থাকে। আর থাকে খাদ্যের একটি পাত্র এবং প্রাণীর সামনে তাকে উত্তেজিত করার বা সক্রিয় করার একটি যান্ত্রিক আয়োজন। বাক্সটির বাইরে একটি খাদ্যের ভাণ্ডার থাকে সেখান থেকে বাক্সের ভেতরের হাতলটি টিপলে একটি খাবারের টুকরো বা গুলি বেরিয়ে এসে খাঁচার ভিতরের ওই খাদ্যের পাত্রে পড়বে।

এই পরীক্ষণে প্রথমে বাইরে থেকে উত্তেজকের সাহায্যে প্রাণীকে সক্রিয় বা উত্তেজিত করা হল। ধরা যাক একটা আলো জ্বালা হল। তার ফলে প্রাণীটি বাক্সের ভিতর হাতল টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো খাদ্য এসে বাক্সের মধ্যস্থিত খাদ্যপাত্রে পড়ল। প্রাণী সেটি খেল। এই ঘটনা বার বার ঘটার ফলে প্রাণীটির মধ্যে হাতল টেপা এবং খাদ্য পাওয়ার মধ্যে অনুবর্তন স্থাপিত হল।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে এখানে পুনরূপস্থাপনমূলক বা অনুবর্তিত উদ্দীপকটি (অর্থাৎ খাদ্য) অনুবর্তিত প্রক্রিয়াটিকে (অর্থাৎ হাতলে চাপ দেওয়া) সৃষ্টি করছে না, যা প্যাভলভের বর্ণিত রেসপন্ডেন্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এখানে বরং বিপরীতটাই ঘটছে অর্থাৎ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ হাতলে চাপ দেওয়া খাদ্যের উপস্থাপনকে সৃষ্টি করছে। সেজন্য এটিকে স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন নাম দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু হাতলটি টিপলে খাদ্য উপস্থিত হচ্ছে যেহেতু হাতলটিকে উপকরণ রূপে বর্ণনা করা যায় এবং এই ধরণের আচরণকে উপকরণমূলক আচরণও বলা (Instrumental Act) বলা হয়।

এইবার আমরা স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন ও প্যাভলভের প্রতিক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারবো। প্যাভলভের বর্ণিত অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পুনরূস্থাপনমূলক বা অনুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গে অনুবর্তন প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দীপকটির উপস্থাপনের মাত্রা, স্থায়িত্ব ইত্যাদির উপর অনুবর্তনের আবির্ভাব, মাত্রা ও স্থায়িত্ব সরাসরিভাবে নির্ভরশীল এবং অনুবর্তনের সৃষ্টিও হচ্ছে এই উদ্দীপকটির উপস্থাপনের দ্বারা। যেমন খাদ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, উপস্থাপনের কাল ইত্যাদির উপর লালাক্ষরণের পরিমাণ, দ্রুততা ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং খাদ্যের উপস্থাপনের দ্বারাই অনুবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু অপারেট বা স্বতঃক্রিয়াশীল অনুবর্তনের ক্ষেত্রে পুনরুস্থাপনের ঘটনাটি অনেকটা বিপরীতভাবে ঘটছে। এখানে পুনরুস্থাপনমূলক বা অনুবর্তিত উদ্দীপক থেকে প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং প্রতিক্রিয়াটিই পুনরুস্থাপনমূলক উদ্দীপকটিকে সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ খাদ্যের উপস্থাপন হাতল টেপা রূপ কাজটি সৃষ্টি করছে না। বরং হাতল টেপা রূপ

পুরাতন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করতে পারে। সে জন্য তাকে উৎসাহ ও যথাযথ নির্দেশ দিতে হবে।

পঞ্চমত শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্যাটিকে সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য অল্পায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

৩.৪.৩ স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব (Skinner’s Theory of Operant Conditioning)

প্যাভলভীয় প্রাচীন অনুবর্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রক্রিয়ায় প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। বিশেষভাবে, উদ্দীপকগুলির উপস্থাপনের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন, প্যাভলভের কুকুরের পরীক্ষায়, কুকুরটি বাঁধা অবস্থায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করতো। প্যাভলভ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী উদ্দীপকগুলি উপস্থাপন করতেন। স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তনের (Operant conditioning) মূল ভিত্তি হল—প্রাণীর সক্রিয়তা। এই প্রক্রিয়ায় প্রাণী তার উদ্দেশ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বা আচরণের (Operant behavior) সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করে। এই অনুবর্তন তত্ত্বে ফল প্রাপ্তি বা পুরস্কার (Reward) এবং শক্তিদায়ক উদ্দীপনার (Reinforcer) উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্কিনারের অনুবর্তন তত্ত্বটি বুঝতে হলে পূর্বেই দুটি নামের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। স্কিনার প্রাণীর প্রতিক্রিয়া বা আচরণের মধ্যে দুটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যথা রেসপনডেন্ট বিহেভিয়ার (Respondent behaviour) বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং অপারেট বিহেভিয়ার (Operant behavior) বা স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণ। প্যাভলভ (Pavlov), ওয়াটসন (Watson) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া মতবাদ অনুযায়ী প্রাণীর সব আচরণই উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। উদ্দীপক না থাকলে আচরণও ঘটবে না। কিন্তু স্কিনারের মতে প্রাণী এমন অনেক আচরণ সম্পন্ন করে যার কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক পাওয়া যায় না। নিছক একটি পরিস্থিতিতে পড়ে প্রাণী এমন আচরণ করতে পারে যেগুলিকে কোনো বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রসূত বলা চলে না। এই জন্য স্কিনার প্রাণীর প্রতিক্রিয়া বা আচরণকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। এক, যেগুলি উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং দুই, যেগুলি কোনও বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট নয় অর্থাৎ স্বতঃসৃষ্ট আচরণ। যেমন, চোখে আলো পড়লে চোখের মাংসপেশীর যে সংকোচন ঘটে বা মুখে খাবার দিলে জিহ্বা থেকে যে লালাক্ষরণ হয় এগুলিকে প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ বলা হবে। কিন্তু ঘরে টেলিফোন বাজলে ব্যক্তি টেলিফোন তুলতেও পারে, না তুলতেও পারে আবার দেরিতে তুলতে পারে ইত্যাদি আচরণগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত বলা হবে। কেননা এখানে আচরণটি টেলিফোন বাজার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রসূত হচ্ছে না। উদ্দীপকটি অবশ্য ব্যক্তির ওই পরিস্থিতির একটি অঙ্গ রূপে থাকছে। কিন্তু ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করছে সামগ্রিক পরিস্থিতিটি, কেবলমাত্র উদ্দীপকটি নয়। সেজন্য এই ধরনের আচরণকে স্বতঃসৃষ্ট আচরণ বলা হয়। অপারেন্ট কথাটির অর্থ হল যে আচরণটি স্বতঃক্রিয়াশীল বা নিজে থেকেই পরিস্থিতির উপর কার্যকর হয়।

অতএব রেস্পন্ডেন্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ এবং অপারেন্ট বা স্বতংক্রিয়ামূলক আচরণের মধ্যে পার্থক্য হল—

৩। **ফল লাভের সূত্র**—উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে, নয় অতৃপ্তিকর হবে। যদি সংযোজনের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে সংযোজন দৃঢ়বন্ধ হবে। আর সংযোজনের ফল যদি অতৃপ্তিকর হয় তবে সে সংযোগ দুর্বল হয়ে উঠবে।

৩.৪.২.২ শিখনের পাঁচটি গৌণসূত্র (Secondary Laws of Learning)

১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সূত্র (law of multiple responses to the same stimulus) অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নির্ভুল প্রক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল শিখন। অতএব শিখনের জন্য প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার পক্ষে জটিল শিখন আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র (Law of Atitude, Set or Disposition) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না অতৃপ্তিকর তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের তৎকালীন অবস্থার দ্বারা।

৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Activity) কখনও কখনও উদ্দীপক বা শিখন পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

৪। সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analoy)— পূর্ব পরিচিত শিখন পরিস্থিতির অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী সাধারণত পূর্বে সম্পন্ন প্রতিক্রিয়ারই অনুকরণ করে থাকে।

৫। অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Assoriative Shifting) সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে আরেকটি উদ্দীপকে সেই প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। যেমন, কোনো কিছু প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খাবার দেখলে বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল।

৩.৪.২.৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের সূত্রবলীর প্রয়োগ (Application of Thorndikes' laws in learning)

থর্নডাইকের বর্ণিত শিখনের সূত্রগুলি থেকে আমরা মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি।

প্রথমত শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক (Emotional) প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয়, সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। অতৃপ্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফলে শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রেষণা (Motivation) বোধ করে।

তৃতীয়ত অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সে দিকে সমস্ত দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থত প্রতিত্রিয়ার বৈচিত্র ও বিবিধতা শিখনকে ত্বরান্বিত কে তোলে। অতএব যাতে শিক্ষার্থী গতানুগতিক ও

চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে পৌঁছায়। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক এই ভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং বাইরে খাবারে রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ওইভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবার গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু দেখা গেল যে দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হল এবং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও কম লাগল। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একইভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং এইভাবে তার সামনে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হয়। সেদিনও ওই একইভাবে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি চেষ্টা করার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে কম সময় লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়। এইভাবে পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে দেখা গেল যে যতই দিন যাচ্ছে ততই বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে তার সময়ও কম লাগছে। শেষকালে এমন একদিন এল যখন দেখা গেল যে বিড়ালটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করলো না। খাঁচায় তাকে বন্ধ করা মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে খাবারে পৌঁছল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সম্পূর্ণ হল। বিড়ালটির বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে সঠিক প্রতিক্রিয়াটি সংযোজন করতে সমর্থ হল।

৩.৪.২.১ থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী (Throndik's Laws of Learning)

থর্নডাইক শিখন প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের তিনটি মুখ্যসূত্র (Primary Laws) এবং পাঁচটি গৌণ সূত্র (Secondary Laws) উপস্থাপিত করেছেন। শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র ঃ

থর্নডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র হল—(১) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness), (২) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) এবং (৩) ফললাভের সূত্র (Law of Effect)। নীচে এই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। **প্রস্তুতির সূত্র**—শিখনের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, তার কথা উল্লেখ করেছেন থর্নডাইক প্রস্তুতির সূত্রে। তাঁর মতে কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে ব্যক্তির উন্মুখতা দরকার। তবে এই প্রস্তুতি বলতে তিনি কেবলমাত্র দৈহিক প্রস্তুতির কথাই বলতে চেয়েছেন। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে হয়। প্রস্তুতির সূত্রে থর্নডাইক এই দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— যে উত্তেজনা স্নায়ু (Nerve) বহন করতে প্রস্তুত, তাকে তা বহন করতে দিলে, ব্যক্তির তৃপ্তি আসবে। যে উত্তেজনা স্নায়ু বহন করতে রাজি নয়, তার জোর করে বহন করালে বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সবশেষে, যে কাজ করার জন্য দেহ উদ্‌গ্রীব, তা করতে না দিলেও বিরক্তি সৃষ্টি হবে।

২। **অনুশীলন সূত্র**—একে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) অভ্যাসের সূত্র (law of use) এবং (খ) অনভ্যাসের সূত্র (law of disuse)।

অভ্যাসের সূত্র—অন্যসব ব্যবস্থা ঠিক থাকলে একটা উদ্দীপক এবং একটা প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় বন্ধন স্থাপনের পরে যদি তাকে বার বার চর্চা করা হয় তা হলে সেই বন্ধনে শক্তি বাড়বে।

অনভ্যাসের সূত্র— কো পরিবর্তনীয় উদ্দীপক প্রক্রিয়া বন্ধন স্থাপনের পর বহুদিন চর্চা না করলে তাদের মধ্যেকার বন্ধন ক্রমে শিথিল হতে থাকে।

খাওয়া, পড়তে বসা বা শুনতে যাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া সামাজিক আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচরণগুলিও অনুবর্তনের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে।

তৃতীয়ত প্রক্ষোভের (Emotion) ক্ষেত্রেও অনুবর্তনের প্রভাব বিদ্যমান। বহুক্ষেত্রে কোনো কিছুর প্রতি অপছন্দ, ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অনুবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই অনুবর্তনের ফলেই স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের কোন কোনটি ছাত্রের কাছে অনুরাগের আবার কোন কোনটি ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং যাতে শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি বা কোন অপ্রাসঙ্গিক কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির প্রতি অনুবর্তিত হয়ে ওইগুলির প্রতি শিশুর মনকে বিরূপ না করে তোলে, সে দিকে মাতা-পিতা ও শিক্ষক মাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

চতুর্থত সু-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস অনুবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমাজ জীবনের রীতি-নীতি, ভদ্রতা, লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদার মনোভাব, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখানো যেতে পারে। তাই প্রত্যেক শিক্ষাকেরই উচিত শিক্ষার্থীকে তাঁর প্রত্যভিজ্ঞতা অনুযায়ী সু-অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত করা।

৩.৪.২ থর্নডাইকর সংযোজনবাদ (Thorndike’s Connectionism)

থর্নডাইক বিভিন্ন প্রাণীর শিখনকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে শিখনের সরলতম কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শিখন অনেক কারণে জটিল হয়ে পড়ে। তাই তিনি শিখনের উন্নত পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা না করে, তার সরলতম অবস্থা থেকে শুরু করলেন। তাঁর মতে শিখনের সরলতম ক্ষেত্র হল উদ্দীপকের (Stinutus) সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার (Response) বন্ধন বা সংযোজন। অর্থাৎ তাঁর মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনই হল শিখন। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক। আর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। থর্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই দুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখন শিখন কার্য সম্পন্ন হয়।

মনে করা যাক একটি ছাত্রকে বীজগণিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কুটি বিশেষ একটি সূত্র প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তোর জানা সূত্রগুলির একটির পর একটি প্রয়োগ করতে করতে সঠিক সূত্রটি প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে সঠিক সূত্র প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ তার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ঠিক সূত্রটির প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল সংযোজন হয় না। আর যেই সে নির্ভুল সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও নির্ভুল হল এবং তার শিখনও ঘটলো। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত হবে তখনই শিখন ঘটবে।

উপরের বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই থর্নডাইক তাঁর শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন ‘প্রচেষ্টাও ভুলের পদ্ধতি’ (Trial and error learning)। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখনের দৃষ্টান্ত হিসাবে থর্নডাইকের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজায় এমন একটি ছিটকিনি লাগানো ছিল যাতে আস্তে টিপ দিলেই দরজাটা নিজে নিজে খুলে যায়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌঁছানোর জন্যে বার বার চেষ্টা করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে

উদ্দীপকের সঙ্গে বা ঠিক আগে একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তবে ওই স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি দ্বিতীয় বা কৃত্রিম উদ্দিপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ো যাবে। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দিপকের উপস্থিতি ছাড়াই ওই কৃত্রিম উদ্দীপক ওই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাতে সমর্থ হবে। মনে করা যাক স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ ঘটে থাকে। এখন যদি কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২ (যার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হল প্র-২) বার বার ওই স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত বা অনুবর্তিত হল। এইভাবে কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াটাই হল প্রকার শিখন প্রক্রিয়া। প্যাভ্‌লভ্‌ এই ধরনের শিখনের নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response)।

কুকুরের ক্ষেত্রে লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভ্‌লভ্‌ প্রতিক্রিয়া সঞ্চালনের উপর যে গবেষণা সম্পন্ন করেন, তা তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা রূপ কোন অনিশ্চিত প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন যদি কুকুরটিকে খাদ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজানো হয় তা হলে দেখা যাবে কিছু কাল পরে খাদ্য না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই লালাক্ষরণ হতে শুরু করেছে। এখানে লালাক্ষরণ-রূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাজা-রূপ কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাবার) থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে (ঘণ্টা বাজা) সঞ্চালিত হওয়াকে 'অনুবর্তন' (conditioning) বলা হয় এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটলো তাকে 'অনুবর্তিত' (conditioned) প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Behaviourists) এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের দ্বারা সকল প্রকার শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

তাঁদের মতে ব্যক্তির অভ্যাস, অপছন্দ, মনোভাব, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্ম লাভ করে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে জটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলেও এই অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি।

৩.৪.১.১ শিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব (Importance of Conditioning in Education)

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব সুগভীর। বস্তুত শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে অনুবর্তনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত শিশুর ভাষা শিক্ষার অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। শিশু তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। প্রথম প্রথম শিশু কেবলমাত্র অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু ক্রমশ সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার প্রতি সাড়া দেয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তু তার প্রতি এগিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ওই বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে ওই বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে অনুবর্তিত হয়ে যায়। পরে ওই ব্যক্তি বা বস্তুটি দেখলে বা বোঝাতে গেলে তার ওই শব্দটি মনে হয় এবং সে তখন ওই শব্দটি উচ্চারণ করে। এইভাবেই সে মাকে মা বলতে ও বাবাকে বাবা বলতে শেখে। শিশু যে তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর নাম শেখে তা এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই।

দ্বিতীয়ত শিশুর বহু মৌলিক আচরণ অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল স্বরূপ। যে সকল অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতসারে আহরণ করে সেগুলির অধিকাংশ যে অনুবর্তনের মাধ্যমে অর্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন, সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে

(৭) সমস্যা সমাধানের শিখন (Problem solving learning) : মানুষের চলমান জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি বা সমস্যার সমুখীন হতে হয়। এই বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে আমাদের আচরণ ধারাকে পরিবর্তন করে সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই আচরণ পরিবর্তনই হল সমস্যা সমাধানমূলক শিখন।

শিখনকে এই সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা ছাড়াও আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানীগণ শিখনকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন— (ক) প্রাণীর শিখন (Animal learning) এবং (খ) মানুষের শিখন (Human learning)। আবার মানুষকে শিখনকে, আচরণের বিভিন্ন দিকের কথা চিন্তা করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—

(১) বৌদ্ধিক শিখন (cognitive learning) অর্থাৎ যে শিখনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বা ধারণা ইত্যাদি জন্মায়। এক কথায় বৌদ্ধিক শিখন হল জ্ঞানমূলক শিখন।

(২) দক্ষতামূলক শিখন (skill learning) অর্থাৎ যে শিখনের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) অনুভবমূলক শিখন (Affective learning) অর্থাৎ যে শিখনের মাধ্যমে প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ ও সমন্বয় ঘটে এবং মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

৩.৪ শিখনের তত্ত্ব (Theories of Learning)

শিখন তত্ত্বের মধ্যে প্যাভ্লভের অনুবর্তনবাদ, থর্নডাইক-এর প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা বা সংযোজনবাদ, স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তনবাদ, গেস্টাস্ট মতবাদ প্রথমে আলোচনা করা হবে। তারপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক দুটো মতবাদ যথা হাল-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের তত্ত্ব ও টলম্যান্-এর সংকেত-গেস্টান্ট তত্ত্ব আলোচিত হবে। এবং পরিশেষে শিখনের দুটো আধুনিক তত্ত্ব যথা জিরোমি ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশের তত্ত্ব ও অ্যাসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখন তত্ত্ব আলোচনা করা হবে।

৩.৪.১ প্যাভ্লভ্-এর অনুবর্তনবাদ (Pavlov' Theory of Conditioning)

প্যাভ্লভ্-এর অনুবর্তনবাদ সম্পূর্ণ শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ববিদ্ প্যাভ্লভ্কে এই অনুবর্তনবাদের স্রষ্টা বলা চলে, যদিও এ তত্ত্বটির সঙ্গে প্রাচীন অনুষঙ্গাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Associationists) বহু আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন এবং মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনায় বহু রূপে ও ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপককে কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা জন্ম থেকেই থাকে। এই উদ্দীপকগুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষেত্রে খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এখানে খাবার হল স্বাভাবিক উদ্দিপক ও লালাক্ষরণ হল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তেমনই ছোটো শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চ শব্দ শুনলে ভয় পাওয়া বা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই আচরণগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি হল এই রকম স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সহজাত ও পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্জিত বা শিক্ষাপ্রসূত নয়। এখন যদি ওই ধরনের একটি স্বাভাবিক

(১) **ইন্দ্রিয় ও চালক যন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা (Sensorimotor skills) :** আমাদের দেহে কতকগুলো সংবেদন সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় আছে। এইগুলিকে আমরা বলে থাকি গ্রাহক (Receptor)। যেমন চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ত্বক। এগুলোকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বলা হয়। আবার কতকগুলি সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ (motor organ) আছে যেগুলোকে আমরা কর্মেন্দ্রিয়ও বলে থাকি। গ্রাহক বাইরের তথ্য গ্রহণ করে এবং সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ সেই তথ্য বা খবর অনুযায়ী কাজ করে। কাজেই কোন সাধারণ কাজের জন্য এই দু-ধরনের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন। কোন কোন কাজে এই সমন্বয় এত স্বতঃসচল হয়ে যায় যে, এই সব কাজের সময় অন্যান্য কাজও অনায়াসে করতে পারি। এই ধরনের কাজের উদাহরণ হল হাঁটা, নাচা, লেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ নিপুণতা সহকারে করার জন্য পুনরাবৃত্তি বা শিখন প্রয়োজন।

(২) **প্রত্যক্ষণ ও সঞ্চালনক্রিয়ার সমন্বয়মূলক দক্ষতা (perceptnal motor skill) :** এই ধরনের শিখনে কোন বিশেষ প্রত্যক্ষণের (perception) সাথে সঞ্চালন ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটে। যেমন টাইপ করার সময় আঙুল রূপ কর্মেন্দ্রিয় বা চালকযন্ত্র স্বতঃশ্চলভাবে মেশিনের বিভিন্ন অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে চলে। তবে কখন কোন অক্ষরের উপর আঙুলের চাপ পড়বে তা নির্ভর করছে যিনি টাইপ করছেন তিনি টাইপ করার জন্য দেওয়া লেখাটিকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন বা করছেন তার উপর। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষণ ও আঙুলসঞ্চালনমূলক কাজের সমন্বয়ের উপর এই প্রকারের শিখন নির্ভরশীল।

(৩) **প্রত্যক্ষণমূলক শিখন (Perceptnal learning) :** পরীক্ষণলব্ধ বাস্তব সত্য হল এই যে আমাদের প্রত্যক্ষণ আমাদের শিক্ষণের উপর নির্ভর করে। বাহ্যিক জগতের ঘটনাসমূহ বা বস্তুসমূহকে সার্থকভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের শিখনের প্রয়োজন। এই ধরনের প্রত্যক্ষমূলক শিখনের উপর পাঠ্যবস্তুর শিখনও নির্ভরশীল। বিশেষ করে ভাষা শিক্ষা বা উচ্চারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রত্যক্ষণ প্রয়োজন।

(৪) **সংযোজনমূলক শিখন (Associative learning) :** আমাদের শিখনের বহুলাংশ জুড়ে আছে বিভিন্ন বস্তু, ধারণা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা অর্জন। আগের শেখা বা প্রত্যক্ষ করা কোন ধারণার সঙ্গে সার্থক সংযোগ স্থাপনের দ্বারা আমরা বহু নতুন ধারণা অর্জন করি। পড়াতে গিয়ে শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে কোন শব্দার্থ জিজ্ঞেস করেন তখন শিক্ষার্থীরা অনুরূপ কোন শব্দ বা ধারণার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে কিনা, তাই পরীক্ষা করেন।

(৫) **ধারণামূলক শিখন (Conceptinal learning) :** ‘ধারণা’ বলতে কোনো বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, অনুভূতি ও মনোভাবের সমাহারকে বোঝায়। এই ধারণা বস্তু বা পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক প্রত্যক্ষণ ও শিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

(৬) **আদর্শের শিখন (Learning of Ideals) :** ব্যক্তিসত্তার বিকাশকালে ব্যক্তির মধ্যে ছোটো ছোটো কিছু মানসিক সংগঠনের সৃষ্টি হয় যা তার আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই মানসিক সংগঠনকে আদর্শ বলা হয়। ব্যক্তিজীবনের আদর্শ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শিখনের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন সাধন করতে হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শ গড়ে তুলতে হবে। আদর্শের ভিন্নতার জন্য কোন ব্যক্তি সমাজসেবামূলক কাজ করে আবার কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে বেড়ায়। তাই সুনাগরিক তৈরি করতে হলে শিক্ষককে ছাত্রদের সমাজ অনুমোদিত বিশেষ বিশেষ আদর্শ গঠনে সাহায্য করতে হবে।

৩.৩.১ শিখনের শর্তাবলী (Conditions of Learning)

(১) শারীরিক শর্তাবলী (Physiological condition)—সুষ্ঠু শিখন অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থার উপর। রোগ বা অসুস্থতা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে শিখন কার্য বিঘ্নিত হয়।

(২) পরিনমন (Maturation) —পরিনমন হল ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফল। শিখন হল ব্যক্তির একটি দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া। অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ ও উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিনমন না ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব নাও হতে পারে।

(৩) শিখনের মানসিক শর্তাবলী (Psychological conditions) —সুষ্ঠু শিখনের মানসিক শর্তগুলিকে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) প্রেষণা (Motivation) —মানসিক শর্তগুলিব. মধ্যে প্রথমে আসে প্রেষণা বা যা শিখতে হবে তার শেখার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা।

(খ) মনোযোগ (Attention) —প্রষেণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে স্বাভাবিক ভাবেই মনোযোগের সৃষ্টি হয়। মনোযোগ কোন কিছু শেখার বিশেষ সহায়ক। অনেকে এই সঙ্গে আগ্রহকেও (Interest) যুক্ত করার পক্ষপাতী।

(গ) সংবোধন (Comprehension) — যে বিষয়টি শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হলে তাড়াতাড়ি শিখন কার্যটি সম্পন্ন হয়।

(ঘ) অভ্যাস বা অনুশীলন (Habit বা practice) —শিখনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা অনুশীলন থাকবেই। পুরাতন অনুপযোগী আচরণকে বাতিল করে নতুন উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়।

(ঙ) সক্ষমতা (Ability)—বুদ্ধি (Intelligence), বিশেষ প্রবণতা (Aptitude) ইত্যাদি মানসিক সক্ষমতা শিখনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

(৪) পবিবেশমূলক শর্তাবলী (Environmental Conditions) —(ক) অনুকূল পরিবেশ পরিবেশিক অনুকুলতা শিক্ষার গতিকে ত্বরান্বিত করে। অনুকূল ভৌত (Physical) পরিবেশ যেমন শিক্ষার সহায়ক তেমনি অনুকূল (social) সামাজিক পরিবেশত।

(খ) পরিচিত পরিবেশ (Known Environment)—যে পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থী পরিচিত সে পরিবেশে শেখা ভালো হয়।

৩.৩.২ শিখনের প্রকারভেদ (Types of Learning)

বিভিন্ন প্রকারের শিখন বলতে বোঝায় মানুষ কী কী ধরনের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে বা মানুষের শিখনের ক্ষেত্র কী কী। নীচে শিখনের এই প্রকারভেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করতে গিয়ে অনেকগুলি মতবাদ বা তত্ত্ব শিখনের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। এর অনেকগুলিই পরস্পর বিপরীত মতের অংশীদার। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কোনো মত বা তত্ত্বই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয় বা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। প্রত্যেকটি তত্ত্বই শিখনের এক-একটি দিককে ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু তার সমস্ত বৈচিত্র্যকে একযোগে ব্যাখ্যা করতে পারে না। শিক্ষাবিদ্ বা সেই জন্যই শিখনের তত্ত্বগুলি অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করেন। এখানে শিখনের মোট আটটি তত্ত্ব সহজবোধ্যভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিখনের সংজ্ঞা, শর্ত ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- প্যাভলভের অনুবর্তনবাদ ও তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- থর্নডাইকের মতবাদ ও তার মূখ্য ও গৌণ সূত্রগুলি লিখতে পারবেন।
- সূত্রগুলির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- স্কিনারের স্বতঃক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের বিবরণ দিতে ও তাৎপর্য বিচার করতে পারবেন।
- শিখনের গেস্টল্ট তত্ত্ব বলতে পারবেন।
- হালের আচরণ পারম্পর্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- টলম্যানের সংকেত গেস্টল্ট তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্ব ও অসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ শিখনের ধারণা (Concept of Learning)

জীবন ধারণের তাগিদে আমরা পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি। কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো বিশেষ আচরণ এই সংগ্রামেরই ফল আচরণের প্রকাশ এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা; এই যে আমরা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (Adaptation) করছি, এর ফলে আমাদের জন্মগত আচরণ ধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সহজাত প্রবণতা (Innate tendencies) ও জন্মগত আচরণগুলোর পরিবর্তিত হয়ে নতুন আচরণধারা আমাদের মধ্যে এনে দিচ্ছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা (Past exposience), প্রশিক্ষণ, এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদ, সব কিছু বাধ্য করছে নতুন আচরণ করতে। এই ধরনের আচরণ পরিবর্তনের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে শিখন (learning)। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাকেই শিখন বলে অথবা ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, এই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তাই হল শিখন।

একক ৩ ❑ শিখন প্রক্রিয়া (The Process of Learning)

গঠন

৩.১ সূচনা
৩.২ উদ্দেশ্য
৩.৩ শিখনের ধারণা
৩.৩.১ শিখনের শর্তাবলী
৩.৩.২ শিখনের প্রকারভেদ
৩.৪ শিখনের তত্ত্ব
৩.৪.১ প্যাভলভের অনুবর্তনবাদ
৩.৪.১.১ শিক্ষায় অনুবর্তনবাদের গুরুত্ব
৩.৪.২ থর্নডাইকের সংযোজন বাদ
৩.৪.২.১ থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী
৩.৪.২.২ শিখনের পাঁচটি গৌণসূত্র
৩.৪.২.৩ শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের সূত্রবলীর প্রয়োগ
৩.৪.৩ স্কিনারের স্বতঃক্রিয়ামূলক অনুবর্তন তত্ত্ব
৩.৪.৩.১ স্বতঃক্রিয় অনুবর্তনের শিক্ষাগত তাৎপর্য
৩.৪.৪ শিখনের গেস্টল্ট তত্ত্ব
৩.৪.৪.১ শিক্ষা ক্ষেত্রে গেস্টল্ট মতবাদের তাৎপর্য
৩.৪.৫ হালের আচরণ পরম্পর্যের তত্ত্ব
৩.৪.৬ টলম্যানের সংকেত গেস্টল্ট তত্ত্ব
৩.৪.৭ জিরোমি ব্রুনারের বৌদ্ধিক বিকাশ তত্ত্ব
৩.৪.৮ অসুবেলের অর্থপূর্ণ ভাষাভিত্তিক শিখন তত্ত্ব

৩.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষাবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল একটি মাত্র প্রশ্নের ভিত্তিতে মানুষ কেমন করে শেখে? কারণ শিখন প্রক্রিয়াটির সাধক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারলে, কী শেখাব, কোন পদ্ধতিতে শেখাব বা কীভাবে মানুষের সময় ও শ্রমের সবচেয়ে ভালো সদ্ব্যবহার করে অনেক বেশি শেখা বা শেখানো সম্ভব, এই সব প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। এই কারণেই গত একশত বৎসর ধরে মনোবিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে চেষ্টা করে আসছেন শিখনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

৭। শিক্ষায় জ্ঞানমূলক বিকাশের তাৎপর্য কী? (What is the signifincance of cognitive development in education.)

৮। জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরসমূহ কী কী? (What are the stages of cognitive development?)

৯। কোহলবার্গের মতে নৈতিক বিকাশের মূল্য উপাদান কী কী? (What are the basic constituents of moral development according to Kohlberg?)

১০। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ

(ক) উচ্চতার বিকাশ

(খ) ওজনের বিকাশ

(গ) কাঠামোর বিকাশ

(ঘ) স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ

(ঙ) প্রত্যঙ্গের বিকাশ

(৪) সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও বিবেক নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধের স্তর (Stage of Morality of Social System and Conscience)।

প্রত্যাশামূলক নীতিবোধের স্তরে, শিশুর নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় তার গোষ্ঠীর প্রত্যাশার দ্বারা। তা ছাড়া গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যও সে প্রয়োজনীয় নৈতিক আচরণ করে।

সমাজ নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধের স্তরে, শিশুর নৈতিক আচরণ নির্ধারিত হয় সামাজিক নিয়ম-কানুন রীতি-নীতি দ্বারা। শিশু ভাবে, সমাজের স্বার্থ ও নিয়মানুযায়ী আচরণ করাই নৈতিক।

সংস্কারমুক্ত নীতিবোধের দুটো স্তর হল—

(৫) সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধের স্তর (Stage of Morality of Social Contract) এবং

(৬) সার্বজনীন নীতিবোধের স্তর (Stage of Morality of Universal Ethics)।

সামাজিক চুক্তি নিয়ন্ত্রিত নীতিবোধের স্তরে ব্যক্তির নৈতিক আচরণ বিশেষভাবে নির্ধারিত হয় ব্যক্তির সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বের দ্বারা। ব্যক্তি তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করে যে তার কর্তব্য হল সামাজিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করা কেননা এগুলো দ্বারা সমাজের সকলের কল্যাণ হবে।

সার্বজনীন নীতিবোধের স্তরে ব্যক্তির নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় নিজস্ব বিচারবোধ বা যুক্তিতর্কের দ্বারা। এই স্তরের নৈতিক আচরণ আদৌ আত্মকেন্দ্রিক নয় বরং আত্মসম্প্রসারণকারী। ব্যক্তি সামাজিক নীতিগুলোকেই নিজস্ব যুক্তি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এই স্তরে ব্যক্তি তার নৈতিক আচরণগুলোর যুক্তি খুঁজে পায়।

প্রশ্নাবলী

১। বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে তোমার ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করো। বিকাশ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করো। (Clarify your concept about growth and development. List the characteristics of development.)

২। বিকাশের স্তরসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করো। (Discuss in detail the stages of development)

৩। বিকাশ ধারার নির্ধারক হিসেবে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা আলোচনা করো। (Discuss the roles of heredity and environment as determinants of development.)

৪। সঞ্চালনমূলক বিকাশের বর্ণনা দাও। শিক্ষায় সঞ্চালনমূলক বিকাশের গুরুত্ব কী? (Describe motor development. What is the importance of motor development in education?)

৫। প্রাক্ষোভিক বিকাশের বর্ণনা দাও। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্ষোভের স্বরূপ ও কারণ জানা একান্ত দরকার কেন? (Describe emotional development. Why is it essential to know the nature and cause of emotion in the field of education?)

৬। সামাজিক বিকাশ বলতে কী বোঝ? সামাজিক বিকাশের শর্তগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (What do you understand by social development? Narrate in brief the conditions of social development.)

নিরসনে সচেষ্ট হয়, তখন ব্যক্তির নৈতিক ধারণাগুলোর একদিকে যেমন হয় পৃথকীভবন (differentiation) তেমনি অন্যদিকে হয় তার বিভিন্ন ধারণাগুলোর ক্রমোচ্চস্তরে সমন্বয় সাধন। এই ধরনের প্রক্রিয়া ব্যক্তি ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) সময় সম্পাদিত হয়। আর তারই ফলস্বরূপ ব্যক্তির আচরণে সামঞ্জস্যতা আসে। কোহলবার্গের (kohlberg) মতে, এই জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি তার এই দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু অবসান ঘটাতে পারবে কিনা, তার নির্ভরশীল অন্য একটি উপাদানের উপর। এই উপাদানটি হল ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য (Role-taking ability)। ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য বলতে বোঝায় কোন পরিস্থিতিতে অন্যেরা কোন বিষয়কে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে ব্যক্তিও সেই পরিস্থিতে বিষয়টিকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারছে কিনা।

ব্যক্তির এই ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য নির্ভর করে বিশেষভাবে তার পূর্ব সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর আর সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে সে অতিরিক্ত সামাজিক অভিজ্ঞতাও অর্জন করে। অর্থাৎ, ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এই ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য যত বেশি তার নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাও তত বেশি।

কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের কতকগুলো স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্যক্তির বিকাশের প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত পর্যায়গুলো নিম্নরূপ—

প্রথম পর্যায়—প্রাক্ সংস্কার নীতিবোধের পর্যায় (Pre Comentional Morality) এই পর্যায়ে ব্যক্তির নৈতিক বিচারবোধ বিশেষভাবে নিজের স্বার্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—সংস্কার প্রভাবিত নীতিবোধের পর্যায় (Conventional Morality)—এই পর্যায়ে ব্যক্তির নীতিবোধ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় সামাজিক রীতি নীতির দ্বারা। পরিবার, খেলার দল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভাবেই এই সময়কার নৈতিক বিচারকরণের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়—সংস্কারমুক্ত নীতিবোধের পর্যায় (Post Conventional Morality) এই পর্যায়ে ব্যক্তির নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় আত্মস্বার্থ বা সমাজ স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তির যুক্তির (reasoning) দ্বারা। কোহলবার্গ, নৈতিক বিকাশের এই প্রত্যেক পর্যায়ে আবার দুটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এই স্তরগুলো ক্রমপর্যায়ে আসে। প্রাক্ সংস্কার নীতিবোধের পর্যায়ে যে দুটো স্তরের কথা বলা হয়েছে, সে দুটো হল—

(১) সামঞ্জস্যহীন নীতিবোধের স্তর (Stage of Heterogeneous Morality) এবং

(২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধের স্তর (Stage of Individualist Morality)।

সামঞ্জস্যহীন নীতিবোধের স্তরে শিশু ভালো মন্দ বিচার করে, শাস্তি এবং পুরস্কার দ্বারা। তার মতে যে আচরণ পুরস্কৃত করছে তাই ভালো আর যার জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে তাই খারাপ।

দ্বিতীয় স্তরে শিশুর নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার চাহিদার দ্বারা। চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য যে আচরণ শিশুর কাছে প্রিয় সে তাই করে। এর ফলস্বরূপ দেখা দেয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নীতিবোধের সংঘাত।

সংস্কার প্রভাবিত নীতিবোধ পর্যায়েও দুটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—

(৩) প্রত্যাশামূলক নীতিবোধের স্তর (Stage of Interpersonal Expectation Morality) এবং

এই স্তরে দেশ (স্থান) ও কাল (সময়) সম্বন্ধে মোটামুটি তার নিজের মতো একটা ধারণা গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য সে বোঝে না কিন্তু সম্পর্কগুলো সে শিখে নেয় এবং মেনেও নেয়।

২.১১.৩ মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (Concrete Operational Stage)

এর স্থায়িত্ব ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত। এই সময় শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষালাভে ব্যস্ত থাকে। সাধারণভাবে আরোহ যুক্তির বিকাশ ঘটে কিন্তু অবরোহ যুক্তি তখনও আদিম পর্যায়ে থাকে। তারা বুঝতে শেখে যে বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করলেও বস্তুর পরিমাণ একই থাকে। তারা বস্তুর বা ধারণার শ্রেণিবিভাগ করতে শেখে। এই স্তরেও চিন্তা মূর্ত অবস্থা থেকে বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারে না। সাংখ্যমান, ওজন ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা না থাকলেও মৃত্যু যে স্থায়ীভাবে একটি মানুষের চলে যাওয়া, এই ধারণা গড়ে ওঠে।

২.১১.৪ প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Formal Operational Stage)

১১ বৎসর থেকে পরবর্তী সময়ে, যা কৈশোর কালের সমসাময়িক, শিশুর বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে। চিন্তায় মূর্তবস্তু অপেক্ষা তার প্রতীক অধিক গুরুত্ব পায়। বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সমস্যার সমাধান সহজতর হয়। বীজগণিত, জ্যামিতিক সমস্যার অবরোহমূলক সমাধান তারা সহজেই করতে পারে। প্রদত্ত তথ্য অন্য আকারে প্রকাশ করা, তার রূপান্তর ঘটানো, এবং তথ্যের বাইরে সম্ভাব্য তাৎপর্য অনুধাবনে শিশুরা অধিক আনন্দ পায়। এই জন্যই অনেক সময় তারা সমবয়স্কদের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় মনোভাব আদান প্রদান করতে ভালোবাসে। জন্ম-মৃত্যুর তাৎপর্য তার কাছে পরিষ্কার হয়। সামাজিক সম্পর্কের ও রীতিনীতির মূল ভিত্তিটি সে বুঝে নিতে চায় এবং বুঝতে পারে।

পিঁয়াজের তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা সমালোচনা থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সে জন্য পরবর্তী তাত্ত্বিকরা আরও নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে শিক্ষাবিদ্দের নিকট পিঁয়াজের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

২.১২ নৈতিক বিকাশ (Moral Development)

নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে লরেন্স কোহলবার্গ-এর (Lawerence Kohlberg) অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছেন আমাদের ব্যক্তিজীবনে নৈতিক বিকাশের মূল উপাদান তিনটি—(১) জ্ঞানমূলক বিকাশ (cognitive development), (২) জ্ঞানমূলক স্তরের দ্বন্দ্ব (cognitive conflict) এবং সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের সামর্থ্য (Role-taking ability)। তাঁর মতে ব্যক্তির নৈতিক বিচার তার জ্ঞানমূলক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। তবে জ্ঞানমূলক বিকাশই নৈতিক বিকাশের একমাত্র শর্ত নয়। নৈতিক বিকাশে অন্য যে উপাদান সাহায্য করে, তা হল জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির মধ্যে দু-ধরনের বিপরীতধর্মী বিশ্বাস আবির্ভূত হলে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন ব্যক্তির নিজস্ব দুটো বিশ্বাস—'মিথ্যে কথা বললে শাস্তি পেতে হয়' এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা 'আমার বন্ধু তো হামেশাই মিথ্যে কথা বলে কিন্তু কখনও তো শাস্তি পেতে দেখলাম না' তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তির নীতিবোধ তার আন্তর দ্বন্দ্ব ও অন্তর বহির্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। ফলে ব্যক্তির জ্ঞানমূলক স্তরে সাম্যব্যবস্থা। ফিরে আসে। ব্যক্তি এইভাবে যখন তার জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের

ব্যক্তির নিজস্ব সংগঠন ও পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফলে, ব্যক্তিজীবনের জ্ঞানমূলক বিকাশ ঘটে থাকে।

পিঁয়াজে সদ্যজাত শিশুর দুটো বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে জন্মসূত্রে এই দুটো বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। (১) আমাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (reflex) করার কতকগুলো ক্ষমতা থাকে। পিঁয়াজে এইগুলোকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত না করে এদের নামকরণ করেছেন বংশগতিধারায় প্রাপ্ত জৈবিক প্রতিক্রিয়া। এইগুলোর মাধ্যমে শিশু পূর্ব নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশের মোকাবেলা করে। (২) তিনি বলেছেন শিশুরা স্বভাবতই সক্রিয় এবং এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশের মোকাবেলা করে। এই স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়ার দ্বারা জীবন বিকাশ কীভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেছেন জৈবিক অভিযোজনের (biological adaptation) মূল সূত্র ও নীতিগুলিকে। তাঁর মতে জৈবিক সক্রিয়তার পেছনে দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী উপাদান রয়েছে যেগুলো হল—(ক) আত্তীকরণ প্রক্রিয়া (assimilation) ও (খ) সহযোজন প্রক্রিয়া (accomodation)।

সাধারণভাবে প্রাণীর আত্মসংরক্ষণের (self-preservation) প্রবণতাকে বলা হয় আত্তীকরণ। অন্যদিকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া বা পরিবেশের প্রভাবে প্রাণীর আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সহযোজন। পিঁয়াজের মতে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সে এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। আর এই সামঞ্জস্য বিধানের ফলশ্রুতিতে হয় শিশুর পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (adaptation)। শিশু আত্তীকরণ ও সহযোজনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ক্রমোন্নত অভিযোজনের পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে। এরই ফলে ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

পিঁয়াজে মানুষের জ্ঞানমূলক বিকাশের ক্ষেত্রে চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এই স্তরগুলো নির্ধারিত করা হয়েছে শিশুর বয়সের ভিত্তির মানদণ্ডে অর্থাৎ এই স্তরগুলো শিশুর বয়সভিত্তিক। তবে এই বয়স কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নয়। মোটামুটি গড়পড়তা হিসেবে তিনি এই সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। নীচে এই স্তরগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

২.১১.১ সংবেদন-সঞ্চালন স্তর (Senrory-motor stage)

এই স্তরের ব্যাপ্তিকাল জন্ম থেকে ২ বৎসর পর্যন্ত। এই সময় শিশুদের বহির্জগত সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণের জন্য হাত, পা ও ইন্দ্রিয়গুলো প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে শিশুর কাছে সমস্ত জাগতিক সমস্যাই সংবেদনমূলক ও সঞ্চালনমূলক। তার সমাধানও এই প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে করতে সচেষ্ট হয় শিশুরা। যেমন হাত দিয়ে কোনো বস্তুকে মুঠো করে ধরলে তার আকৃতি (গোল কিংবা ঘনকাকার) সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয় আবার তার দৃশ্যরূপটিও তার সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটা সম্পূর্ণ কিন্তু সাময়িক ধারণা সৃষ্টি হয়।

২.১১.২ প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর (Pre-operational Stage)

এই স্তরের স্থায়িত্ব ২ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত। এই সময়টা মোটামুটিভাবে প্রাক্প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। সংবেদন ও সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুরা যে ধারণা তৈরি করে এই পর্যায়ে তার একটা প্রতীকীরূপ (symbolic representation) সে তৈরি করে নেয়। এই সময় ভাষার দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফলে প্রতিটি ধারণার একটা নাম দেওয়া সম্ভব হয় এবং ওই নামটি সমগ্র ধারণাটির প্রতিভূ হিসাবে কাজ করে। এই সময়ে খেলার মধ্য দিয়েও সে জগৎকে বুঝতে চায়। সেজন্য তার খেলাগুলো প্রায়ই কোনো বাস্তব ঘটনার (যেমন, রান্না করা, বাবার মতো অফিস যাওয়া ইত্যাদি) অনুকরণ বলে মনে হয়।

সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে গিয়েই শিশুর আচরণে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা গৃহ পরিবেশে যে ধরনের সামাজিক আচরণের মান শিশুর সামনে তুলে ধরেন সেই শিক্ষাই শিশু গ্রহণ করে। অর্থাৎ শিশু যেমন দেখে তেমনই শেখে।

শিশুর সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, বয়সের পরিণতি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুও তার আচরণের ধারাকে বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণের পথে এগিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি। আমরা জানি সব শিশু সমান বুদ্ধির অধিকারী নয়। তাই সকলের পক্ষে সমানভাবে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয় না। উন্নত বুদ্ধির শিশুরা সহজেই সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করে নেয়। সাধারণ স্তরের সামাজিক আচরণগুলি আয়ত্ত করতে সাধারণ মানের বুদ্ধিই যথেষ্ট। বুদ্ধির মাধ্যমেই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে হয়। যারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তারা স্বভাবতই অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

তৃতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুরা যে পরিবেশে যেমনভাবে লালিত পালিত হয় সেই পরিবেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি প্রভৃতি তার বিকাশধারাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে শিশু কীভাবে গড়ে উঠছে, তার মধ্যে থেকেই প্রকাশ পায় তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ, নৈতিক বোধের বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের সর্বাঙ্গীণ ছবি। সুতরাং শিশুর এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের সন্তুষ্টির মধ্যে দিয়েই সামাজিক অভিযোজনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থত রাষ্ট্র বা সরকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে।

সবশেষে বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি মানুষের সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে মানুষে মানুষে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাণের ওপর তার সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্যেই কারও মধ্যে কোনো সামাজিক গুণ বেশি বেশি পরিমাণে দেখা যায় আবার কারও মধ্যে কম পরিমাণে দেখা যায়। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই মানুষ পরিবেশের প্রভাবকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে জীবন যাত্রার মানকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব। সে সংঘবদ্ধ জীবনে পছন্দ করে। যে সামাজিক পরিবেশে সে বড়ো হয় তার আদর্শ অভিজ্ঞতাকে সে কাজে লাগাতে থাকে। তার মধ্যে দিয়েই সে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পারে। এই সার্থক জীবনে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক অভিযোজনের। এই সামাজিক অভিযোজন নির্ভর করে তার সামাজিক বিকাশের উপর। সমাজ একটি গতিশীল সত্তা। এই গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন। ব্যক্তির মধ্যে সমাজ চেতনা যদি না জাগে তা হলে সে সমাজ জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক চেতনা সামাজিক বিকাশের ফলেই আসবে। মানুষকে বিচার করা হয় তার সামাজিক উপযোগিতার মধ্যে দিয়ে। তার মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা।

২.১১ জ্ঞানমূলক বিকাশ (Cognitive Development)

জ্ঞানমূলক বিকাশতত্ত্বের জনক সুইশ চিন্তাবিদ্ জ্যাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget)। জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার (cognition) আওতায় স্মরণ করা, চিন্তা করা, ধারণা গঠন করা ইত্যাদি সবরকম মানসিক প্রক্রিয়াই অন্তর্ভুক্ত। পিঁয়াজে বলেছেন

‘না’-এর মানে তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ‘না’ বললে সে যে কাজে ব্যাপৃত ছিল তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে। বছর দেড়েকের হলে শিশুর মধ্যে বয়স্কদের মতো একটা অনীহা দেখা যায়। এই সময়ে শিশুরা প্রাণহীন ও প্রাণবান এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। দু-বছর বয়সের আগে তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকে। দু-বছর বয়সের পরেও সমবয়সীদের সঙ্গে বেশিক্ষণ মানিয়ে নিয়ে খেলাধুলা করেত পারে না। কিন্তু তিন বছর বয়সের পর এই শিশুদের মধ্যে একটু মানিয়ে নেবার ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়কার সহযোগিতা ও আত্মগর্ববোধের প্রবণতা শিশুর সামাজিক বিকাশের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। শুধু তাই নয় এই সময়ে তার মধ্যে সমবেদনা, কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো সামাজিক প্রবণতার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে তার মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তারা দলবদ্ধতাকে খেলাধূলা করতে পছন্দ করে এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দলের প্রতি অনুগত্য এই বয়সের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য যা শিশুর সামাজিক বিকাশের পরিচায়ক। বার বছর বয়স পর্যন্ত এই দলগত আনুগত্যের মধ্যে দিয়েই তাদের সামাজিক বিকাশের রূপ ফুটে ওঠে।

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করার সময় থেকে এই সামাজিক বিকাশ একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এগোতে থাকে। সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার একটা প্রবণতা দেখা যায়। দলের প্রতি আনুগত্য দৃঢ় রূপ নেয়। সহযোগিতা, সমবেদনার ছবিও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিশোর মনের বিভিন্ন প্রত্যাশার মধ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রবণতা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এই পথ অনুসরণ করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হতে থাকে।

২.১০.২ সামাজিক পরিনমন (Social Maturity)

সামাজিক বিকাশের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক পরিনমন। সামাজিক পরিনমন বলতে আমরা বুঝি কোনো বিশেষ বয়সের উপযোগী সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে। যেমন একটি তিন বছরের ছেলে বা মেয়ের ওই বয়সের যে যে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত কর সম্ভব তা করতে পেরেছে কিনা। যদি আয়ত্ত করতে পারে তা হলে আমরা তাকে সামাজিক বিকাশের দিক দিয়ে পরিণত বলবো। বর্তমানে মনোবিদ্‌গণ সামাজিক পরিনমন পরিমাপের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং অনেক অভীক্ষাও (test) তৈরি করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী অভীক্ষা হচ্ছে ভাইন্‌ল্যান্ড সোস্যাল ম্যাচুরিটি স্কেল (vineland social maturity scale)। এই অভীক্ষাটিতে বয়স-উপযোগী কতকগুলি আচরণের বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে তার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়ে থাকে। এই পরিনমন ব্যক্তির জীবনে হঠাৎ আসে না। তার জন্য তাকে সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। পারিপার্শ্বিকতার ক্রিয়াশীল প্রভাবের মধ্য দিয়েই এই পরিনমনের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব।

২.১০.৩ সামাজিক বিকাশের সহায়ক শর্ত (Factors Affecting Social Development)

শিশুর সামাজিক বিকাশ বিভিন্ন বাহ্যিক উপাদানের সম্মিলিত ফলস্বরূপ দেখা দেয়। এই বিকাশের সহায়ক শর্তের মধ্যে যেমন পড়ে সহজাত শক্তি আবার পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে অর্জিত শক্তির ভূমিকাকেও ফেলে দেওয়া যায় না। এই বাহ্যিক উপাদানের অবদান অনস্বীকার্য। শিশুর সামাজিক বিকাশ গৃহ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণেই গড়ে ওঠে। শিশুর সমাজ পরিবেশ বলতে বোঝায় তার বাবা-মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ। এই প্রাথমিক গোষ্ঠী-মানুষজনদের

শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক বিকাশের সহায়তা করতে হবে। এই গুরুদায়িত্ব বহন করে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক পরিনমন যাতে আসে তার চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয় বয়স উপযোগী মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই মূল্যবোধ সঠিকভাবে জাগ্রত করতে পারলে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক বিকাশ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে, সার্বিক ব্যক্তিত্বের গঠন সার্থকরূপে বিকশিত হবে।

২.১০ সামাজিক বিকাশ (Social Development)

শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে না সামাজিক না অসামাজিক। সে কেবলমাত্র একটি সজীব সত্তা যে খুব সীমিত পরিবেশে নিজের দেহ-সংগঠনের মাধ্যমে অভিযোজন করতে পারে। মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘ। সে বাবা মা ও আরও অনেক বয়স্ক লোকেদের উপর নির্ভর করে বড়ো হতে থাকে; শুধুমাত্র জৈবিক ক্ষমতা বৃদ্ধির অপেক্ষায় নয়, জীবনের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্যে। এই অসহায় অবস্থায় সে যাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে তার মাধ্যমেই তার মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায়। এইভাবে ক্রমশ সে সমাজ চেতনাহীন শিশু থেকে সামাজিক মনোভাবাপন্ন মানুষে পরিণত হয়। পরিবেশই তাকে সমাজধর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রথম অবস্থার আত্ম কেন্দ্রিক ও আত্মনিয়োগ ভাবের পরিবর্তন ঘটে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে সে তার সম্পর্কের ক্রমবিকাশ ঘটায়। প্রায় সব মানুষই সমাজ নির্দিষ্ট সঠিক লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে নিরন্তর সচেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিক বিকাশ হল সামাজিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া (নমনীয়) আচরণ গঠন যা ওই ঐতিহ্যের অনুসারী।

এই সামাজিক বিকাশকে সাধারণত দুই দিক থেকে বিচার করা হয়ে থাকে—(এক) সামাজিকীকরণ (Socialisation) এবং (দুই) সামাজিক পরিনমন (Social Maturity)।

২.১০.১ সামাজিকীকরণ (Socialisation)

জন্মাবস্থায় শিশু থাকে সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে নিয়েই তার সবকিছু। পৃথিবীটাকে স্বার্থপরের মতো সে তার নিজস্ব পৃথিবী বলে মনে করে। তার প্রত্যাশার পরিমাণও কম থাকে না। আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সে কোনোরকম প্রতিক্রিয়াই করতে পারে না। এই সময়ে শিশুরা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায় না। শুধু তাই নয় প্রাণী ও নির্জীব পদার্থের মধ্যেও তার নিকট কোনো পার্থক্য নেই। শুধু মাত্র উদ্দীপক হিসেবেই প্রাণী ও নির্জীব বস্তু এই উভয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে থাকে। দুই মাস পর্যন্ত এই ভাবেই চলতে থাকে তার উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়।

জন্মের প্রথম দুটি মাসে শিশু তার পাশাপাশি বয়স্কদের সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সময় সে মাকে চিনতে পারে এবং বয়স্কদের সঙ্গে হাসির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া করে। তিন চার মাস বয়সে দেখা যায় তার নানা রকম সামাজিক প্রতিক্রিয়া। শিশুর পাশে কেউ দাঁড়ালে সে কান্না থামিয়ে দেয়, পাশ থেকে চলে গেলে কান্না আরম্ভ করে ইত্যাদি। ৫/৬ মাস বয়সে আদর ও ধমকের পার্থক্য বুঝতে পারে। নতুন লোক চিনতে পারে ও তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলে যেন বাঁচে। ৮/৯ মাস বয়সে বয়স্কদের মুখের শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এক বছর বয়সে

অভিজ্ঞতার অনেক স্মৃতি শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে থাকে। তবে শিশু অবস্থায় যে সমস্ত উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় একটু বড়ো হলে সেইসব উদ্দীপকে আর প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় না।

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের অনুভূতি দৈহিক নিরাপত্তা ও সুখের উপর সীমাবদ্ধ। এই সময়ে অন্য কোনো চিন্তা বা ধারণার উন্মেষ ঘটে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তা থেকেও প্রক্ষোভ উদ্দীপনার উন্মেষ ঘটে থাকে। যেমন, নিজের ও ভালোবাসার পাত্রের উপর নিন্দায় দুঃখিত হয়, নিজের ব্যর্থতার ভয় নিয়ে চিন্তা ইত্যাদি। শুধুমাত্র দেহ ও মনের পরিণতি বা উদ্দীপকের প্রকৃতি নিয়ে প্রক্ষোভের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় না। শিশুর মানসিকসংগঠন ও আভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার প্রক্ষোভের প্রকাশ, স্বরূপ এবং তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন, আগে হয়ত কোন কিছু দেখলে শিশু মনে কোনো ভাবের উদয় হত না, কিন্তু এখন সেই সব জিনিস দেখে তার মনে আনন্দ বা বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। কোনো শিশু হয়তো খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায় আবার কেউ পরীক্ষায় এক নম্বর কম পাবার জন্য দুঃখ পায়। এই সব প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিপ্রবণতার পরিবর্তন নির্ভর করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার মানসিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উপর।

২.৯.২ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ (Development of Emotional Reaction)

শিশুকাল থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত এই প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। জন্মাবস্থায় শিশুদের প্রক্ষোভ ও তার প্রতিক্রিয়া দুটিই সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ব্রিজ্-এর মতে, তিনমাস বয়স থেকেই প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ (differentitation) প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে। প্রথমে আনন্দ (delight) এবং সুস্থভাব (distress) এই দু-ধরনের অনুভূতি থেকে প্রক্ষোভের বিকাশ শুরু হয়। ছ-মাস বয়সে আনন্দরূপ প্রক্ষোভটি থেকে উচ্ছ্বাস বা হর্ষের উৎপত্তি হয়। নয় দশ মাস বয়সে এই প্রক্ষোভ থেকে বড়োদের প্রতি ভালবাসা এবং পনেরো মাস বয়সে সমবয়সী বা ছোটোদের প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়। সেই রকম দুস্থভাব-রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়সে পৃথকীকরণ হয়ে রাগে ও পাঁচ ছয় মাসে বিরক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের পৃথকীকরণ হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভের পৃথকীকরণের পরিবর্তন যেমন হয় সেই রকম বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়। ছোটোবেলায় রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে যে বাহ্যিক অভিব্যক্তির প্রকাশ শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাগেরই বহিঃপ্রকাশ পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই রকম আনন্দ, দুঃখ ও অন্যান্য প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিগুলিও ধীরে ধীরে সুসংগত, সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্য উপযোগী হয়। কিন্তু প্রক্ষোভ যখন তীব্র রূপ ধারণ করে তখন সব বয়সের মানুষের আচরণে অসংযত, অসংহত সমন্বয়হীন ভাবই ফুটে ওঠে। সাধারণ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হয় না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। শিশুকে সার্থক ও সঠিকপথে পরিচালিত করতে গেলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ জানা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বরূপ বুঝতে না পেরে পিতা-মাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় তাদের আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের ভুল বোঝেন। যেমন, কোনো শিশুর অনাসক্ত ও উদাসীন ভাব দেখে অনেক সময় মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মনে করেন শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার অনাসক্ত ও সংযত মনের পরিচায়ক। কিন্তু এমন ধারণাও হতে পারে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে সেই কারণে তার সকলের প্রতি রাগ ও অসন্তোষ জেগেছে তাই সমস্ত কিছুতেই তার অনাসক্তি দেখা দিয়েছে। ওই ভুল ব্যাখ্যার ফলে সমস্ত শিক্ষা প্রচেষ্টাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এবং শিশুটির সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

এই প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনকে প্রাক্ষোভিক বিকাশ (emotional development) বলা হয়।

ইংরেজি 'ইমোসন' কথাটি এসেছে ল্যাটিন 'ইমোভিয়ার' শব্দ থেকে যার অর্থ উত্তেজিত হওয়া বা ক্ষুব্ধ হওয়া। সুতরাং প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় মানুষের এমন একটি মানসিক অবস্থা যাতে সে উত্তেজিত বা ক্ষুব্ধ হয়। এই প্রক্ষোভের দ্বারা যখন কোনো মানুষ প্রভাবিত হয় তখন সে দেহ মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার শারীরিক ও মানসিক সাম্যাবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

জন্মাবস্থায় শিশুদের কী ধরনের প্রক্ষোভ থাকে তাই নিয়ে বিভিন্ন মনোবিদ নানা ধরনের পরীক্ষা করেছেন। সুসান আইজাকস্ (susan issacs) শিশুদের চার ধরনের প্রক্ষোভমূলক আচরণের কথা বলেছেন যথা, ভয় (fear), রাগ (anger), ভালোবাসা (love) এবং ঘৃণা (hate)। ওয়াটসন্ (watson) প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ভয় (fear), রাগ (anger) এবং ভালোবাসা (love) এই তিনটি শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। শেরম্যান (sherman) তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু তা খুব একটা স্বচ্ছ নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ব্রিজ (bridge) বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সদ্যজাত শিশুরা উদ্দীপকের পৃথকীকরণ করতে পারে না কিন্তু প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া করে থাকে। তারফলে অনুভূতিরও পৃথকীকরণ হয় না। কিন্তু তিন মাস বয়স থেকে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া করতে থাকে।

সবশেষে বলা যায় মানুষের আচরণে স্বরূপ বুঝতে গেলে তার বিভিন্ন প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক পরিচিতি প্রয়োজন। শুধু তাই নয় এই প্রাক্ষোভিক বিকাশ ধারাকে ঠিক পথে পরিচালিত না করতে পারলে শিশুর শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন এবং ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। সুতরাং সফল জীবন গড়ার জন্যে সুষম প্রাক্ষোভিক বিকাশ প্রয়োজন।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ সংগঠিত হয় দুই দিক থেকে—প্রাক্ষোভিক উদ্দীপকের পরিবর্তন এবং প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন।

২.৯.১ প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ (Development of Emotional Excitation)

জন্মাবার পর থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে যে ধরনের প্রক্ষোভ দেখা যায় তা প্রাথমিক চাহিদাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। যদি কোন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক শিশুর চাহিদা মেটানোর পরিপন্থী হয় তা হলেই তার মধ্যে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ হতে থাকে। অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে। সুতরাং তখন শুধুমাত্র প্রাথমিক চাহিদার উপর আর এই প্রক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকে না। উদ্দীপনার সীমান্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম পর্যায়ে শিশুরা কেবলমাত্র উচ্চ পর্যায়ের শব্দে ভয় পায়, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম উদ্দীপক থেকে এই ভয় দেখতে পাওয়া যায়—বিশেষ করে কুকুর, বেড়াল, অন্যান্য জীবজন্তু, নিকটতম ব্যক্তির বিপদের আশঙ্কা ইত্যাদি। বয়স বাড়ার, সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপলব্ধি শক্তি, মানসিক সামর্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার হয় বিকাশ।

শৈশবকালে ভবিষ্যত ও অতীত সম্পর্কে ধারণা ও কল্পনার বিকাশ না হওয়ার জন্য শিশুদের কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা শক্তির বিকাশের ফলে অতীত

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াপ্রবণতার দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে কেবল হাত পা নাড়া, মুখে শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেলা সীমাবদ্ধ। আরও একটু বড়ো হলে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, মারামারি, ধাক্কা-ধাক্কি ইত্যাদি খেলার রূপ নেয়। এর পরে জটিলতর মিশ্র সঞ্চালনমূলক আচরণের মাধ্যমে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, হকি খেলা ইত্যাদি যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় শিশু নিজেকে নিয়োজিত করে। শিশুর দৈহিক বিকাশের প্রথম দিক দিয়ে খেলার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু ৮/৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় খেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বস্তুত যা হয় তা হল; খেলার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কমে যায়।

এক বছর বয়সের সময় শিশুরা ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত ব্যবহার করতে অধিকতর পছন্দ করে। কিন্তু বড়ো হলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই ডান হাতের ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে। মনোবিদ্‌দের মতে বাঁ হাতের বদলে এই যে ডান হাতের ব্যবহার তার মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য অভিভাবকদের চাপেই সংগঠিত হয়ে থাকে। যদি এই চাপ না দেওয়া হত সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীতে ন্যাটার সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত।

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনো একটি বিশেষ কাজে কেউ দক্ষ হয়ে উঠলে সে যে অন্য কাজেও সুদক্ষ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই বিদ্যালয়ে যাতে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও ব্যায়ামগারের ব্যবস্থা থাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

২.৮.১ শিক্ষায় সঞ্চালনমূলক বিকাশের গুরুত্ব (Importance of motor Development in Education)

শিক্ষার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে সঞ্চালনমূলক দক্ষতা (motor skill)। শিশুর চলাফেরা অর্থাৎ হাঁটতে শেখার সঙ্গে তার প্রজ্ঞামূলক (cognitive) বিকাশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। হাত ও চোখের সমন্বয় (eye-hand coordination) বস্তুর দূরত্ব, আকৃতি গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টির জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ। পঠন দক্ষতাও (reading skill) কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ, ভাষার বিকাশ ও চক্ষুগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত। শিশুরা একটু বড়ো হয়ে যখন লিখতে শেখে বা বিভিন্ন অঙ্কণ বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে তার প্রায় সবটাই নির্ভর করে উপযুক্ত সঞ্চালন বিকাশের উপর। এই কারণেই শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার লক্ষ্যের যে শ্রেণি বিভাগ করেছেন তার মধ্যে সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যগুলির (psychomotor objectives) শ্রেণি বিন্যাস বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সঞ্চালন বিকাশ যেহেতু পরিণমন (maturation), শিখনের সুযোগ (learning opportunity) এবং প্রশিক্ষণ (training) এই তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেজন্য পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও সঞ্চালন বিকাশের স্তর অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

২.৯ প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development)

জন্মের পর থেকে মানসিক ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া ছাড়া মানব মনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ মানুষের আচরণে ফুটে ওঠে। প্রক্ষোভ হচ্ছে মানুষের মনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের অধিকাংশ আচরণই এই প্রক্ষোভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রক্ষোভ সব সময়ই দৈহিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই আচরণকে বলা হয় প্রক্ষোভমূলক আচরণ (emotional behaviour)। জন্মের পর থেকে ব্যক্তিজীবনে

২.৮ সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development)

দেহের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় শিশুর হাত, পা, পেশীর সঞ্চালনের ক্ষমতা, গতি এবং ত্রুটিহীনতা বর্ধিত হওয়ার ফলে। দেহের শক্তি, সমন্বয়, তৎপরতা, এবং কর্মেন্দ্রিয় সমূহের যথাযথ ব্যবহারের বিকাশকেই আমরা সঞ্চালনমূলক বিকাশ বলে অভিহিত করে থাকি। শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদির বিকাশ সঞ্চালনমূলক বিকাশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকগুলির বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধ তা পরীক্ষিত সত্য। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিশুর প্রথম শৈশবে তার বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন নেহাতই অবিন্যস্ত, সমন্বয়হীন ও অসংহত। কিন্তু ধীরে ধীরে হাত-পায়ের ব্যবহারে, চলাফেরার অঙ্গাশৈলীতে, চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধন ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত হতে থাকে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু ২ মাসে থুতনিটা মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে কেউ তাকে ধরে থাকলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে একা বসতে পারে এবং সামনে কিছু দোলালে তা হাত দিয়ে ধরতে পারে, ৭ মাস বয়সে, একা একা বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য পেলে দাঁড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অন্যের হাত ধরে চলতে পারে, ১৩ মাসে একা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিনা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে একা একা চলতে পারে।

শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হল সাধারণমুখী আচরণ থেকে বিশেষধর্মী আচরণে উন্নীত হওয়া। প্রথমে শিশু সমস্ত দেহকান্ড, হাত-পা, ইত্যাদি অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাকে ব্যবহার করে কোনো লক্ষ্য বস্তুকে ধরার জন্য। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের পৃথকীকরণ ঘটে অর্থাৎ কোন কাজটার জন্য কোন অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের ব্যবহার প্রয়োজন তা সে বুঝতে পারে। এটাই হল বিশেষধর্মী আচরণ। এই বিশেষধর্মী আচরণের ফলে সে বিশেষ প্রকারের কাজ করতে সমর্থ হয়, যেমন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের ব্যবহার শেখে ইত্যাদি।

সে আরও বড়ো হলে পর এই বিশেষধর্মী আচরণগুলো জটিলতর ও মিশ্রধর্মী হতে শুরু করে। শিশু প্রথম দিকে বিশেষধর্মী আচরণে দক্ষ হয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত করে। তার পরের ধাপে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ওই আচরণগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং শিশু জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণে শক্ত সমর্থ হয়ে ওঠে। যেমন শিশু প্রথমে 'দৌড়ান' রূপ বিশেষধর্মী আচরণটি শিখলো। আবার সে 'বল ছোঁড়া' রূপ বিশেষ আচরণটি পৃথকভাবে শিখলো। পরের ধাপে, সেই শিশুটি এই দুটো বিশেষধর্মী আচরণকে যুক্ত করে ক্রিকেট খেলার সময় দৌড়তে দৌড়তে বল ছুঁড়তে শিখলো। বলা বাহুল্য এই 'দৌড়তে দৌড়তে বল ছোঁড়া' নিঃসন্দেহে একটি জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণ।

মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কৌশল অনেক উন্নতমানের। এর কারণ হল যে, ছেলেরা সঞ্চালনমূলক আচরণের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্মায়। আর মেয়েদের শারীরিক সংগঠনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনের পক্ষে ছেলের মতো ততটা অনুকূল নয়। তা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল আমাদের সামাজিক পরিবেশে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরই বেশি দৌড়ঝাপে উৎসাহিত করা হয়। ফলে মেয়েদের পক্ষে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক অনুশীলনে তাদের সঞ্চালনমূলক দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগও কম। এই সকল কারণে মেয়েদের সঞ্চালন পটুতা ছেলেদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

২.৭.৩ কাঠামোর বিকাশ (Development of Skeletal structure)

মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ আলাদা আলাদা ভাবে হয়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশের হার ভিন্ন রকমের। ১৮ বছর বয়সের সীমারেখার মধ্যেই এই বিকাশ শেষ হয়। শিশু যখন জন্মায় তার মাথার আয়তন সাধারণত গড়ে ৩৫ সে.মি. থাকে। এই মাথার বিকাশের হারও খুব ধীর গতিতে হয় এবং পরিমাণও কম। ১২ বছর বয়সে এই বিকাশের কাজ প্রায় ৯৪ শতাংশ শেষ হয়ে যায়। ছেলেদের মাথার আয়তন সব স্তরেই মেয়েদের চেয়ে বড়ো হয়। জন্মাবার পর থেকেই মুখের অবয়বের (facial structure) পরিবর্তন হতে থাকে। কপাল চওড়া হয়। চোয়ালের হাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে; তার জন্যেই মুখের কাঠিন্য দেখা দেয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাকের আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এবং ১৪ বছর বয়সের মধ্যে পূর্ণ রূপ ধারণ করে। দেহকাণ্ডের (trunk) পরিবর্তন বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিকাশের রূপ ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। জন্মাবার সময় শিশুদের দেহকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্যের আবির্ভাব হতে থাকে।

২.৭.৪ স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ (Development of Nevours System)

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই দ্রুত হারে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ হতে থাকে। এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে স্নায়ুকোষ দিয়ে স্নায়ুগুলো গঠিত তার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩-৪ বছর বয়স পর্যন্ত এই বিকাশের হার খুব দ্রুত গতিতে হয়। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মস্তিষ্কের বিকাশ। ৪ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক খুব দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। তারপর এই বিকাশের হার কমতে থাকে। এই বিকাশের হার আবার বৃদ্ধি পায় ৮ বছর বয়স নাগাদ এবং পরিপূর্ণ রূপ নেয় ১৬ বছর বয়সে। এই বয়সে মাথার আয়তনের বৃদ্ধি না হলেও তার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে থাকে।

২.৭.৫ প্রত্যঙ্গের বিকাশ (Organic Development)

জন্মাবার পর থেকে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ যেমন হয় সেই রকম বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের বিকাশও হতে থাকে। এর ফলেই মানব জীবনের যে বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায় তা সম্ভবপর হয়। রক্ত সংবহনতন্ত্র (circulatory system), শ্বাসতন্ত্র (respiratory system), পাচনতন্ত্র (diagestive system), গ্রন্থিতন্ত্র (glandular system), জননতন্ত্র (reproductive system) ইত্যাদি তন্ত্রসমূহের বিকাশ যথা সময়ে সঠিক ধারা বজায় রেখে না হলে বিকাশ সম্ভবপর নয়। তাই এই যান্ত্রিক বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র রয়েছে। হৃদযন্ত্র (heart) এবং ফুসফুস (lungs) এর বিকাশ নিজস্ব প্রকৃতিতে হয়। ৬-৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের হৃদযন্ত্র মেয়েদের চেয়ে কিছুটা বড়ো থাকে। কিন্তু ৯-১০ বছরে ঠিক এর বিপরীত ছবি দেখা যায়। আবার ১৩-১৪ বছর বয়সে ছেলেদের হৃদযন্ত্র দ্রুতহারে বাড়তে থাকে আর মেয়েদের হৃদযন্ত্রের বিকাশের হার খুব কম থাকে। রক্তবাহী নালিগুলিও (veins and arteries) ১১-১২ বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুতহারে বাড়তে থাকে এবং তারপর এই হার কমে যায়। মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে রক্তচাপের পরিমাণের তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। ফুসফুসের আয়তন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক রূপ নেয়। পাচননালীর প্রক্রিয়াও কার্যকরী ভূমিকা নিতে সময় নেয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থির ক্রিয়া বাড়তে থাকে এবং দেহযন্ত্র বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। শুধুমাত্র যৌন গ্রন্থির বিকাশ একটু দেরিতে হয়। কৈশোরের প্রারম্ভে এই গ্রন্থির বিকাশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয়।

এক, একটা বিশেষ ছন্দ বজায় রেখে ব্যক্তিজীবনে বিকাশের আবির্ভাব ঘটে। তবে তার হার সব সময় সমান নয়। কোন সময়ে এই বিকাশের হার বেশি আবার কম, আবার বেশি এই ভাবেই এগিয়ে চলে।

দুই, নিজস্ব নিয়ম মেনেই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী শরীরের উপরের অংশের অঙ্গ -প্রত্যঙ্গগুলির বিকাশ আগে ঘটে, পরে নিম্ন অংশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এই নিয়মই বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

তিন, বয়সের তারতম্যে বিকাশের হারের তফাৎ দেখা যায়। জন্ম থেকে দু-বছর আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত দৈহিক বিকাশের হার খুব দ্রুতগতিতে হয়। পরে সেই হার কমে যায় আবার কৈশোরে এই হারের বৃদ্ধি ঘটে।

চার, জলবায়ুর উপর দৈহিক বিকাশ নির্ভর করে। তাই বিদেশের ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের থেকে ভিন্নতর।

এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানুষের দৈহিক বিকাশের একটি সামগ্রিক ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দৈহিক বিকাশের ধারা নিয়ে সেইরকম তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণার ফল আজও পাওয়া দুষ্কর। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু নজির পাওয়া যায়। তারই ওপর ভিত্তি করে দৈহিক বিকাশের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে।

২.৭.১ উচ্চতার বিকাশ (Development of Height)

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার গড় দৈর্ঘ্য ৫০ থেকে ৫২ সে. মিটারের মধ্যে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তার কারণ বংশগতি বা জাতিগত—একথা অনেকেই বলে থাকেন। প্রথম দু-বছর বয়স পর্যন্ত এই উচ্চতা বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত থাকে। তারপর দু-বছর বয়স থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত এই বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হারে ঘটে। আবার ৭ বছর বয়স থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত এই হার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই বয়সকালে ছেলে ও মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় সমানই থাকে। ১০ বছর বয়সের পর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত ছেলেদের উচ্চতার হারের বৃদ্ধি একটু কম থাকে। কিন্তু তারপরে অর্থাৎ ১২ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত এই হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতার হার বেশি মাত্রায় বাড়তে থাকে। এই সময়ে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের উচ্চতা ছেলেদের চেয়েও বেশি হয়। কিন্তু ১৫ বছর বয়সের পর ছেলেদের ও মেয়েদের উচ্চতার পার্থক্য দেখা যায় এবং পরিপূর্ণ বয়সে ছেলেদের উচ্চতার গড় মেয়েদের থেকে একটু বেশি হয়। সাধারণত ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই উচ্চতার পূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

২.৭.২ ওজনের বিকাশ (Development of Weight)

জন্মাবস্থায় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ওজনের গড় সাধারণত ২.৫ কে.জি. থেকে ৩ কে.জি-র মধ্যে থাকে। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। ছেলেদের ওজন সাধারণত মেয়েদের চেয়ে বেশি হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার ওজন কমে যায়। কিছুদিন পর থেকেই আবার ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। চার-পাঁচ মাস বয়সে ছেলেমেয়েদের ওজন দ্বিগুণ হয়ে যায়। তিন বছর বয়স পর্যন্ত বছরে গড়ে দুই থেকে আড়াই কে.জি. করে ওজন বাড়ে। তারপর ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ওজনের গড় বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। ১২ বছর বয়সে এই বৃদ্ধির হার আবার বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র কৈশোরকালে মেয়েদের ওজন ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি হয় তাছাড়া সব সময়েই ছেলেদের ওজন মেয়েদের চেয়ে বেশি হয়।

পরিবেশই এককভাবে দায়ী। পরিবেশবাগীগণ তাদের সপক্ষে তথ্য, প্রমাণ ইত্যাদিও পরিবেশন করেছেন। এই পরস্পরবিরোধী মতবাদের বেড়াজাল থেকে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ জীবন বিকাশের সত্যকে ও রহস্যকে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা কোনো এক পক্ষকে মেনে নেন নি। তাঁদের মতে বংশগতি ও রহস্যকে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা কোনো এক পক্ষকে মেনে নেন নি। তাঁদের মতে বংশগতি ও পরিবেশ এই উভয়ের জীবন বিকাশের মূলে বর্তমান।

শিশুর মধ্যে জন্ম মুহূর্তে যেসব সম্ভাবনা আছে, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরিবেশের প্রয়োজন আছে। তেমনি, অন্যদিকে পরিবেশ যতই ভালো হোক না কেন, শিশুর মধ্যে যদি বিকাশধর্মী উপাদান না থাকে, তার জীবন বিকাশ কোনো রকমেই সম্ভভ হয় না। ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, বংশগতি ও পরিবেশ এই উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

ব্যক্তি বংশগতিরূপে যে সম্ভাবনাগুলি নিয়ে জন্মায়, তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে কি না তা নির্ধারণ করে দেবে তার পরিবেশ। পরিবেশ সম্ভাবনাগুলি বিকাশের যত অনুকূল হবে, তাদের বিকাশও তত সুষ্ঠুভাবে হবে। আবার অন্যদিকে ব্যক্তির জীবনে পরিবেশ তার বিকাশে কতটা সহায়তা করতে পারবে, তা নির্ধারণ করে দেবে তার বংশগতি। বংশগতি নিম্নমানের হলে পরিবেশ যতই উন্নতমানের হোক না কেন ব্যক্তি জীবনের বিকাশ উন্নতমানের হবে না। যা বাস্তব সত্য তা হল; ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, বংশগতি ও পরিবেশ এর দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি বংশগতির জন্য যে সম্ভাবনাগুলো নিয়ে জন্মেছে, তার পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করবে কিনা, তা নির্ধারণ করে দেবে তার পরিবেশ। আবার অন্যদিকে ব্যক্তির জীবনে পরিবেশ তার বিকাশে কতটা সহায়তা করবে, তার নির্ধারণ করে দেবে তার বংশগতি। সুতরাং বংশগতি ও পরিবেশ ব্যক্তিজীবনের উপর কীভাবে কাজ করছে তার দ্বারা নির্ধারিত হবে তার বিকাশের ধারা। মনোবিদ্ রাচ (F.L. Ruch) মানুষের জীবন বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গো উপরিউক্ত আলোচনা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন। তবে ব্যক্তিজীবনে বিকাশ যেহেতু সময়সাপেক্ষ, সেহেতু তিনি সময়কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই রাচ-এর মতে জীবনের যে কোনো মুহূর্তে শিশুর বিকাশের স্তর নির্ধারিত হয়, তার বংশগতি, পরিবেশ এবং জীবনকালের (time) পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাস্তর = বংশগতি × পরিবেশ × সময়।

২.৭ দৈহিক বা শারীরিক বিকাশ (Physical Development)

শিশু পৃথিবীতে আসে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হয়ে। সব কিছুতেই তার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো সে মোটামুটিভাবে নিজেই খেতে পারে। নিজে নিজেই খেলাধূলা করতে পারে। সে প্রয়োগ করতে পারে হাত-পা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গা প্রত্যঙ্গা প্রয়োজনের তাগিদে। ঐ সমস্ত করা সম্ভভ হয় তার দৈহিক বিকাশের ফলে। এই বিকাশ দু-ধরনের হয়—একটি অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর বিকাশ আর অপরটি এই অঙ্গা প্রত্যঙ্গোর ক্রিয়ার বিকাশ। এই দুটি বিকাশ ধারাই ব্যক্তিজীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এই দৈহিক বিকাশের গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এবার আলোচনা করা যাক।

পিকুলাস, হারলক্ প্রভৃতি মনোবিদগণ বয়স অনুযায়ী স্তর বিন্যাস করেছেন। পিকুলাসের স্তর বিন্যাসকে নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) প্রাক্‌ভূমিষ্ঠ অবস্থা বা স্তর (Prenatal stage)—গর্ভধারণের প্রথম অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের বিকাশধারা এই স্তরে যুক্ত হয়েছে।

(২) সদ্যোজাত অবস্থা বা স্তর (Neonatal stage) জন্মের পর থেকে চার সপ্তাহকে এই স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) প্রথম শৈশব স্তর (Early infancy) এক মাস বয়স থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত।

(৪) শৈশবের শেষ স্তর (Late infancy) দেড় বছর বয়স থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) প্রাথমিক বাল্য স্তর (Early childhood) আড়াই বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত।

(৬) মাধ্যমিক বাল্য স্তর (Middle childhood) পাঁচ বছর বয়স থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত।

(৭) প্রান্তীয় বাল্য স্তর (Late childhood) নয় বছর বয়স থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত।

(৮) যৌবনাগমের স্তর—বারো বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত।

(৯) প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর—একুশ বছর বয়স থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত।

(১০) বার্ধক্য (senescence) সত্তর বছরের পরের জীবন কাল।

পিকুলাস যেমন দশটি স্তরে জীবনকালকে ভাগ করেছেন আবার আর্নেস্ট জোনস্ শুধু চারটি ভাগে জীবনের স্তরকে উপস্থাপন করেছেন। আর শিক্ষার স্তর অনুযায়ী জীবন বিকাশের স্তরকেও ভাগ করেছেন অনেক মনোবিদ্ প্রাক্‌বিদ্যালয়ের স্তর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এই রকম ইত্যাদি ভাগে। কিন্তু এটা হোল বাস্তব সত্য যে, যে কোন স্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় জীবন বিকাশের অবিচ্ছিন্নতা। তারই উপর ভিত্তি করে নিম্নে বিকাশের বিভিন্ন রূপরেখা তুলে ধরা হল।

২.৬ বিকাশধারার নির্ধারক ঃ বংশগতি ও পরিবেশ (Determinants of Development : Heredity and Environment)

মানুষের জীবনের বিকাশ কেন হয় ও কীভাবে হয়? এইসব প্রশ্ন নিয়ে বহুদিন থেকে মনোবিদ্‌গণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। মনোবিদ্‌গণের নিকট প্রাথমিক প্রশ্ন হল মানুষের জীবনের এই বিকাশের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় কিসের দ্বারা। জন্মাবস্থায় শিশুর মধ্যে এমন কী সম্ভাবনা ও প্রবণতা থাকে যা তার বিকাশ-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে অথবা সে যে পরিবেশে লালিত পালিত হয় নাকি সেই পরিবেশই তার জীবন-বিকাশ ধারার নিয়ন্ত্রক? এই প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং চিকিৎসক প্রত্যেকেই অনেক গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাকে কেন্দ্র করে দুটি দলের উদ্ভব হয়েছে। এক দল বলেন মানুষের বিকাশধারায় বংশগতির আধিপত্যই লক্ষ্য করা যায় আবার কেউ কেউ বলেন এই বিকাশ-ধারায় পরিবেশের প্রাধান্য বর্তমান। এই প্রথম দলকে বলা হয় বংশগতিবাদী ও দ্বিতীয় দলকে বলা হয় পরিবেশবাদী।

বংশগতিবাদীগণ সমস্ত তথ্যকে তাদের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ কেবলমাত্র-বংশগতি ধারাতেই নির্ধারিত হয়। অপরদিকে, পরিবেশবাদীগণের বক্তব্য ব্যক্তিজীবনের বিকাশে

(৩) বিকাশধারা একটা নিয়ম মেনেই হয়। মানুষের জীবনে এই আচরণের পর এই আচরণ আসবে তা একরকম ঠিক আছে। যেমন কোনো শিশু না চিত হয়ে, না বসে, দাঁড়াতে না লিখে হঠাৎ করে হাঁটতে পারে না। একটা নিয়ম রেখা অনুসরণের মাধ্যমেই তা সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই সামঞ্জস্য বজায় রাখা বিকাশ ধারার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৪) স্থূল পরিবর্তন থেকে সূক্ষ্ম পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বিকাশ প্রক্রিয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যেমন শিশুরা প্রথমে কোনো কিছু নাগালের মধ্যে আনার জন্য সমস্ত দেহ, হাত-পা সবকিছু কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক এই সামগ্রিক আচরণগুলো পৃথকীকরণ হয় বিকাশের ফলে। যত বড়ো হয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের পৃথকীকরণ হয়। অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বিশেষায়িত হয়। তাই শিশু বড়ো হলে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য শুধু হাতই ব্যবহার করে।

(৫) মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গতিশীল সত্তার এক জটিল সমন্বয়। কিন্তু এই গতিশীল সত্তাগুলো সব সময় সমহারে বিকশিত হয় না। যেমন কোনো সময়ে দৈহিক বিকাশের তুলনায় মানসিক বিকাশ বেশি হয় আবার কখনো বা মানসিক বিকাশের তুলনায় দৈহিক বিকাশ বেশি হয়। তাই বলা চলে জীবন-বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া।

(৬) জীবন-বিকাশের ধারা ঐক্যের অনুকূল। যেমন দৈহিক বিকাশ মানসিক বিকাশকে সহায়তা করে আবার মানসিক বিকাশ সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের বিকাশই ব্যক্তিজীবনে ঐক্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

(৭) সাধারণত বিকাশের ধারা বিশেষ বয়সে কতকগুলো নিয়ম মেনে চললেও ব্যক্তিজীবনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। একই বয়সের সব শিশুর ওজন, উচ্চতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ সবই এক রকম হয় না, অমিল থাকে। এটাই হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিকাশের ধারা এই ব্যক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করেই বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।

(৮) ব্যক্তিজীবনের বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই উপর নির্ভরশীল। মনোবিদ্‌দের ধারণা জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা যেমন বিকাশের সম্ভাবনার কারণ তেমনি পরিবেশের ভূমিকারও অবদান যথেষ্ট। তাই বলা যায় ব্যক্তিজীবনে বিকাশের ধারা বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ। ব্যক্তিজীবনে এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই যে কোনো শিক্ষা প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সার্থকরূপে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন বিকাশধারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এই দায়িত্ব বহন করে থাকেন শিক্ষকেরা। তাই তাঁদের এই বিকাশধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। অনেকেরই মনে করে থাকেন—শিক্ষার জন্য তো মানসিক বিকাশই যথেষ্ট। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ শুধু মানসিক বিকাশকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলা যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। আর ব্যক্তিজীবনের বিকাশ তার সামগ্রিক ঐক্যবন্ধ বিকাশেরই উপর নির্ভর করে। তাই বিকাশ ধারা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক, সঞ্চালকমূলক ও জ্ঞানমূলক ইত্যাদি বিকাশধারার কোনোটিকেই বাদ দিলে চলবে না।

২.৫ বিকাশের স্তর (Stages of Development)

বিভিন্ন মনোবিদ্ জীবন-বিকাশের স্তরকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই স্তর বিন্যাসের কারণ তাঁরা আরোপ করেছেন ব্যক্তিজীবনের বিকাশের ধারাকে বিশেষভাবে জানার এবং বোঝার সুবিধের জন্য। কেউ কেউ এই বিকাশ ধারাকে বয়স অনুযায়ী স্তর বিন্যাস করেছেন। আবার কেউ কেউ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী জীবনকে ভাগ করেছেন।

size and volume)। আর বিকাশ (development) বলতে বুঝে থাকি বিশেষ করে আকৃতির পরিবর্তন (change in shape) এবং সেই সঙ্গে কার্যক্ষমতার উৎকর্ষ (functional improvement)। যেমন, যখন আমরা বলি শিশুটির দৈহিক বৃদ্ধি হয়েছে তখন আমরা শিশুটির হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতটা বেড়েছে শুধু তাই বোঝাতে চাই বা বুঝে থাকি। কিন্তু যদি বলি শিশুটির দৈহিক বিকাশ হয়েছে তখন কিন্তু আমরা বুঝব শিশুটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বৃদ্ধিও সেই সঙ্গে তার কর্মক্ষমতার কীরকম উন্নতি হয়েছে। আর তা ছাড়া, বৃদ্ধি হল নেহাতই একটি সাময়িক প্রক্রিয়া যার পরিসমাপ্তি পরিণমনে (maturation)। কিন্তু বিকাশ হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, বৃদ্ধির পরিসমাপ্তিতে এর সমাপ্তি ঘটে না। আরেকটি কথা, বৃদ্ধিকে বলা হয়, পরিমাণগত পরিমাপযোগ্য পরিবর্তন, কিন্তু বিকাশ হল গুণগত পরিবর্তন যার সর্বাদিক পরিমাপ করা খুবই কঠিন ব্যাপার যদিও এই পরিবর্তন সর্বক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পরিশেষে বৃদ্ধি শব্দটিকে শুধুমাত্র দৈহিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে কিন্তু বিকাশ শব্দটি জীবনের সবরকম বিকাশের (যেমন দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, বিদ্ধিক ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বিকাশের এই রকম একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ঃ বিকাশ হল জীবনব্যাপী ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তার ক্রমোন্নতিশীল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যদিও আলোচনার সুবিধার্থে বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে বৃদ্ধি ও বিকাশ সতত পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কেননা পরিমাণগত পরিবর্তন (growth) ছাড়া গুণগত পরিবর্তনকে (maturation) যেমনি উপলব্ধি করা যায় না তেমনি গুণগত পরিবর্তন ছাড়া পরিমাণগত পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না।

২.৪ বিকাশ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developmental Process)

মানুষের বিকাশ ধারাকে জানতে গেলে বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা দরকার। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে এই বিকাশ প্রক্রিয়ার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারলে বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। তাই সংক্ষেপে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল।

(১) মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে—সে ভালো বা খারাপ যে দিকেই হোক। এই পরিবর্তনগুলো কখনও কখনও লক্ষ্য করা যায় আবার কোনো কোনো সময় নজরে আসে না। এমনকি মানুষের নিজের কাছেও এই পরিবর্তন অনেক সময় ধরা পড়ে না। ধরা পড়ুক বা না পড়ুক এই পরিবর্তন কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। যদিও আলোচনার সুবিধার জন্য মনোবিদ্‌গণ এই বিকাশ ধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন যেমন প্রাক্‌ভূমিষ্ঠ অবস্থা (Prenatal period), সদ্যোজাত অবস্থা (Neo-natal period), প্রাক্ শৈশব (Early infancy) ইত্যাদি এ কথা বাস্তব সত্য যে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উপনীত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রম পরিবর্তন। তাই এক কথায় বলা যায়, বিকাশ হল এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Development is a continuous process)।

(২) বিকাশের যে কোনো অবস্থা তার পূর্ববর্তী স্তর থেকে আসে। কাজেই বিকাশের যে কোনো স্তরে উন্নীত হওয়ার অর্থ হল তার পূরবর্তী স্তরসমূহের সমষ্টিগত ফল। যেমন শৈশবের শেষ স্তরে উপনীত হতে গেলে শিশুকে প্রাক্‌ভূমিষ্ঠ অবস্থা,সদ্যোজাত অবস্থা ও প্রথম শৈশবের স্তর অতিক্রম করে আসতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় বিকাশ প্রক্রিয়ার ক্রমসংযোজনশীলতা।

২.১ সূচনা (Introduction)

ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠা এক ধারাবাহিক জটিল প্রক্রিয়া। জটিল হলেও তা সুশৃঙ্খল এবং পর্যবেক্ষণ যোগ্য। শিক্ষার গতিপ্রকৃতি ও পদ্ধতিও বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি শিক্ষাবিদ্ দার্শনিকরা ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে মানুষের বিকাশ ও বৃদ্ধির সমার্থক বলে মনে করেন। পাঠক্রম, শিখন ও শিক্ষণপদ্ধতি, মূল্যায়ন, ইত্যাদি জীবনের এক এক স্তরে ভিন্নরকম। মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বোঝার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা করে আসছেন। এই বিষয়ে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার বিপুল এবং ক্রমবর্ধমান।

শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি, বিকাশের নিয়মাবলী ও কারণ, বিকাশের সমস্যা ও ফলাফল না বুঝলে প্রকৃত শিক্ষাবিজ্ঞানী হওয়া যায় না। শিক্ষকদেরও বিষয়টি জানা প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য এককটিতে এই কারণেই শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ভালোভাবে জানার জন্য মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—
- বিকাশ ও বৃদ্ধির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- বিকাশের বিভিন্ন নির্ধারকগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিকাশের স্তরগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শারীরিক বিকাশের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সঞ্চালনমূলক বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- জ্ঞানমূলক বিকাশের স্তরগুলি সম্বন্ধে লিখতে পারবেন।
- নৈতিক বিকাশের স্তরগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

২.৩ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা (Concepts of Growth and Development)

জীবনের প্রতিমুহূর্তেই আমরা বদলে যাচ্ছি অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাদেরকে জীবনকে পরিবর্তিত করে চলেছে। ওই পরিবর্তন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ যাই-ই হোক না কেন এই পরিবর্তনের সাথে তিনটি ধারণা (concept) ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এগুলো হল—বৃদ্ধি (growth), বিকাশ (development) ও পরিণমন (maturation)। বৃদ্ধি বলতে আমরা বুঝে থাকি শুধুমাত্র আকার বা আয়তনের পরিবর্তনকে (change in

একক ২ ❑ শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of Learners)

গঠন

২.১ সূচনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা

২.৪ বিকাশ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

২.৫ বিকাশের স্তর

২.৬ বিকাশধারার নির্ধারক ঃ বংশগতি ও পরিবেশ

২.৭ শারীরিক বিকাশ

- ২.৭.১ উচ্চতার বিকাশ
- ২.৭.২ ওজনের বিকাশ
- ২.৭.৩ কাঠামোর বিকাশ
- ২.৭.৪ স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ
- ২.৭.৫ প্রত্যঙ্গের বিকাশ

২.৮ সঞ্চালনমূলক বিকাশ

- ২.৮.১ শিক্ষায় সঞ্চালনমূলক বিকাশের গুরুত্ব

২.৯ প্রাক্ষোভিক বিকাশ

- ২.৯.১ প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার বিকাশ
- ২.৯.২ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ

২.১০ সামাজিক বিকাশ

- ২.১০.১ সামাজিকী করণ
- ২.১০.২ সামাজিক পরিনমন
- ২.১০.৩ সামাজিক বিকাশের সহায়ক শর্ত

২.১১ জ্ঞানমূলক বিকাশ

- ২.১১.১ সংবেদন সঞ্চালন স্তর
- ২.১১.২ প্রাক্ সক্রিয়তার স্তর
- ২.১১.৩ মূর্ত সক্রিয়তার স্তর
- ২.১১.৪ যুক্তি সক্রিয়তার স্তর

২.১২ নৈতিক বিকাশ

৯। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ

(ক) পরিমাপ ও মূল্যায়ন (Measurement and evaluation)

(খ) সুপরিচালনা (Quidance)

(গ) প্রেষণা (Motivation)

(ঘ) শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা (Educational technology)

১.৬.৭ তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

মানুষের আচরণকে পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ সব সময় সম্ভব হয় না বলে বা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য বলে শিক্ষা-মনোবিদগণ তাঁদের অধিকাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভিন্ন পশু-পাখির উপর করে থাকেন এবং সেইসব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে মানুষের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এই তুলনামূলক পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিখন তত্ত্ব ও সূত্র নির্ধারণে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই দেখতে হবে পরিস্থিতি, পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কোন বিশেষ পদ্ধতি বা পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করলে সমস্যার সমাধান সহজতর হবে। সমস্যাভেদে এবং আচরণের প্রকৃতিভেদে শিক্ষমনোবিদ্ এক বা একাধিক পদ্ধতি নির্বাচন করেন।

প্রশ্নাবলী

১। মনোবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? শিক্ষার সংজ্ঞা দাও এবং শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধটি আলোচনা করো। (What do you mean by Psychology? Define education and discuss the relationship between education and psychology.)

২। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করো। (What is meant by Educational Psychology? Discuss the scope of Educational Psychology with suitable examples.)

৩। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রবণতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করো। (Discuss in detail about various aspects of modern trends of Educational Psychology.)

৪। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। অন্তর্দর্শনকে কি একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলা যায়? (Discuss in brief the methods of Educational Psychology. Can intropection be considered as a dependable method?)

(৫) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগের উদাহরণ সহ বর্ণনা করো। (Describe with examples the application of Experimental Method in Educational Psychology.)

(৬) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বিচার করো। (Justify the importance of Educational Psychology.)

(৭) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে পরিসরের অন্তর্গত তিনটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করো। (Discuss three important aspects of the scope of Educational Psychology.)

(৮) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত করা হয় কেন? (Why Educational Psychology is now considered as a fullfledged independent science?)

১.৬.৫ ঘটনার-বিবরণ-পদ্ধতি (Case Study Method)

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে case study পদ্ধতিরও ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিবেশ অনুশীলন করে তার সমস্যার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। এই কারণ খুঁজে বের করার জন্য তার জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই খোঁজ-খবর তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিভিন্ন শিক্ষক ও আরও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে তার সমস্যামূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১.৬.৬ মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতি (Clinical Method)

মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় সে পদ্ধতিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণমূলক অপসঙ্গতি বিশ্লেষণ ও দূরীকরণের জন্য ফ্রয়েড, অ্যাডলার, ইয়ুং প্রভৃতির মনোচিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের অবধি অনুষঙ্গ (free association) পদ্ধতির আলোচনা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে কোনোরূপ ভয়, সংকোচ বা দ্বিধা না করে তার মনে যে সব চিন্তা বা কথার উদ্ভব হচ্ছে সেগুলিকে মনোসমীক্ষকের অর্থাৎ চিকিৎসকদের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা নির্দেশ দেওয়া হয়। মনের কথা অবাধে এইভাবে ব্যক্ত করার ফলে দেখা যাবে এমন একটা দিন বা সময় আসে যখন মনের সচেতন স্তরের সমস্যা সৃষ্টিকারী অনেক কথা রোগগ্রস্থ ছাত্র বা ছাত্রীর চেতন স্তরে চলে আসে। তখন চিকিৎসকের নিকট ধরা পড়ে সমস্যার আসল স্বরূপ এবং ছাত্র বা ছাত্রীটিও তার মানসিক বিকারের কারণ জেনে রোগমুক্ত হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে প্রতিফলন অভীক্ষার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির মাধ্যমেও ব্যক্তির অচেতন স্তরের অনেক মাল-মশলা যা ব্যক্তির সমস্যামূলক আচরণের জন্য দায়ী তা প্রতিফলিত হয়। উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির এই প্রতিফলিত সত্তাটি রোগের কারণ নির্দেশ করে রোগ উপশমের পথ বাতলে দেয়। এই প্রতিফলন অভীক্ষার মধ্যে রর্সা ইঙ্কব্লট্ অভীক্ষা (Rorschach Ink Blot Test), কাহিনি সংবোদন অভীক্ষা (Jhematic apperception test), শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word association test) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া রয়েছে ব্যক্তিসত্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (questionnaire) যা বিশেষভাবে তৈরি করা হয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশ্নসমূহের উত্তর জানার জন্য। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষক ব্যক্তির মানসিক সংগঠন ব্যক্তির প্রক্ষোভ জীবন (ernotional life) ব্যক্তির অন্তর্মুখীতা (introversion), বহির্মুখীতা (extroversion), প্রতিন্যাস (attitude) প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণার মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে সক্ষম হন।

এ ছাড়াও রয়েছে আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতি বর্তমান কালে সবচেয়ে বহুল প্রযুক্ত চিকিৎসামূলক পদ্ধতি।

দলটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ শুধু ভুলটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে) সংশোধনের পরিমাণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। যে দলের উপর কোন বিশেষ অবস্থার (এখানে তিরস্কার) প্রভাব দেখতে চাওয়া হচ্ছে তাকে বলা হয় experimental বা পরীক্ষণমূলক দল। আর অন্য দলটিকে বলা হয় control group বা নিয়ন্ত্রিত দল। যদি এই দুটি দলের ভুল সংশোধনের পরিমাণে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হলে আমরা বলবো ভুল সংশোধনের উপর তিরস্কারের প্রভাব বর্তমান। যদি দেখা যায় তিরস্কৃত দলের ভুলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম তা হলে আমরা বলবো ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে তিরস্কারের ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান।

এইভাবে দুটি দল নিয়ে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে বলা হয় parallel group technique বা তুল্য দল পরীক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির আরও একটু উন্নত সংস্করণ হল rotational group technique বা আবর্তিত দলের পদ্ধতি এখানেও দুটো দলই থাকে। তবে পর্যায়ক্রমে দুটো দলকেই একবার পরীক্ষণমূলক দল ও আরেকবার নিয়ন্ত্রিত দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এর ফলে দুটো দলেরই পরীক্ষণমূলক পক্ষপাতিত্বের (experimental bias) সম্ভাবনা দূর হয়। এজন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সমস্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

১.৬.৪ বিকাশমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Genetic Method)

অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো মানুষও ক্রমবিকাশশীল। তার দেহ ও মন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিপক্কতার পক্ষে এগিয়ে যায়। এক একটি বিশেষ বিশেষ স্তর বা পর্যায়ে তার মানসিক বৈশিষ্ট্য এক এক প্রকার থাকে। সুতরাং মানুষকে জানতে হলে তার ক্রম বিবর্তনের ধারা জানা প্রয়োজন।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি এই পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ করতে হয়, তা হলে ব্যক্তি-বিশেষকে আশৈশব পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

এই পদ্ধতির সাহায্যে যে সব উপাত্ত (data) সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, তাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) ব্যক্তি-বিশেষের দেহ-মনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শৈশব থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে পূর্ণবয়স্ক (adult) পর্যন্ত কীভাবে ঘটে;

(২) কোনো শিশুর মনে বিভিন্ন প্রত্যয় (general concepts) কীভাবে জন্মে; (যেমন স্থান ও কাল সম্পর্কে শিশুর ধারণা কীভাবে ধীরে ধীরে সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে সে সম্পর্কে পরীক্ষণ মূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।)

(৩) শিশু-মনে আবেগ, অনুভূতি কীভাবে ধীরে ধীরে প্রকাশলাভ করে এবং কীভাবে শিশু সেগুলো সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে সুনিয়ন্ত্রিত করতে শেখে;

(৪) শিশু-জীবনকে সহজাত প্রবৃত্তি (instincts) কীভাবে প্রভাবিত করে;

(৫) সাধারণভাবে বুদ্ধির প্রকাশ, শিখনশক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি কীভাবে ঘটে।

অন্তর্দর্শন বলে না; কিন্তু ওই অবস্থা কী করে আসল বা এর বৈশিষ্ট্য কী, অথবা এটি মনের মধ্যে কোনো কোনো পরিবর্তন সূচনা করল ইত্যাদি বিষয় যখন সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা যায়, তখন তাকে অন্তর্দর্শন বলে। পদ্ধতিতে যে সত্যের ঈঙ্গিত পাওয়া যায় তাতে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত উপাদান মিশে থাকে। একে যাচাই করাও খুব শক্ত। সুতরাং এই পদ্ধতিতে যে জ্ঞান সংগ্রহ হয় তা সব সময় না হলেও প্রায়শই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট (biased and subjective) এবং তাই সবসময় নির্ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই অন্তর্দর্শনকে স্বতন্ত্র মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এখন আর বিবেচনা করা হয় না। তবে অন্যান্য পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে একে গ্রহণ করা চলে।

১.৬.২.২ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ (objective observation)

এ হল অন্যের আচার আচরণ বাইরে থেকে লক্ষ্য করা। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণের অনুশীলন করা যায়। সাধারণভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতেতে অন্য অনেকের আচরণ লক্ষ্য করেন অপর একজন ব্যক্তি। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যকেও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। কারণ, যিনি পর্যবেক্ষণ, করছেন তার ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ মুক্ত নয়। তবে এই পদ্ধতির দোষত্রুটি যথাসম্ভব কমানোর জন্য বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করা হয়।

১.৬.৩ পরীক্ষণ পদ্ধতি (Expermental Method)

রসায়ণ, পদার্থবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতির মতো আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষণ বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (observation under controlled condition)। কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে অন্য ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিই হল উৎকৃষ্ট। পরীক্ষণের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তত দুই জন ব্যক্তির প্রয়োজন। একজন পরীক্ষক (experimenter) ও অন্যজন পরীক্ষার্থী (subject)। পরীক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বা আচরণ নিয়েই পরীক্ষা চালাবেন পরীক্ষক। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে কোনো সময় মাত্র একজন পরীক্ষার্থী (subject)-এর উপর পরীক্ষণ কার্য চালানো হয় আবার কোনো সময় বা একদল পরীক্ষার্থীর উপর। ধরা যাক, পরীক্ষক দেখতে চান পরীক্ষার্থীর ভুল সংশোধনের উপর তিরস্কারের কোনো প্রভাব আছে কিনা। এক্ষেত্রে পরীক্ষক একজন পরীক্ষার্থীর উপর একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে পরীক্ষণ কার্য চালাতে পারেন বা সম্পূর্ণ শ্রেণির উপর একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে পরীক্ষণ কার্যটি চালাতে পারেন। অর্থাৎ কিছুদিন ধরে তাদের প্রতিটি ভুলের জন্য তিরস্কার করে কতটা ভুল কমল তা দেখতে পারেন; আবার কিছুদিন ধরে তাদের তিরস্কার না করে দেখতে পারেন। যদি তুলনা করে দেখা যায় যে তিরস্কার করলে ভুলের মাত্রা কমে যায় তা হলে পরীক্ষক এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে ভুল সংশোধনের উপর তিরস্কারের প্রভাব ইতিবাচক (positive)। এই ধরনের পরী(ণ পদ্ধতিকে বলা হয় একই দলের উপর পরী(ণ (single group technique of experimentation)।

আবার একই পরীক্ষার জন্য দুটো সমতুল্য (identical) অর্থাৎ সমক্ষমতা সম্পন্ন দলকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। তাদের একটি দলের ক্ষেত্রে ভুলের জন্য ক্রমাগত তিরস্কার করে সংশোধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্য

সক্ষমতার পার্থক্য (যেমন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল সক্ষমতার ছাত্রছাত্রী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি) এবং শিখন অক্ষমতা যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা (learning disabled) শ্রেণিকক্ষে ছাত্রবৈচিত্র্যের অন্যতম উৎস।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের পরিচালনা ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আবশ্যিক অংশ হিসাবে গণ্য হওয়ার কারণ দেখা গেছে; শুধুমাত্র অনুপযুক্ত পরিচালনার জন্যই শিক্ষার সমস্ত মনোবিজ্ঞান সম্মত আয়োজন, পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য শিক্ষকদের শ্রেণিপরিচালনার সঙ্গে তাদের পঠন-পাঠন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানোর প্রসঙ্গটি জানা অবশ্য প্রয়োজন।

১.৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods of Educational Psychology)

১.৬.১ সূচনা (Introduction)

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্যের উদ্ঘাটন। বিভিন্ন অবস্থা কিংবা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এদের সম্পর্কে সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার করে বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তাই। প্রাণীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও তার বিভিন্ন আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করাই হল মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য প্রাণীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও তার বিভিন্ন আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করাই হল মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে মনোবিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতিগুলিই প্রয়োগ করা হয়। নীচে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতির আলোচনা করা হল।

১.৬.২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (observation method) বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ (methodical)

নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো বিজ্ঞানই অগ্রসর হতে পারে না। তাই বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত হতে গেলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেরও বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। আর এরই জন্য সমস্ত বিজ্ঞানের মতোই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ।

আমরা জানি মানসবৃত্তির দুটি দিক। প্রথমটি এর **অন্তর্মুখী** বা অনুভবগম্য দিক্। যিনি মানসবৃত্তি অনুসন্ধানে রত কেবলমাত্র তিনিই মানসবৃত্তির এই অনুভবগম্য অন্তর্মুখী দিকটি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারেন। অর্থাৎ জ্ঞাতা বা পাত্রই (subject) এটি সাক্ষাৎভাবে জানতে পারেন। দ্বিতীয়টি মানসবৃত্তির **বহিঃপ্রকাশিত** দিক। পাত্র বা জ্ঞাতা মানসবৃত্তির এই দিকটি সম্যকভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন না। এটি সম্যকভাবে জানতে পারেন অপর কোনো **পর্যবেক্ষণ ব্যক্তি** (observer) যাঁর পক্ষে অন্তর্মুখী বা অনুভবগম্য রূপটি প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব নয়।

মানসবত্তির এই অন্তর্মুখী ও বহিঃপ্রকাশিত দিকের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে দু-রকম পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান তথা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এই দুটি হল যথাক্রমে (ক) ব্যক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা **অন্তর্দর্শন** (introspection) এবং (খ) নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা বহির্দর্শন (objective method of observation)।

১.৬.২.১ অন্তর্দর্শন (Introspection)

ব্যক্তি-বিশেষ যখন নিজের মনকে নিজে জানে, তখন তাকে **অন্তর্দর্শন** বলে। মনে কোন অবস্থার উদ্ভব হলেই তাকে

(১) আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ প্রেষণার (motivation) উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা প্রেষণাই আমাদের কর্মপ্রেরণা প্রদান করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীর প্রেষণাকে কীভাবে বাড়ানো যায় কোন বিষয় শিখনের জন্য এটা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের এখন ধ্যায় বিষয় হল শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোনো সমস্যাকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের প্রেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়।

(২) আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণের মডেল (behaviour model) স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী। বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে খুব জটিল অথচ গাণিতিক যুক্তিনির্ভর একটি তাত্ত্বিক শাখার বিকাশ ঘটেছে। মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যের গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে।

(৩) আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতাকে কীভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় তার জন্য নানাবিধ গবেষণায় রত। এই গবেষণা থেকেই নানা ধরনের পাঠদান পদ্ধতি (teaching method) আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষকের সহজাত ক্ষমতাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথ বিকশিত করে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাহিদার সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৪) শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করার জন্য ও বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক কৌশল (mechanical device) আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে আধুনিক-শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলস্বরূপ আমার পেয়েছি শিখনের সহায়ক যন্ত্র (teaching sids), ভাষা আয়ত্ত করার জন্য পরীক্ষাগার (language laboratory) এবং এই রকম আরো অনেক যান্ত্রিক অবলম্বন। এই যান্ত্রিক কলা-কৌশল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সীমিত ক্ষমতাকে দূর করার এক বলিষ্ঠ বিকল্প। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যার (educations technology) আলোচ্য বিষয়। প্রয়োগ ও ব্যাপক প্রসারের পিছনে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমান শিক্ষামনোবিজ্ঞানে এবং প্রসঙ্গটিও অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

(৫) শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগে দীর্ঘকাল যাবৎ আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের প্রভাবই প্রধান ছিল। বর্তমানে প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞান (cognitive psychology) শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ (cognitive constructivism) এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৬) আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরীক্ষালব্ধজ্ঞানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ। কোন সিদ্ধান্ত সূচারুরূপে পরীক্ষিত না হলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার আর বিশেষ সুযোগ নেই।

(৭) শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ ও তা কীভাবে দূর করা যায় তা নিয়েও আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ গবেষণা করছেন। তবে এইক্ষেত্রে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার উপর তাঁদেরকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে।

অন্যান্য আধুনিক প্রবণতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রেণিকক্ষে ছাত্র বৈচিত্র্য (student diversity) ও পরিচালনা ব্যবস্থা (class-room management) নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা। প্রথমটির সামাজিক ভিত্তি হল এই যে শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের যে সমাহার তার মধ্যে কৃষ্টিগত বৈচিত্র্য (cultural diversity) অনেক বেশি কারণ মানুষের স্থানান্তর প্রবণতা (mobility) খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, পঠন পাঠন প্রক্রিয়ায় নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়াও

নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্যাগুলির সমাধানার্থে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১.৪.৮ সুপরিচালনা (Guidance)

ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও বৃত্তি বেছে নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

১.৫ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রবণতা বা অভিমুখ (Modern trends of Educational Psychology)

১.৫.১ সূচনা (Introduction)

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শুধু মাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের (general psychology) সূত্র, তত্ত্ব ও তথ্যকে প্রয়োগ করা হয় না। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে বিবিধ পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করে শিশুমনের বিচিত্র রহস্য ও শিক্ষণ সংক্রান্ত নানারকম সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে এখন আর কেবলমাত্র ফলিত মনোবিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয় না। এখন একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত করা হয়। শিখনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা, শিখন-সঞ্চালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে শিখনকে অল্পায়াসে কীভাবে আয়ত্ত করা যায় তা দেখা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্ণয় করা ইত্যাদি এখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান বা অন্য কোনো বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে এককভাবে করে থাকে। সুতরাং বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে অন্য কোনো বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যে নিজেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর বিজ্ঞান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে এ কথা আধুনিক মনোবিদগণ ও এক বাক্যে স্বীকার করেন।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিখন, শিক্ষণ ও শিক্ষার আরো বিবিধ ক্ষেত্রে নিজস্ব অনুশীলনের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রবর্তিত নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব এবং শুধু তাই নয় এই সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণমূলক কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণও সম্ভব। সুতরাং জ্ঞানানুশীলন পদ্ধতির স্বকীয়তার দিক দিয়ে বিচার করলেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানকে একটা পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা যায়। যার নিজস্ব অনুশীলনের পদ্ধতি আছে, স্বভাবতই সে জ্ঞানের জন্য অন্য কোনো বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। এই জন্যে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ একে একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না।

১.৫.২ আধুনিক প্রবণতার ক্ষেত্র (Areas of Modern treds)

বর্তমানে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীগণ যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণারত সেগুলিকে বলা হয়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আধুনিক প্রবণতা (modern trend in educational psychology). এখন আমরা এরকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

১.৪.৩ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality)

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত ও সুবিভক্ত করা হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আর একটা কাজ। সেই কারণে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

১.৪.৪ মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Different characteristics of human beings))

যদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সমাধান করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ তবু শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বেশ কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন শিশুর প্রবৃত্তি প্রক্ষোভের স্বরূপ (nature instincts and emotion of the child), তার চাহিদা ও আগ্রহের বৈশিষ্ট্য (characteristics of the child's needs and interests), মনোনিবেশের নিয়মাবলী (conditions of attention), জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব (inflence of heredity) শাস্তি ও পুরস্কারের কার্যকারিতা (effect of punishiment and reward) ইত্যাদি মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ নির্ণয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিসরের অন্তর্গত।

১.৪.৫ বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক সক্ষমতা (Intelligence and other mental abilities)

শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে শিক্ষার্থীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বুদ্ধি এবং অন্যান্য বিশেষ মানসিক সামর্থাবলী। শিখনের উৎকর্ষ ও দ্রুততা দুই-ই বুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। বুদ্ধিমান ছেলে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের তুলনায় তাড়াতাড়ি শেখে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ মানসিক সামর্থ্য (apptitude) প্রয়োজন। অতএব বুদ্ধি ও বিশেষ সামর্থ্যের পরিমাপ আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১.৪.৬ পরিমাপ ও মূল্যায়ন (Measurement and evaluation)

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিখার্থী কি পরিমাণে শিখলো তার পরিমাপ ও শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গতানুগতিক পরীক্ষাব্যবস্থা যে শিক্ষার্থীর প্রকৃত মূল্যায়নে অনেকাংশেই ব্যর্থ তা এখন সর্বজনস্বীকৃত। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটা গুরু দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন অথচ বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবন। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক অভীক্ষা (test) তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ্য, আগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করার অভীক্ষা গঠনও সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই রকম আরও অভীক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী করে তৈরি করার আবিশ্যকতা আছে।

১.৪.৭ সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণিকক্ষে দলবব্ধ ছাত্রছাত্রীদের আচরণও শিক্ষণের গতি প্রকৃতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সমাজ ও সমাজ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়। পঠন পাঠনের সমাজ মনোবিজ্ঞানের

নির্ভর করে প্রাণীর মানসিক শক্তির উপর যা মনোবিজ্ঞানের একাট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রাণী শিখতে পারে, অথচ জড়বস্তু পারে না। তার একমাত্র কারণ প্রাণীর শিখন ক্ষমতা আছে কিন্তু জড়বস্তুর তা আদৌ নেই। শিখনের মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও গঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ বা কর্মদক্ষতা জানতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন। তাছাড়া শিখন বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচিত প্রত্যক্ষণ (perception), চিন্তন (thinking), মনে রাখা (remembering) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল। এগুলি কীভাবে সংগঠিত হয় এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কী তা জানা সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন মনোবিজ্ঞানে আলোচিত প্রবৃত্তি (instinet), প্রক্ষোত (emotion), আগ্রহ (interest), মনোভাব (attitude) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে তার বিভিন্ন শক্তি, চাহিদা, অভিরুচি, আগ্রহ এসমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানতে হবে। এক কথায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে।

এই সকল কারণে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু করলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা। এরই নাম শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান।

অতএব শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি সেই বিজ্ঞানকে যা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের (general psychology) তথ্য ও তত্ত্বগুলিকে শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে বিশদভাবে বোধগম্য করে তুলতে ও শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানসূত্র দিতে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং শুধু তাই নয় গবেষণা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে। তাই বলা হয় শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রয়োজনমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

১.৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা পরিসর (Scope of Educational Psychology)

১.৪.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত। অতএব শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিসর মানব আচরণের সকল সমস্যার ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। নীচে আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১.৪.২ শিখন প্রক্রিয়া (Learning)

বলা বাহুল্য শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শেখার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপের সঙ্গে শেখার কার্যকারিতার কী সম্বন্ধ, মানসিক শক্তি (mental ability), প্রক্ষোভ (emotion) ও প্রেষণা (motivation) প্রভৃতির উপর শিখন কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিখনের অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি শিখনঘটিত বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধান করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী অন্তদর্শন পদ্ধতিতে স্তুপীকৃত তত্ত্ব ও সূত্রকে অস্বীকার করলেন অপ্রমাণিত ও অনুমানপ্রসূত বলে। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল চেতনাও আত্মা ও মনের মতোই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ গণ্ডীর বাইরে। অন্তদর্শনকে নিরীক্ষণ বলা হলেও এটি সত্যিকারের নিরীক্ষণ নয়। কারণ, যে সময়ে কোনো মানসিক ক্রিয়া (যেমন ক্রোধ) ঘটে ঠিক সে সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। বস্তুত সেটি সম্ভব হয় মানসিক ক্রিয়াটি (যেমন ক্রোধ) ঘটে যাওয়ার পরে। ফলে এতে ভুল ভ্রান্তি থাকবেই। বিশেষত অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা একান্ত ব্যক্তিনির্ভর (subjective)। ফলে এই পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বজনীন নয় (objective) । অথচ নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক বা সর্বজনীন (objective)।

এই মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের (behaviour) বিজ্ঞান। স্থূলই হোক তার সূক্ষ্মই হোক, সব আচরণই নিরীক্ষণের অধীন। সুতরাং প্রাণীর আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক সূত্রাবলীর উর্দঘাটনই মনোবিজ্ঞানের মুখ্য কাজ।

ধরা যাক, একজন ব্যক্তির খুব ক্রোধ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ক্রোধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে অন্তদর্শনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া ওই ব্যক্তির কোনো উপায় সত্যিই থাকবে না। কেননা তার মনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে সেটা কোনো উপায়েই জানা যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। লোকটির রক্তচক্ষু, চিৎকার, আস্ফালন প্রভৃতি বাহ্যিক আচরণ নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আরও উন্নত করে তোলা যায় তবে 'ক্রোধ' সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম তথ্যও আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে। ওই ব্যক্তির নানা আভ্যন্তরীণ দৈহিক পরিবর্তনগুলিও এক ধরনের আচরণ যেমন মাংসপেশির সঙ্কোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির বৈচিত্র্য লক্ষ করে ক্রোধ সম্বন্ধে বহু অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ক্রম বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বার বার বদলে গেছে। মনোবিজ্ঞান প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মনের বিজ্ঞান, তার পরে হল চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিককালে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আচরণের বিজ্ঞান'।

১.৩.৪ শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Education and Psychology)

এবার শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট করতে পারলেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি বোধগম্য হবে। শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও আচরণের আয়ত্তীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও সংগঠনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হল কেমন করে নতুন আচরণ সম্পাদনা করা যায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই আচরণটির প্রকৃতি কী এবং কীভাবে ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্যই।

তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করে শিখন প্রক্রিয়ার উপর এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কোন কিছুর শিখন ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর সে শিখন হতে পারে দু-রকম বস্তুর, যথা—জ্ঞান ও দক্ষতা। এই দু-রকম শিখনই

বুঝি যে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন অথবা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তিত করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের প্রতিনিয়তই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ পর্ব চলেছে পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই কেউ নিরক্ষর হতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউ অশিক্ষিত হতে পারে না।

প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো সমাজে বাস করে। এই সমাজের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির প্রয়োজনে কতকগুলি সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণ (behaviour) সমাজের প্রতিটি ভবিষ্যৎ নাগরিকের আয়ত্ত করতে হয়। এই কাজটিও সম্পন্ন হয় শিখনের (learning) মাধ্যমে এবং শিখনের ফলে যে নতুন সামাজিক আচরণ আয়ত্ত হল তাই সামাজিক শিক্ষা। সমাজের আবশ্যিক আচরণগুলির শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য রয়েছে পরিবার, স্কুল, কলেজ এবং অনেক সামাজিক সংগঠন। এগুলির মাধ্যমেই অপরিণত নাগরিকদের শেখানো হয় বিভিন্ন সামাজিক আচরণ যা সমাজ রক্ষণ ও সমাজের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সমাজ ও ব্যক্তির নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, তার মধ্যে নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলির উন্মোচন একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তির সহায়তায় সমাজ লাভবান হয় এবং সমাজ সুসংহত ও উন্নত হলে ব্যক্তি তার বিকাশের উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ লাভ করে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখে শিক্ষার ব্যাপক একটি সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যেতে পারেঃ

শিক্ষা হল এমন এক ব্যক্তিমুখী প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভৌত, জৈব ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা।

১.৩.৩ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Psychology)

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলই প্রথম মনোবিজ্ঞানকে পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। গ্রিক ভাষায় Psyche শব্দের অর্থ আত্মা এবং logos শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। তাই Psyche ও Logos এই দুটি শব্দের মিলনের উদ্ভবে Psychology বা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হলো আত্মার বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ (observation) ও পরীক্ষণ (experimentation)। যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত একে নিরীক্ষণ ও একে নিয়ে পরীক্ষণের প্রশ্নই উঠে না। তাই মনোবিজ্ঞান হলো আত্মার বিজ্ঞান এই সংজ্ঞাটিতে স্বভাবতই পরিত্যক্ত হল।

পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বজগতকে ডেকার্তে জড় জগৎ ও মনোজগৎ এই দু-ভাগে ভাগ করলেন এবং সেইমত মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হল মন ও মানসিক ক্রিয়া। ডেকার্তের মতে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হবে মনের বিজ্ঞান এবং এর কাজ হবে মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার (যেমন চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা) অনুশীলন করা। কিন্তু মনও মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো শক্তি বা বস্তু নয়। যা দুর্জ্ঞেয় তার ক্রিয়াকলাপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার অতীত। তাই মন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। আর তাই মনোবিজ্ঞান 'মনের বিজ্ঞান' এই সংজ্ঞাটিও পরিত্যক্ত হল। এই কারণে লক্, হব্স্, বেন প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতবাদকে আরও বিশ্লেষণ করে বললেন, আমরা যা সচেতনভাবে প্রত্যক্ষণ (perception) করি তা হল চেতন-মানস ক্রিয়া। চেতনার মধ্যেই আমরা মনের এবং সেই সঙ্গে বহির্জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। অতএব এই সব চিন্তাবিদ চেতনাকে (Consciousness) ভিত্তি করেই এই নতুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। তা হলে এঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল 'চেতনার বিজ্ঞান'। এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি হল অন্তর্দর্শন (introspection)। এই পদ্ধতিতে নিজের চেতনার প্রবাহকে গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে গবেষক নিজেই নিরীক্ষণ করেন। মূলত এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অনেক চিত্তাকর্ষকতত্ত্ব ও সূত্র আবিষ্কৃত হল। কিন্তু বিংশ

১.১ সূচনা (Introduction)

জগৎজোড়া শিক্ষাব্যবস্থার যে অগ্রগতি, এই ব্যবস্থার জটিলতা, সমস্যা ও তার সমাধন, সবকিছুর বেলায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে আছে মনোবিজ্ঞানের নিরলস প্রচেষ্টা। আধুনিক শিক্ষার প্রধান স্তম্ভ মনোবিজ্ঞান ও তার শাখা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। এই জন্য যে কোনো শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পাঠ অপরিহার্য। গত একশত বৎসরেরও বেশি সময় যাবৎ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের যে জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তা এতই বিচিত্র ও বিপুল যে একটি মাত্র পুস্তকে তার সবকিছু উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বর্তমান এককটিতে প্রাথমিক পরিচিত হিসাবে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষামনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক, সংজ্ঞা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives);

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আধুনিক অভিমুখ উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

১.৩ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Educational Psychology)

১.৩.১ সূচনা (Introduction)

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি যৌগিক শব্দ যা শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এ দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ বা সংজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

১.৩.২ শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Education)

সাধারণ মানুষ, শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত তা অতি সঙ্কীর্ণ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে যে জ্ঞানার্জন তাকেই তাঁরা শিক্ষা বলে অভিহিত করে থাকেন। যে স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি তাকে সাধারণভাবে বলা হয় অশিক্ষিত আর যে পড়ার সুযোগ পেল তাকে বলা হয় শিক্ষিত। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত পরিসীমা অনেক বড়ো। আমরা স্কুল কলেজে গিয়ে যেমন শিক্ষা লাভ করি আবার ওই প্রতিষ্ঠান সমূহে না গিয়েও অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করি। আমরা সারা জীবন ধরেই নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা

একক ১ ❑ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)

গঠন

১.১ সূচনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

- ১.৩.১ সূচনা
- ১.৩.২ শিক্ষার সংজ্ঞা
- ১.৩.৩ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
- ১.৩.৪ শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

১.৪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা পরিসর

- ১.৪.১ সূচনা
- ১.৪.২ শিখন প্রক্রিয়া
- ১.৪.৩ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ
- ১.৪.৪ মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ
- ১.৪.৫ বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক সক্ষমতা
- ১.৪.৬ মূল্যায়ন ও পরিমাপ
- ১.৪.৭ সমাজ মনোবিজ্ঞান
- ১.৪.৮ সুপরিচালনা

১.৫ আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রবণতা বা অভিমুখ

- ১.৫.১ সূচনা
- ১.৫.২ আধুনিক প্রবণতার ক্ষেত্র

১.৬ শিক্ষামনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

- ১.৬.১ সূচনা
- ১.৬.২ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
  - ১.৬.২.১ অন্তদর্শন
  - ১.৬.২.২ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ
- ১.৬.৩ পরীক্ষণ পদ্ধতি
- ১.৬.৪ বিকাশমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- ১.৬.৫ ঘটনার বিবরণ পদ্ধতি
- ১.৬.৬ মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতি
- ১.৬.৭ তুলনামূলক পদ্ধতি

একক ৬ ❑ শিক্ষার্থীর বুদ্ধি (Learner's Intelligence)

গঠন

৬.১ সূচনা (Introduction)

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

৬.৩ বুদ্ধির ধারণা (Concept of Intelligence)

৬.৩.১ বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligance)

৬.৪ বুদ্ধির তত্ত্ব (Theories of Intelligence)

৬.৪.১ স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's Two-factor Theory)

৬.৪.২ থার্সটোনের মৌলিক মানসিক সক্ষমতা বিষয়ক তত্ত্ব (Thurstone's Theory of Primary Mental Abilities)

৬.৪.৩ গিলফোর্ডের ধী-শক্তির গঠন তত্ত্ব (Guilford's Structure of Intellect Theory)

৬.৪.৪ স্টার্নবার্গের তত্ত্ব (Sternberg's Theory)

৬.৫ বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence)

৬.৫.১ বুদ্ধি অভীক্ষার পদের প্রকারভেদ (Types of Items in Intelligence Test)

৬.৫.২ বিনে স্কেলের সংস্করণ (Revision of Binet Scale)

৬.৫.৩ স্ট্যানফোর্ড—বিনে স্কেল (Stanford-Binet Scale)

৬.৫.৪ বুদ্ধি অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Intelligence Tests)

৬.৫.৫ সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)

৬.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

৬.১ সূচনা (Introduction)

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অতি সহজে সমাজজীবনে সমস্যার সম্মুখীন হলে তার মোকাবিলা করতে পারেন। কারুর সাহায্য ছাড়াই সমস্যার গণ্ডি পার হতে পারেন। আবার কোনো প্রয়োজনের তাগিদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতা, বিচার বিবেচনামূলক চিন্তা শক্তি, উদ্দেশ্যমুখী কাজ করার দক্ষতা এবং পরিবেশের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোজনের ক্ষমতার অধিকারী যিনি বা যাঁরা, তাঁদেরই বুদ্ধিমান বলা হয়। আবার কিছু মানুষ আছেন যাঁরা একটু সমস্যার সম্মুখীন হলে অল্পে বিচলিত হয়ে পরেন এবং আরও সমস্যা তৈরি করেন, জীবনে চলার পথকে মসৃণ করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, যেন একটু

বেশি মাত্রায় পরনির্ভর এর মানে কিন্তু এই নয় তাঁরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জীবিকা অর্জনে অপারগ। শুধুমাত্র সময়োপযোগী বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের অক্ষমতাই তাঁদের বুদ্ধিহীন করে তোলে ফলে তাঁদের জীবনে এগিয়ে চলার পথে নেমে আসে বিবিধ বাধাবিপত্তি। এই এককে বুদ্ধির বিভিন্ন রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককে যে ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা—

- বুদ্ধির সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে তার স্বরূপ বুঝতে পারবেন।
- বুদ্ধি মাপার বিভিন্ন অভীক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অধিকারী হবেন।
- প্রয়োজনে এই অভীক্ষার প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণার অধিকারী হবেন।

৬.৩ বুদ্ধির ধারণা (Concept of Intelligence)

'বুদ্ধি' এই শব্দটি মানুষের মধ্যে এখন একটা বেশ পরিচিত শব্দ। সাধারণ মানুষ কোনো ছোটো ছেলে বা মেয়ের কথাবার্তা, কার্যকলাপ লক্ষ করে বলে থাকেন এ জন্মগত মানসিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে—এ নিশ্চয় একদিন একজন হয়ে ওঠবে। এত ছোটো হলে হবে কী এ তো বড়োদেরও হার মানিয়ে দিচ্ছে। এই ছোটো বয়সেই যদি এই সমস্ত অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে তা হ'লে বড়ো হলে কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কথাগুলির মধ্যে হয়তো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই কিন্তু এই মানুষেরা কিছু একটা খুঁজে পান তা দিয়ে সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাগুলি বলে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞান তো সাধারণ কথাবার্তা এবং শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। তাই তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রয়োজন। সেই বৈজ্ঞানিক রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হার্বার্ট স্পেনসার এবং স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন বুদ্ধি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁদের এই বুদ্ধি নিয়ে গবেষণা ফল রচনা আকারে প্রকাশিত হবার পর মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ও প্রকাশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই সঙ্গো মনোবিদরা বিশেষ ভাবে বুদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে তার স্বরূপ ও পরিমাপের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য মনোবিদরা যে সমস্ত গবেষণা হাজির করলেন তার সঙ্গো পরস্পর সংগতি খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা একমত হতে পারলেন না। কেউ বললেন বুদ্ধি এক না বহু, আবার কেউ বললেন বুদ্ধি জন্মগত না অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর, এই নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা চলতে থাকল। এই সময়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত জার্নাল 'জার্নাল অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি'র সম্পাদক তাঁর জার্নালে বুদ্ধির স্বরূপ এবং তাঁদের গবেষণার দিক প্রকাশের জন্য ২৭জন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীর কাছে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর এই আহ্বানে ১৩জন সাড়া দিলেন এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ পত্রে ফুটে উঠল বুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার পার্থক্যের ছবি। সেই ছবির সঙ্গো আরো অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের কিছু সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

৬.৩.১ বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligance)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মনোবিদদের মধ্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কিন্তু বুদ্ধির কার্যকরী সংজ্ঞা জানার জন্য অন্যান্য মনোবিদদের সংজ্ঞা জানা এবং তার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। মনোবিদ স্টার্নের মতে, 'জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি' (Intelligence is the ability to adjust with novel situations of life)। এই সংজ্ঞাকে বুদ্ধির সংজ্ঞা হিসেবে মেনে নিলে বুদ্ধিকে মানুষের অন্যান্য অনেক ক্ষমতার থেকে পৃথক করা যায় না। কারণ শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করা যায় না। তারজন্য শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ, পূর্ণ অভিজ্ঞতা, উপযুক্ত প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রয়োজন। তবে একথা ঠিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

ডিয়ারবর্নের মতে 'বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হওয়ার ক্ষমতা' (Intelligence is the ability to profit from experience)। এই সংজ্ঞাটিও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রথমত অভিজ্ঞতা লাভ বুদ্ধি নির্ভর আবার বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ছাড়া কার্যকর নয়, এমন ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতা কোনো সংজ্ঞা নির্ণয়ের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

এমনিভাবে আরও যে সব সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যেমন, বুদ্ধি হল বিমূর্তচিন্তার ক্ষমতা (Intelligence is the ability of abstract thinking), বুদ্ধি হল শিক্ষালাভ করার ক্ষমতা (Intelligence is the ability to learn) ইত্যাদি। তাদের সব কয়টিতেই বুদ্ধির এক একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে কিন্তু কোনোটিই তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নয়। ভার্নন (Vernon) বুদ্ধির সংজ্ঞাগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করে তিন প্রকার সংজ্ঞার কথা বলেছেন। যথা, জৈবিক (Biological), মানসিক (Psychological) এবং কার্যকরী (Operational) সংজ্ঞা। অন্যদিকে ফ্রীম্যান (Freeman) তিন প্রকার সংজ্ঞার শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেমন, (১) পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা (Ability to adjust with the environment, (2) শিখনের ক্ষমতা (Ability to learn) এবং (৩) বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা Ability of abstract thinking)।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্টোডার্ড (Stoddard) তাঁর The Appraisal of Intelligence নামক গ্রন্থে বুদ্ধির যে কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকের কাছে পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, বুদ্ধি হল সেই সব কাজ করার ক্ষমতা যা (১) দুরূহতা, (২) জটিলতা, (৩) বিমূর্ততা, (৪) সংক্ষিপ্ততম পন্থা, (৫) সামাজিক মূল্য, (৬) মৌলিকত্ব এবং (৭) লক্ষ্যের প্রতি অভিযোজনমুখিতা এইসব বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং প্রক্ষোভজনিত বাধার বিরুদ্ধে এই শক্তিকে সংহত করে ধরে রাখার ক্ষমতা (Intelligence is the ability to undertake such activities that are characterised by (1) difficulty, (2) complexity, (3) abstractness, (4) economy, (5) social value, (6) originality and (7) adaptiveness to goal and to maintan such act under situations that demand concentration of energy and resistance to emotional forces).

বুদ্ধির সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করলে বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কয়েকটি চিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে আসে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

- বুদ্ধি একটি মৌলিক মানসিক ক্ষমতা, কিন্তু এর প্রকাশ ঘটে নানা ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে।
- বুদ্ধির মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে তাকে কাজে লাগাতে পারি, বিমূর্তচিন্তা করতে পারি এবং সামাজিক মূল্যযুক্ত কাজ করতে পারি।

- বুদ্ধির সাহায্যে আমরা নতুন শিক্ষা লাভ করতে পারি এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে পারি।
- বুদ্ধির সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান বা বিচ্ছিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
- কোনো লক্ষ্য অর্জন করার পদ্ধতি নির্বাচন ও সংক্ষিপ্ততম পথে লক্ষ্য অর্জন করায় বুদ্ধি কার্যকর ভূমিকা নেয়।
- বুদ্ধি জটিল ও দুরূহ কাজ করার জন্য প্রয়োজন।
- এই সব কাজের গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিবিভাগ করা বা বুদ্ধির মান অনুযায়ী মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র সংজ্ঞার ভিত্তিতে বুদ্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে সন্তুষ্ট থাকেন নি। তারা আরও নানাভাবে বুদ্ধির প্রকৃতিকে জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বুদ্ধির নানা তত্ত্ব। বুদ্ধির তত্ত্বগুলি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়েছে। সেগুলি হল, বুদ্ধি কি একটি সর্বব্যাপী একক মানসিক ক্ষমতা, না একাধিক মানসিক সক্ষমতার সমন্বয় ? বুদ্ধি কি এক প্রকার, না অনেক প্রকার ? সমস্ত মানুষের বুদ্ধি কি একই প্রকার ? ইত্যাদি।

৬.৪ বুদ্ধির তত্ত্ব (Theories of Intelligence)

প্রাথমিকভাবে বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে, বুদ্ধির কার্যকারিতা বা ক্রিয়াপ্রণালী সম্বন্ধে জানার চেষ্টা শুরু হয়। সেজন্য প্রথমদিকে উপাদান বিশ্লেষণভিত্তিক তত্ত্ব (Factor Analytic Theories) এবং পরবর্তীকালে তথ্যজাড়ণ ভিত্তিক তত্ত্বের (Information Processing Theories) দেখতে পাওয়া যায়। উপাদান বিশ্লেষণভিত্তিক তত্ত্বের জনক হলেন স্পীয়ারম্যান (Spearman)।

৬.৪.১ স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's Two-factor Theory)

১৯০৪ সালে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী চার্লস স্পীয়ারম্যান (Charles Spearman) লক্ষ করেন, একদল ব্যক্তিকে বুদ্ধি পরিমাপক অনেকগুলি কাজ দিয়ে (বুদ্ধির পরিমাপ সংক্রান্ত পরবর্তী অংশটি দ্রষ্টব্য) তাদের প্রাপ্ত নম্বরগুলির মধ্যে পরস্পর সহগতি (Correlation) নির্ণয় করলে সহগাঙ্কের মান (Coefficient of Correlation) কখনই শূন্য বা +১ হয় না। আমরা জানি, যদি দুইটি পরিমাপ যদি অভিন্ন হয় তবে তাদের মধ্যে সহগাঙ্কের মান হবে +১। যেমন, দুটি স্কেল দিয়ে যদি দশটি রেখার দৈর্ঘ্য মাপা হয়, তবে দুই স্কেল থেকে প্রাপ্ত পরিমাপগুলির মধ্যে সহগাঙ্ক হবে +১ কারণ, উভয় পরিমাপের বেলাতেই দীর্ঘতম রেখাটি দীর্ঘতমই থাকবে, দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেখা দ্বিতীয় হবে এবং এইভাবে হ্রস্বতম রেখাটি হ্রস্বতম হবে। সুতরাং বুদ্ধি পরিমাপক কাজগুলির মধ্যে সহগাঙ্কের মান +১ বা '০' না হয় মধ্যবর্তী কোনো দশমিক ভগ্নাংশ হওয়ার অর্থ, ঐ পরিমাপকগুলি একই ক্ষমতা মাপছে না বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাও মাপছে না। অর্থাৎ সহজ কথায় বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি আংশিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত কোনো মানসিক ক্ষমতা মাপছে।

এরপর স্পীয়ারম্যান লক্ষ করলেন, প্রত্যেকটি অভীক্ষার সঙ্গে বাকি সব কয়টি অভীক্ষার সঙ্গে সহগাঙ্ক

নির্ণয় করে সেগুলিকে ছক (Matrix) আকারে সাজালে, এমন একটি গাণিতিক শর্তপূরণ করে, যার অর্থ ঐ সহগাঙ্কগুলির একটি সাধারণ উপাদান (Common Factor) বর্তমান। ঐ সাধারণ উপাদানটির নাম তিনি দিলেন g-উপাদান (general factor)।g উপাদানটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে প্রত্যেকটি সহগাঙ্কে যে অবশিষ্ট (Residue) পড়ে থাকে তা প্রত্যেকটি অভীক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা। এক নাম দেওয়া হল নির্দিষ্ট উপাদান বা s-উপাদান (s pecific factor)।

স্পীয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হল আমাদের সমস্ত বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (General Mental Ability) সক্রিয় আছে। এই সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাণ এক এক জন মানুষের আলাদা রকম। কোনো মানুষ কতটা বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী তা নির্ভর করে তার সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাণের ওপর। এ ছাড়াও প্রতিটি বৌদ্ধিক কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট s উপাদান আছে। যেজন্য s উপাদানের সংখ্যা অনেক। কিন্তু g উপাদান ব্যতীত s উপাদান কার্যকর হতে পারে না। সুতরাং কোনো বৌদ্ধিক কাজে পারদর্শিতার মান g উপাদান ও s উপাদানের মিলিত সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হল।

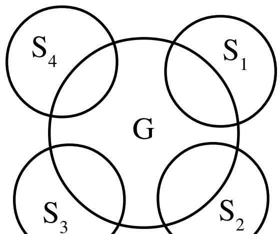

প্রথম ব্যক্তি

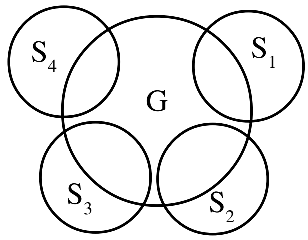

দ্বিতীয় ব্যক্তি

এখানে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কারণ তার g উপাদান কম। আবার S_1, S_2, S_3, S_4 এই চারটি বিশেষ সক্ষমতার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির S_1 এবং S_2 তুলনামূলকভাবে বেশি। অতএব প্রথম ব্যক্তি এই দুই ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির S_4 প্রথম ব্যক্তির থেকে বেশি হলেও যেহেতু তার g কম সেহেতু প্রত্যাশামত পারদর্শিতা দেখতে পাওয়া যাবে না।

স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের সাহায্যে বুদ্ধির দিক থেকে পরিমাণগত এবং গুণগত ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষে মানুষে বুদ্ধির পার্থক্য শুধুমাত্র কে কতটা বুদ্ধিমান বা কম বুদ্ধিসম্পন্ন এইভাবে বিচার হয় না, কারো বুদ্ধি কোনো কোনো কাজে বেশি সক্রিয় সেদিক দিয়েও বিচার করা যায়। একজন গণিতে অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেন, কিন্তু সাহিত্যে সাধারণ মানের। অপর একজন সুদক্ষ ভাষাবিদ কিন্তু গণিতে কাঁচা। এর কারণ দুইজনেরই g উপাদান সমান হলেও, একজনের গণিতের s উপাদনে বেশি, অন্যজনের ভাষার s উপাদান বেশি। ফলে তাদের বুদ্ধির প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে।

সমসাময়িক ও পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন, বুদ্ধির গঠন এত সরল নয়। এমন অনেক বৌদ্ধিক ক্রিয়া আছে যা একটিমাত্র s উপাদানের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় না। পাটিগণিতের সমস্যা

সমাধানের জন্য ভাষাবোধ, যুক্তি এবং গাণিতিক ক্ষমতা (Language Comprehension, Reasoning and Numerical ability) তিনটিই প্রয়োজন। এইজন্য পরবর্তীকালে স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বে তৃতীয় একপ্রকার উপাদান যুক্ত হয়। এর নাম যৌথ উপাদান (Group Factor)। যৌথ উপাদানগুলি g উপাদানের মত এত সর্বব্যাপক নয় আবার s উপাদানের মত এত সুনির্দিষ্টও নয়।

স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের একটি প্রধান দুর্বলতা হল, s উপাদানের সংখ্যা কত তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি বা বলা সম্ভব নয়। সম্ভাবনা এই যে যত রকম বৌদ্ধিক ক্রিয়া থাকা সম্ভব, তার প্রত্যেকটির জন্য একটি করে s থাকা উচিত। এই জন্যই থার্সটোন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা g উপাদানের ও s উপাদানের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁরা মনে করেন বুদ্ধি আসলে সীমিত সংখ্যক স্বতন্ত্র উপাদানের সমন্বয় বা সমষ্টি। স্পীয়ারম্যানের প্রধানতম অবদান, উপাদান বিশ্লেষণের গাণিতিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করা যা পরবর্তীকালে আর উন্নত হয়ে মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এ ছাড়াও বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে g উপাদানের ব্যবহার এখনও অনস্বীকার্য। ক্যাটেল (Cattell) তাঁর বুদ্ধির উপাদান তত্ত্বে স্পীয়ারম্যানের উপাদানগুলিকেই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, দুই প্রকার সাধারণ সক্ষমতা (g) আছে। একটি হল তরল g (Fluid g) যা সর্বত্রগামী অপরটি হল কেলাসিত g (Crystallised g) যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সক্রিয়। বলা বাহুল্য প্রথমটি স্পীয়ারম্যানের g এবং দ্বিতীয়টি s উপাদানের সমতুল।

৬.৪.২ থার্সটোনের মৌলিক মানসিক সক্ষমতা বিষয়ক তত্ত্ব (Thurstone's Theory of Primary Mental Abilities)

স্পীয়ারম্যানের উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছিল খুবই সরল। এই পদ্ধতিতে অনেক সংখ্যক অভীক্ষা প্রয়োগ করে বড় সহগাঙ্কের ছক (Correlation Matrix) নিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী এন. এল. থার্সটোন উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করেন। ২৪০ ছাত্রের ওপর ৫৬টি অভীক্ষা প্রয়োগ করে তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করেন। ৫৬টি অভীক্ষার প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সহগাঙ্ক নির্ণয় করলে মোট ১৫৪০টি সহগাঙ্ক পাওয়া যায়। এই বিরাট সংখ্যক সহগাঙ্কের মধ্যে তিনি কোনো সাধারণ উপাদান বা g খুঁজে পাননি। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্পীয়ারম্যানের তত্ত্ব খারিজ করে তিনি বললেন আমাদের বুদ্ধি সাতটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন বৌদ্ধিক ক্রিয়ায় এই উপাদানগুলির সমন্বয় ঘটে। বলা বাহুল্য সমস্ত বৌদ্ধিক ক্রিয়ায় সমস্ত উপাদান সক্রিয় থাকে না।

উপাদানগুলি হল—

(১) স্থানিক বোধ বা ক্ষমতা (Spatial ability বা s) — এই ক্ষমতার সাহায্যে আমরা বিস্তার, দূরত্ব, আকৃতি, গঠন, পারস্পরিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করি ও বৌদ্ধিক ক্রিয়ায় প্রয়োজন মতো ব্যবহার করি।

(২) দ্রুত প্রতক্ষণের ক্ষমতা (Perceptual Speed বা P) — প্রত্যক্ষণ হল বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রাথমিক ধাপ। দ্রুত প্রত্যক্ষণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা দৃশ্য, শ্রাব্য ইত্যাদি উদ্দীপনার সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি।

(৩) সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষমতা (Numerical Ability বা N) — গণনা, সংখ্যার সাহায্যে ধারণার প্রকাশ, সংখ্যার নিয়ে মানসিক ক্রিয়া, ইত্যাদি এই ক্ষমতার অন্তর্গত।

(৪) ভাষার অর্থবোধ (Verbal Meaning বা Semantic Meaning, বা V)— আমাদের ধারণা গঠনের (Concept formation) সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাচনিক ক্ষমতা অর্জন করার বহু আগে থেকেই আমাদের ভাষার অর্থবোধ জন্মায়। কাজেই ভাষা বাইরের জগৎকে জানার, ধারণ করার এবং সামগ্রিক বৌদ্ধিক ক্রিয়ার একটি প্রধান বাহন।

(৫) স্মৃতি (Memory বা M) — স্মৃতি সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার আধার। আর পূর্ব অভিজ্ঞতা, সঞ্চিত ধারণা ও জ্ঞান এমনকী তাৎক্ষণিক স্মৃতিও বুদ্ধির একটি প্রধান উপাদান। যার স্মৃতি দুর্বল, সে কখনই বুদ্ধিমান হিসেবে পরিগণিত হয় না।

(৬) শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য (Word Fluency বা W) —দ্রুত উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা বুদ্ধির একটি আবশ্যিক মৌলিক উপাদান। এই কারণেই বুদ্ধিমান মানুষরা ভাষা ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল।

(৭) আরোহী যুক্তি (Inductive Reasoning বা R) — একক বিষয় বা একক পর্যবেক্ষণ থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতাই হল আরোহী যুক্তি। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির তাৎপর্য ব্যাখ্যায়, ধারণা গঠনে, প্রত্যক্ষণজনিত অভিজ্ঞতার শ্রেণিবিভাগ করায় প্রতিনিয়ত আরোহী যুক্তি ব্যবহৃত হয়। সেজন্য অরোহী যুক্তিও বুদ্ধির একটি প্রধান উপাদান।

থার্সটোনের তত্ত্বে উল্লিখিত উপাদানগুলি শিশুদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। তার পরিবর্তে পাওয়া গেছে একটি সঞ্চালনমূলক উপাদান (Motor factor)। আরও পরবর্তীকালে স্মৃতি উপাদানটি পরিত্যক্ত হয়। বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধির মৌলিক উপাদানগুলি আলাদা হওয়ায় থার্সটোনের তত্ত্বের সর্বজনীনতা থাকেনি। যেমন,

৫-৭ বছর — V, P, S এবং পরিমাণসূচক ক্ষমতা ও সঞ্চালনমূলক ক্ষমতা।

৭-১১ বছর — V, P, S, R, N

১১-১৭ বছর — V, S, R, N, W

আরও উন্নততর উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর এবং বিশ্লেষণের কাজে উন্নততর কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে শেষপর্যন্ত সাধারণ উপাদানের ধারণাটি থার্সটোন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়াও তাঁর উপাদানগুলিকে মৌলিক ক্ষমতা বা উপাদান বললেও, এগুলি মনোবৈজ্ঞানিক বিচারে মৌলিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

৬.৪.৩. গিলফোর্ডের ধী-শক্তির গঠন তত্ত্ব (Guilford's Structure of Intellect Theory)

অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণভিত্তিক তত্ত্বের সঙ্গে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী গিলফোর্ডের বুদ্ধি তত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত তিনি বুদ্ধি (Intelligence) ও ধী-শক্তি (Intellect) এই দুই ধারণাকে তাঁর তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধী-শক্তি হল আমাদের সমস্ত রকম বৌদ্ধিক শক্তির সামগ্রিক আধার যার প্রকাশ ঘটে নানা মানসিক ও অন্যান্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু পরিবেশজনিত কারণে এই শক্তির সবটা বাইরে প্রকাশ পায় না বা কাজে লাগানো হয় না। বুদ্ধি হল ধী-শক্তির যে অংশটা কাজে লাগানো হয় বা প্রকাশ পায় তাই (Intelligence is Intellect put to use)। অর্থাৎ বুদ্ধি ধী-শক্তির অংশ বিশেষ।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল, অন্যান্য তত্ত্বের মত তিনি দ্বিমাত্রিক (Two dimensional) শ্রেণিবিভাগ না করে

ধী-শক্তিকে ত্রি-মাত্রিক (Three dimensional) ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই তিনটি মাত্রা হল, বৌদ্ধিক কাজের বাহন (Content), বৌদ্ধিক ক্রিয়া (Operation) এবং ক্রিয়া প্রসূত উপজাত ধারণা (Product)। বৌদ্ধিক ক্রিয়া উদ্দীপিত হওয়ার জন্য এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াসম্পন্ন করার মাধ্যমে হিসেবে যে উপাদানগুলি প্রয়োজন তাকেই বলা হয় বিষয়বস্তু (Content) বা বাহন। যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি আমাদের বৌদ্ধিক আচরণটি নিষ্পন্ন করে তাই হল বৌদ্ধিক ক্রিয়া (Operation) আর এই ক্রিয়ার ফলে যে ধারণাগুলি উৎপন্ন হয় তাই হল উপজাত ধারণা (Product)।

তৃতীয় পার্থক্য হল, অধিকাংশ উপাদান বিশ্লেষণভিত্তিক তত্ত্ব প্রথমে একদল ব্যক্তির ওপর অনেক অভীক্ষা প্রয়োগ করে তাদের উৎপাদন বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে গিলফোর্ড প্রথমে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি কাল্পনিক গঠন (Hypothetical Struture) স্থির করে নিয়ে তারপর অভীক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগ করে তার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। এই পদ্ধতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

গিলফোর্ড তাঁর ধী-শক্তির ত্রি-মাত্রিক তত্ত্বে, পাঁচপ্রকার মানসিক বা বৌদ্ধিক ক্রিয়া, চারপ্রকার বিষয়বস্তু এবং ছয়প্রকার উপজাত উপাদানের কথা বলেছেন। এইগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করার পূর্বে নীচের চিত্রটিতে তাঁর তত্ত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হল।

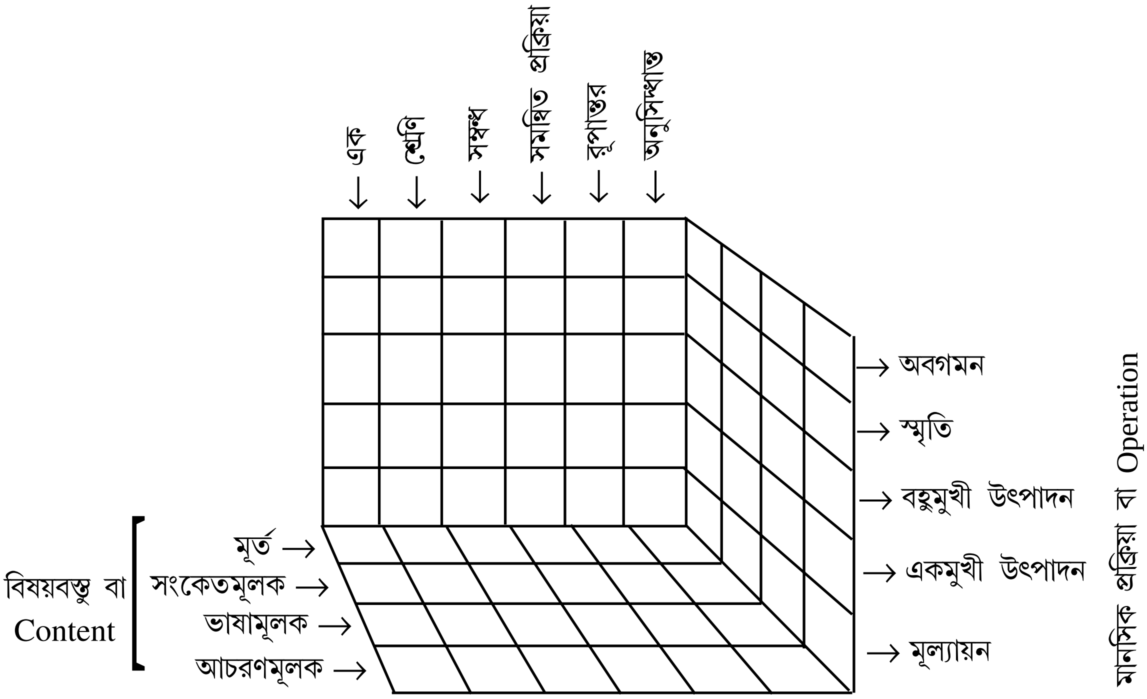

এক নং চিত্র : গিলফোর্ডের ত্রিমাত্রিক ধী-শক্তির তত্ত্ব

গিলফোর্ডের মতে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক প্রকার মানসিক ক্রিয়া যুক্ত হয় এবং তার দরুন যে-কোনো উপজাত ধারণা গঠিত হতে পারে। অর্থাৎ ৪×৫×৬ এই ১২০টি উপাদানের সমন্বয় হল আমাদের ধী-শক্তি। এক

এক ধরনের বৌদ্ধিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সমন্বয় ঘটে। তিনি উপাদানগুলির যে পরিচিতি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ।

বিষয়বস্তু (Content)

মূর্ত (Figural) — যে সব বস্তুর প্রত্যক্ষণজাত অবয়ব আছে। যা দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায়, ইত্যাদি।

সংকেতমূলক (Symbolic) — মূর্তবস্তুর বা অন্যান্য ধারণা যা সংকেতের সাহায্যে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যেমন, কোনো কিছুর চিহ্ন (Sign)।

ভাষামূলক (Semantic) — যদিও ভাষা নিজেই একধরনের সংকেত তবুও ভাষা স্বতন্ত্রভাবে বৌদ্ধিক ক্রিয়ার বাহন। ভাষা আমাদের ধারণা (Concept), চিন্তন (Thinking) ইত্যাদির মাধ্যম।

আচরণমূলক (Behavioural) — মানুষ বা প্রাণীর আচরণ আমাদের বৌদ্ধিক ক্রিয়ার আর একটি বাহন।

মানসিক প্রক্রিয়া (Operation)

অবগমন (Cognition) — বৌদ্ধিক ক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অস্তিত্ববোধ তৈরি হওয়া।

স্মৃতি (Memory) — তারপর স্মৃতিতে সঞ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মানসিক প্রক্রিয়ার সূচনা ও শেষপর্যন্ত প্রক্রিয়াটি ধরে রাখা।

বহুমুখী উৎপাদন (Divergent Production) — চিন্তার বহুমুখিতা অর্থাৎ সম্ভাব্য সমস্তরকম অভিমুখকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করার নাম বহুমুখী উৎপাদন।

একমুখী উৎপাদন (Convergent Production) — একমুখী চিন্তা পূর্বোক্ত বহুমুখী চিন্তার বিপরীত। এখানে একটিমাত্র অবধারিত অভিমুখই বিবেচিত হয়। যেমন, কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আর কোনো বিকল্প সমাধানের চিন্তা না করে যা সহজতম অবধারিত সমাধান তাকেই গ্রহণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) — এটি একধরনের অধিপ্রক্রিয়া (Metaoperation) যা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির গুণাগুণ বা উপযুক্ততা বিচার করে। অর্থাৎ যে বৌদ্ধিক ক্রিয়াটি সক্রিয় আছে তা ঠিক না ভুল, প্রাপ্ত উপজাত ধারণা যথাযথ কি না এই বোধ বা সচেতনতা।

উপজাত ধারণা (Product)

একক (Unit) — বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্রতম বা একটিমাত্র কোনো কিছুর ধারণা।

শ্রেণি (Class) — যখন একাধিক একক ধারণা কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি দল বা সেট (Set) গঠন করে।

সম্বন্ধ (Relation) — বৌদ্ধিক ক্রিয়ার একটি প্রধান উপজাত ধারণা হল, এককগুলির মধ্যে বা শ্রেণিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় বা সম্বন্ধ বোধ।

সমন্বিত ধারণা (System) — যখন একাধিক শ্রেণি এমনভাবে পরস্পর সংগঠিত হয় যে প্রত্যেকটি শ্রেণির সঙ্গে প্রত্যেকটির একটি বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, তাকে বলে সমন্বিত ধারণা বা System। যেমন, প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে প্রত্যেকটির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। এটি একটি সমন্বিত ধারণা।

রূপান্তর (Transformation)—একটি ধারণাকে ভিন্নরূপে রূপান্তরিত করা।

অনুসিদ্ধান্ত (Implication)—প্রত্যক্ষণ জাত অভিজ্ঞতার অতীত যে বিমূর্ত ধারণা তাই অনুসিদ্ধান্ত।

গিলফোর্ডের তত্ত্বে যুক্তি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি যাবতীয় বৌদ্ধিক বা আংশিক বৌদ্ধিক ক্রিয়াগুলিকে ধী-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও ব্যাবহারিক দিক থেকে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। কারণ গিলফোর্ড প্রতিটি উপাদান পরিমাপের জন্য অভীক্ষা নির্মাণ করে যেতে পারেননি। তাঁর পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা কাজটি অনেকাংশে সম্পন্ন করলেও, কোনো প্রয়োজনে কোনো কোনো উপাদান পরিমাপ করা দরকার সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। বিশেষভাবে নির্দেশনা বা পরামর্শদান, যেখানে বুদ্ধি অভীক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ দেখা যায়, সেখানে স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মিত বুদ্ধি অভীক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৬.৪.৪ স্টার্নবার্গের তত্ত্ব (Sternberg's Theory)

স্টার্নবার্গ তাঁর বুদ্ধিতত্ত্বে উপাদান বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের বুদ্ধির তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরটিকে তিনি বলেছেন অধি উপাদান (Meta component)। এর কাজ অনেকটা সঞ্চালক বা পরিচালকের মত। এর সাহায্যে আমাদের উচ্চতর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে আছে আটটি উপাদান।

সমস্যার অস্তিত্ববোধ (Awareness of problem)— এটি না হলে আমাদের বৌদ্ধিক ক্রিয়া জাগ্রত হবে না।

সমস্যার স্বরূপবোধ (Understanding the nature of problem)— সমস্যাটি কী এবং সমাধানযোগ্য কি না অথবা কোন্ ধরনের সমস্যা ইত্যাদি বোধ।

প্রাথমিক উপাদান সম্বন্ধে বোধ (Understanding the primary elements)—অর্থাৎ সমস্যা সমাধান করতে কোন্ কোন্ মানসিক উপাদানগুলি প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে বোধ।

উপাদানগুলির সমন্বয় সাধন করে সমাধানের বাস্তব উপায় নির্বাচন করা (Integrating the elements and there by selecting practical means to solve the problem)।

মানসিক প্রতিরূপের সাহায্যে তথ্যগুলিকে একত্রিত করা (Collecting the facts information by mental representation)।

মনোযোগকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করা (Mobilising attention appropriately)।

কার্য সম্পাদনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করা (Controlling one's position in synchronisation with various stages of performance)।

কার্যসম্পাদনের যথার্থতা ও গুণ বিষয়ে প্রতিসংকেত বুঝতে পারা (Understanding the feedback about adequacy and merit of performance)।

এর পরবর্তী স্তরের উপাদানগুলিকে স্টার্নবার্গ বলেছেন কার্য সম্পাদন ভিত্তিক উপাদান (Performance components)। কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে প্রথম যে উপাদানটির কথা বলা হয়েছে তা হল, উদ্দীপকের স্বরূপকে অবধারণ করা (Comprehension of the nature of stimulus) অর্থাৎ কী ধরনের কাজটি সম্পন্ন

করতে হবে সেটি বোঝা। তারপরের উপাদান হল, উদ্দীপকের অংশের বা দুটি উদ্দীপকের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পারা (Understanding the relation between parts of stimulus or between two stimuli) এবং তৃতীয় উপাদান হল, পূর্বের কোনো সম্বন্ধ বর্তমানে ব্যবহার করা (using a prerions relation for the present)।

সর্বশেষ স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞান আহরণভিত্তিক উপাদান (Knowledge acquisition component) জ্ঞান আহরণ কথাটির অর্থ হল নতুন তথ্য গ্রহণ ও স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখা। এই স্তরের প্রধান তিনটি উপাদান হল নির্বাচিত সংকেতায়ন (Selective encoding)। এই উপাদানের সাহায্যে আমরা তথ্যের ঝাড়াই বাছাই করে নির্বাচিত কিছু তথ্যকে স্মৃতি সংকেতে পরিণত করি। দ্বিতীয় উপাদানটি হল নির্বাচিত সমাহার (Selective combination)। এই উপাদানের সাহায্যে আমরা স্মৃতিতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একাধিক তথ্যের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় সাধন করি। সবশেষে আছে নির্বাচিত তুলনা (Selective Comparison) অর্থাৎ পূর্বে সংরক্ষিত তথ্যগুলির সঙ্গো তুলনার মাধ্যমে নতুন তথ্য সংরক্ষণ করা।

এই তত্ত্ব এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে আছে। কম্পিউটারের স্মৃতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence) সংক্রান্ত গবেষণা এই জাতীয় জ্ঞানমূলক তত্ত্বগুলির ভিত্তি। সে হিসেবে এদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনেকটাই পরীক্ষিত। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিশেষত শিক্ষার প্রয়োজনে এই তত্ত্বগুলি কীভাবে কাজে লাগবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

৬.৫ বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence)

বুদ্ধি কীভাবে মাপা যেতে পারে এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। বুদ্ধি পরিমাপের পথ প্রদর্শক হলেন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে। তিনি নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে বুদ্ধি পরিমাপের একটা নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। বিনের কাজে প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর সহকর্মী সাইমন। তাই বুদ্ধি পরিমাপের এই অভীক্ষাটি 'বিনে সাইমন স্কেল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিনে সাইমন স্কেলের স্বরূপ (Nature of Brinet Simon Scale)

(১) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলো প্রশ্নের সমাহার। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর বা সমাধান করতে পারার ওপর অভীক্ষাটির বুদ্ধি নির্ভরশীল।

(২) এই প্রশ্ন বা সমস্যাগুলো বিভিন্ন শ্রেণির। যেমন কোনো কিছু শেখা, মনে রাখা, চিনতে পারা, ভুল বার করা, তুলনা করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজ করার মধ্য দিয়ে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে হয়। যেহেতু বুদ্ধি বিনের মতে একটি সাধারণধর্মী শক্তি তাই তিনি অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও সমস্যা সংযোজন করেছিলেন ; কোনো বিশেষধর্মী মানসিক কাজের সংযোজন করেননি।

(৩) দৈর্ঘ্য মাপার সেন্টিমিটারের স্কেল, ওজনের যন্ত্র ইত্যাদির মত বিনে অভীক্ষাটিও একটি স্কেল। এখানে পরিমাপের একক হল অভীক্ষাটির বয়স। অভীক্ষার বয়ঃক্রম অনুসারে এককগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। বয়ঃক্রম অনুসারে এককের বিভাগ বিদ্যমান বলে স্কেলটিকে বয়সভিত্তিক স্কেলও বলা যায়। এই স্কেলটির নব সংস্করণে

সবচেয়ে নীচের একক শুরু হয়েছে, দু'বছর বয়স থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছ'মাস এবং পরে এক বছর করে বেড়ে সবচেয়ে উপরের একক ১৪ বছর পেরিয়ে তিনটি উন্নত-বয়স্ক পর্যায়ের অভীক্ষায় শেষ হয়েছে।

(৪) বিনের অভীক্ষাটিতে প্রশ্নগুলি ক্রমবর্ধমান কাঠিন্য অনুযায়ী সাজানো। অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নটির চেয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত কঠিন, দ্বিতীয়টির চেয়ে তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত কঠিন এইভাবে সাজানো। স্বভাবতই সবচেয়ে শেষের প্রশ্নটি সবচেয়ে কঠিন।

(৫) বিনের স্কেলের সাহায্যে মানসিক বয়স (Mental Age) নির্ণয় করা হয়। যদি কোনো ছেলে বা মেয়ে আট বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির সবকটারই সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয় তা হলে তার মানসিক বয়স আট, প্রকৃত বয়স (Chronological Age) যাই হোক না কেন। অর্থাৎ ছেলে বা মেয়েটির প্রকৃত বয়স ছয় হলেও তার মানসিক বয়স আট আবার তার প্রকৃত বয়স বারো হলেও তার মানসিক বয়স আট। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ছেলে বা মেয়েটির বয়স ছয় তার মানসিক বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ছেলে বা মেয়েটির বয়স বারো তার মানসিক বয়স অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়েটির বুদ্ধি তার প্রকৃত বয়সের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়েটির বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। কোনো ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কত কম বা কত বেশি তা নির্ণয়ের জন্য বিনের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির সূচক হিসেবে বুদ্ধ্যঙ্কের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। বুদ্ধ্যঙ্ক হল মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়ে ভাগ করে এই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করা। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্ক $= \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times \text{১০০}$। যে ছেলের প্রকৃত বয়স ছয় কিন্তু মানসিক বয়স আট তার বুদ্ধ্যঙ্ক $= \frac{\text{৮}}{\text{৬}} = \text{১০০} = \text{১৩৩}$ (আসন্ন মান) এবং যে ছেলের প্রকৃত বয়স বারো কিন্তু মানসিক বয়স আট তার বুদ্ধ্যঙ্ক $\frac{\text{৮}}{\text{১২}} = \text{১০০} = \text{৬৭}$ (আসন্ন মান)।

যে ছেলে বা মেয়ের প্রকৃত বয়স আট এবং মানসিক বয়সও আট তার বুদ্ধ্যঙ্ক $\frac{\text{৮}}{\text{৮}} \times \text{১০০} = \text{১০০}$।

১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক স্বাভাবিক বুদ্ধির সূচক। ১০০-এর বেশি বুদ্ধ্যঙ্ক (যেমন উদাহরণে প্রথম ক্ষেত্রে) অধিকাংশ ব্যক্তির গড় বুদ্ধির চেয়ে অধিক বুদ্ধির সূচক এবং ১০০ এর কম বুদ্ধ্যঙ্ক (যেমন উদাহরণে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) অধিকাংশ ব্যক্তির গড় বুদ্ধির চেয়ে অল্প বুদ্ধির সূচক।

(৬) বুদ্ধির অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হবে যা সমাধান করতে কোনো বিদ্যালয় নির্ভর অর্জিত জ্ঞানের দরকার পড়বে না। কারণ বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক, কোনো অর্জিত শক্তি নয়। অর্থাৎ এমন কোনো প্রশ্ন অভীক্ষাটিতে সন্নিবেশিত করা চলবে না যার উত্তর দিতে গেলে প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু একথা তাত্ত্বিকভাবে বললেও বাস্তবে এমন কোনো প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব নয় যা অর্জিত জ্ঞান নিরপেক্ষ। অর্থাৎ প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই কিছু না কিছু অর্জিত জ্ঞানের দরকার হয়ে পড়ে।

(৭) প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধির এই অভীক্ষাটি দিয়ে আমরা মানুষের সুপ্ত বুদ্ধি পরিমাপ করতে পারি না শুধু বুদ্ধির অভিব্যক্তি বা প্রকাশটিকে পরিমাপ করতে পারি।

৬.৫.১ বুদ্ধি অভীক্ষার পদের প্রকারভেদ (Types of Items in Intelligence Test) :

বিনে স্কেলে এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় বহু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কিছু প্রশ্ন বা সমস্যার উল্লেখ নীচে করা হল।

(ক) বস্তু, ছবি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদির নাম বলা (Concept naming)

যেমন : হয়তো একটি ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হলো বলতো, 'এইটে কীসের ছবি ?'

(খ) স্মৃতি (Memory)

যেমন : একটা বাক্য বা গল্প শোনানোর পর অভীক্ষাটিকে হয়তো সেটা বলতে বলা হল।

(গ) সংখ্যা গণনা :

যেমন : ৫—৯—৭—৪ এই সংখ্যার সারিটি অভীক্ষাটিকে শোনানোর পর তাকে এটি বলতে বলা হল।

(ঘ) দু'টো বস্তু বা ধারণার মধ্যে তুলনা

যেমন : যেমন ক্রিকেট বল ও আলুর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বলতে বলা হল। কিংবা সততা ও সৌন্দর্য্য এ দুটো ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে বলা হল।

(ঙ) সংবোধন (Comprehension)

যেমন (১) আমরা ক্ষুধার্ত হলে কী করতে বাধ্য হই ?

(২) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলে রাস্তায় দেখলে তুমি কী করবে ?

বস্তু গণনা (Object Counting)

কতকগুলো বস্তু অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে সেগুলো গুণতে বলা হয়।

(ছ) শব্দ-সম্ভার পরীক্ষা—বিপরীতার্থক ও সমার্থক ইত্যাদি (Vocabulory Test—Antonyms and Synonyms)

যেমন : (১) কমলালেবু কী অথবা কাকে বলে ?

(২) 'রোগ' শব্দটির অর্থ প্রকাশক একটি শব্দ বলো (সমার্থক শব্দ)।

(৩) 'সাহসী' শব্দটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে এমন একটি শব্দ বলো (বিপরীতার্থক শব্দ)।

(৪) ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্কলঙ্ক শব্দগুলোর অর্থ বলো (অমূর্ত শব্দ)।

(জ) অসম্ভবতা নির্ণয় (Absurdity)

যেমন : (১) দু'টো হাত পিছন দিকে বাঁধা এবং তার পা দুটো বাঁধা অবস্থায় একটি ছেলেকে বন্ধ একটি ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকেরা ভেবে নিল ছেলেটি নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল— এই উক্তিটির মধ্যে এমন কী আছে যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়।

(২) একটা অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বলা হল এর মধ্যে ভুল কোথায় আছে তা বার করো।

(ঝ) উপমান (Analogy) :

যেমন : (১) 'পাখি ওড়ে, মাছ—' (উঃ সাঁতার কাটে)

(২) 'সূর্য দেয় উত্তাপ, ফুল দেয়——'।

(৩) 'ঋণ হল দায়, আয় হল——'।

(৪) ৯'র সঙ্গো ৬'র যা সম্পর্ক, ন'র সঙ্গো কার সে সম্পর্ক ?

(ঞ) বিচারকরণ (Reasoning)

যেমন : (১) একটা কাগজকে দুবার ভাজ করা হল এবং তার পর তার একটা কোণে একটা ফুটো করা হল। এরপর প্রশ্ন করা হল, কাগজটার ভাজ খুললে পরে ক'টা ফুটো দেখা যাবে ?

(২) প্রশ্ন করা হল, লোকে চশমা কেন পরে ?— সুন্দর দেখাবে বলে, কিংবা চোখ খারাপ বলে বা ফ্যাসনের জন্য।

(ট) শ্রেণিবিন্যাস (Classification)

যেমন : (১) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারি—এই চারখানা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টি আলাদা শ্রেণির ?

(২) বেড়ানো, ওড়া, সাঁতার কাটা, খেলা-পড়া করা—এই চারটি কাজের মধ্যে কোন্ কাজটি আলাদা শ্রেণির ?

(ঠ) সংখ্যা সারি Number Series)

যেমন : শূন্যস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও—

(১)	১	৩	৫	৭	৯	১১	—	—
(২)	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	—	—
(৩)	৯	১২	১০	১৩	১১	১৪	—	—
(৪)	১	৪	৯	১৬	২৫	৩৬	—	—

(ড) বিচ্ছিন্ন বাক্য (Scrambled Sentence)

যেমন : নীচে শব্দগুলোকে এমনভাবে সাজাও যেন একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি হয়।

(১) খুব যাত্রা উদ্দেশ্যে করলাম গ্রামে ভোরে সুরু।

(২) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে।

সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

যেমন : একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক এক লিটার জল নিয়ে আসতে। তকে মা দিলেন একটি ৩ লিটার এবং একটি ৮ লিটারের পাত্র ছেলেটি কীভাবে ঠিক এক লিটার জল আনবে তা বলে দাও। মনে রাখবে ১ লিটারের বেশি বা কম জল আনা চলবে না।

(ণ) প্রবাদ (Proverb)

যেমন : নীচের প্রবাদগুলোর অর্থ কী তা বল—

(১) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

(২) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(৩) উলু বনে মুক্তো ছড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

(৪) দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

(৩) প্রয়োগমূলক সমস্যা (Practical Problems) :

যেমন : (১) ফর্ম বোর্ড। একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের কয়েকটি গর্ত কাটা থাকে এবং ঐ গর্তগুলোর মাপে কতকগুলো কাঠের টুকরো অভীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় এবং ঐ কাঠের গর্তগুলোতে বসাতে বলা হয়।

(২) বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির পুঁতি দিয়ে প্রদত্ত কোনো নকসা অনুযায়ী মালা গাঁথার দরকার হয়।

(৩) একটি আয়তক্ষেত্র বা রম্বসের ছবিকে দু'টুকরো করে বা তিন টুকরো করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং তাকে টুকরোগুলো ঠিক মত সাজিয়ে এবং জুড়ে পূর্বের নকসাটির অবিকল নকসা বানাতে বলা হয়।

(৪) গোলকধাঁধায় ঠিক পথটি বার করতে বলা হয়।

(৫) এ ছাড়াও আঁকা, লাইন টানা ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যাসংক্রান্ত কাজ দেওয়া হয়।

৬.৫.২ বিনে স্কেলের সংস্করণ (Revisions of Binet Scale)

বিনের বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রথমবারের মতো প্রস্তুত হয় ১৯০০ সালে। তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯, ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পর পর তিনবার সংস্কার সাধন করেন। বিনের মূল অভীক্ষাটি ছিল ফরাসি ভাষায়। কিন্তু এটি বুদ্ধির মাপার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়।

ইংরাজি ভাষায় অনুদিত ও অভিযোজিত টারম্যানের সংস্করণটি বিখ্যাত। টারম্যান ছিলেন আমেরিকার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। টারম্যান বিনে স্কেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের সহযোগিতায় টারম্যান মেরিল স্কেল নামে আরেকটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় টারম্যান-মেরিল-এর নবতম সংস্করণ। টারম্যান-মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গডার্ড, বার্ট প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনে স্কেলের ইংরাজি সংস্করণ প্রচলিত আছে।

৬.৫.৩ স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল (Stanford of Binet Scale)

বিনের ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষাটিকে অবলম্বন করে টারম্যান ও মেরিল যে অভীক্ষাগুলি তৈরি করেন সেগুলো স্ট্যানফোর্ড রিভিসন অফ বিনে স্কেল বা সংক্ষেপে স্ট্যানফোর্ড বিনে স্কেল নামে পরিচিত। বিনে-সাইমন স্কেলটি শুরু হয়েছিল সর্বনিম্ন ৩ বছর বয়স থেকে এবং শেষ হয়েছিল সর্বোচ্চ ১৫ বছর বয়সে। টারম্যান মেরিলের সর্বশেষ সংস্করণের স্কেলটির শুরু সর্বনিম্ন ২ বছর বয়স থেকে এবং শেষ হয়েছে 'উন্নত বয়স্ক' (৩)-এ। বিনের মূল স্কেলে প্রশ্ন সংখ্যা ছিল মোট ৪৫টি, টারম্যানের প্রথম স্ট্যানফোর্ড সংস্করণে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৯০-তে এবং ১৯৩৭ সালের সংস্করণে প্রশ্ন সংখ্যা বেড়ে হয় ১২৯টি।

এই প্রশ্নগুলোর শ্রেণিকরণ নিম্নরূপ :

২, ২ $\frac{১}{২}$, ৩, ৩ $\frac{১}{২}$, ৪, ৪ $\frac{১}{২}$, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪-এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন = ১৬×৬=৯৬টি প্রশ্ন

সাধারণ বয়স্ক স্তরের জন্য .... ৮টি প্রশ্ন উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩)

এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন = ৩×৬......১৮টি প্রশ্ন।

প্রথম সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে প্রশ্ন = ... ৭টি প্রশ্ন।

মোট : ১২৯টি প্রশ্ন।

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা—

অভীক্ষার্থীর প্রকৃত বয়সের (Chronological Age) ২ বছর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ শুরু করতে হয় এবং পর্যবেক্ষণ করতে হয় যে স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সবকটা প্রশ্নের উত্তর নির্ভুলভাবে দিতে পেরেছে। এই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর মৌলিক মানসিক বয়স (Basal Mental Age) হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পর এই মৌলিক বয়সের ওপর কয়েক বছরের প্রশ্নগুলো অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হয় কোন্ বয়সের কটি প্রশ্নের সে নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছে। যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত অভীক্ষাটি তার ওপর চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারলে অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স পাওনা হয়। এই মানসিক বয়স গণনা করা হয় 'মাসের' হিসাবে। স্কেলের প্রথম ৬ বৎসর অর্থাৎ ২ থেকে ৪ $\frac{১}{২}$ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে। ১টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ১ মাস, দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ২ মাস ইত্যাদি। তেমনি ৫ বছর থেকে সাধারণ বয়স্ক (Average Adult) স্তরের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানসিক বয়স এবং উন্নত বয়স্ক (১) (Superior Adult-I) স্তরের প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ৪ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) (Superior Adult-II) স্তরের প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ৫ মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) (Superior Adult-III) স্তরের প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ৬ মাস করে।

ধরা যাক একটি ছেলে (প্রকৃত বয়স ৪ বৎসর) ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব প্রশ্ন পারলো। তারপর সে পারলো ৪ $\frac{১}{২}$ বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বৎসরের ৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্ন। তার মৌলিক মানসিক বয়স হলো ৪ বৎসর। পরবর্তী বৎসরগুলোর জন্য তার অর্জিত মানসিক বয়স হল (৪×১) + (৩×২) + (২ × ২) + (১ × ২) = ১৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর + ১ বৎসর ৪ মাস = ৫ বৎসর ৪ মাস। যেহেতু ছেলেটির প্রকৃত বয়স ৪ বৎসর, তাই তার বুদ্ধ্যঙ্ক—

$$= \frac{\text{মানসিক বয়স (MA)}}{\text{প্রকৃত বয়স (CA)}} \times ১০০$$

$$= \frac{\text{৫ বৎসর ৪ মাস}}{\text{৪ বৎসর}} \times ১০০$$

$$= \frac{\text{৬৪ মাস}}{\text{৪৮ মাস}} \times ১০০$$

$$= \text{১৩৩ (আসন্ন মান)}$$

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা (Calculation of Adult I-Q)—

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক পরিগণনা করার নিয়ম একটু আলাদা প্রকৃতির। দেখা গেছে ১৫ বছর বয়সের পর বুদ্ধির আর উন্নতি হয় না। এই কারণে মনোবিজ্ঞানীরা ১৫ বছর বয়সকেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। তাই কোনো বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করার সময় ১৫ বৎসরকে সর্বোচ্চ প্রকৃত বয়স (CA) হিসেবে গণ্য করা

হয়, তার সত্যিকারের বয়স যাই হোক না কেন। যেমন তার সত্যিকারের বয়স ২৫ হলেও প্রকৃত বয়স (Chronological Age) ১৫ বৎসরই ধরা হবে।

স্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ৯ মাস এবং সে হিসেবে সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক ১৫২।

৬.৫.৪ বুদ্ধি অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Intelligence Tests) :

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক (Verbal) এবং ভাষাবর্জিত (Non-verbal)—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয়ত সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে ব্যক্তিগত (Individual) ও যৌথ (group)—এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ভাষামূলক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অভীক্ষা (Verbal and Nonverbal Tests) ভাষামূলক অভীক্ষাগুলোর মূল উপাদান শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য। অভীক্ষার্থী লিখিত ও মৌখিক ভাষার সাহায্যেই প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করে থাকে। প্রশ্নগুলোর মধ্যেই ভাষার পারদর্শিতার অনেক লক্ষণ বর্তমান। শব্দ বা বাক্যের অর্থোপলব্ধি, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখের দাবি রাখে। বিনে সাইমন স্কেলটি ভাষামূলক ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনই আর্মি আলফা (Army Alpha) ভাষামূলক যৌথ অভীক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ভাষাবিহীন (Non-verbal) বুদ্ধির অভীক্ষাগুলোতে লেখ্য বা মৌখিক ভাষার ব্যবহার যতটা সম্ভব বর্জন করা হয়। বুদ্ধির পরিমাপ করতে গিয়ে যারা নিরক্ষর, শিশু কিংবা বিদেশি তাদের ক্ষেত্রে ভাষাবিহীন অভীক্ষারই প্রয়োগ করতে হয়। ক্যাটেলের কালচার ফেয়ার অভীক্ষা (Cattell's Culture Fair Test) একটি ভাষাবর্জিত যৌথ অভীক্ষার উদাহরণ।

৬.৫.৫ সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test) :

ভাষাবিহীন অভীক্ষার প্রথম সারিতে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা। এগুলিতে নানা আকার ও রঙের কাঠের বা প্লাস্টিকের সাহায্যে প্রদত্ত কোনো বিশেষ নকসা অনুকরণে একটি নকসা তৈরি করার প্রয়োজন হয় বা কোনো সমস্যার সমাধান করার দরকার হয়। দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে এই অভীক্ষাগুলোর সমাধান করতে হয় বলেই এগুলোর নাম সম্পাদনী অভীক্ষা।

বহুল প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে রয়েছে আলেকজান্ডার প্যাস-এ্যালংগ (Alexander's Pass-Along), কোহ'র ব্লক ডিজাইন (Koh's Block Design), ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড (Dearborn's Form Board), পোর্টিয়াস গোলকধাঁধা (Portens Maze), হিলির পাজল (Healey's Puzzle) ইত্যাদির নাম করা যায়। কোনো কোনো বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাষামূলক ও ভাষাবর্জিত দু'রকম সমস্যারই ব্যবস্থা আছে। ওয়েক্সলার প্রাপ্তবয়স্ক ইনটেলিজেন্স স্কেল (Wechster Adult Intelligence Scale or WAIS) এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা।

আর একটি ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা হ'ল গুড এনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষা (Goodenough's Draw-a-Man Test)। এতে অভীক্ষার্থীকে না দেখে একটি মানুষের ছবি আঁকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ৪ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষারূপে গুড এনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষাটি মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা (Individual Test and Group Test)—

ব্যক্তিগত অভীক্ষা এক সময়ে শুধু একজন অভীক্ষার্থীদের ওপরই প্রয়োগ করা যায়। বিনে সাইমন স্কেলটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা।

যৌথ অভীক্ষা একসঙ্গো বহু অভীক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করা যায়। সাধারণত ছাপা ছোটো পুস্তিকার আকারে অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। প্রশ্নের উত্তর পুস্তিকাটিতে লিখে দিতে হয়। উত্তর দেওয়ার কাজটিও আজকাল বেশ সরলীকরণ করা হয়েছে। টিক্ চিহ্ন, নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রশচিহ্ন দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষায় কতকগুলো বিশেষ সুবিধা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এর প্রয়োগে সময় ও পরিশ্রম বাঁচে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অভীক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভীক্ষক ছাড়া অভীক্ষাটির প্রয়োগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশদান সহজ এবং সুনির্দিষ্ট। ফলে এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষদের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু নির্ভরশীলতার (Reliability) দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক বেশি। যেহেতু আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময় সংক্ষেপের দাম অনেক ফলে গত কয়েক দশকের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে।

৬.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বুদ্ধি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২। বুদ্ধির সংজ্ঞা দিন।

৩। g-উপাদান ও s-উপাদান বলতে কী বোঝেন?

৪। সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বলতে কী বোঝেন?

৫। বুদ্ধির সাতটি মৌলিক উপাদান কী কী?? কে এই কথা বলেছেন?

৬। বুদ্ধি পরিমাপ কি সম্ভবপর? যুক্তি দিয়ে বলুন।

৭। মানসিক বয়স কাকে বলে?

৮। কয়েকটি অতি প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষার নাম বলুন।

৯। সম্পাদনী অভীক্ষা কী?

১০। ব্যক্তিগত ও যৌথ অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। বুদ্ধির সংজ্ঞা কী? স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব আলেচনা করুন।

২। মৌলিক মানসিক শক্তি কী? এই সম্বন্ধে থার্সটোনের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৩। গিলফোর্ডের ধী-শক্তির তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিন।

৪। স্টার্নবার্গের তত্ত্ব কীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

৫। বুদ্ধি অভীক্ষার পদের প্রকারভেদের বর্ণনা দিন।

সৃষ্টি করে যা পরবর্তীকালে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা প্রতক্ষ্যভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠক্রমের অবাঞ্ছিত চাপ, ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির দরুণ চাপ, অসংগত শাস্তিবিধানের প্রবণতা বা বিদ্যালয়ের নিয়মকানুনের অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা, অর্থাৎ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা এসবই মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। বলা বাহুল্য সমস্ত কারণ সকল শিক্ষার্থীর বেলায় সমানভাবে কার্যকর নয়। একাধিক কারণ পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের চূড়ান্তরূপটি ঠিক করে দেয়।

৯.৫.৩.৫. মানসিক কারণ (Psychological Causes) :

মানসিক কারণ প্রধানত দুটি তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। মনঃসমীক্ষণী মত অনুযায়ী, লিবিডো বিকাশের কোনো স্তরে সংবন্ধন (Fixation) ঘটলে, অহং দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তারপক্ষে অদস, অধিশাস্তা ও বাস্তবের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় অহং লিবিডো বিকাশের পূর্ববর্তী কোনো স্তরে ফিরে যেতে চায়, একে বলা হয় প্রত্যাবৃত্তি (Regression)। এই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়।

অপর তত্ত্বটি হল আচরণবাদী মত। স্কিনারের আচরণবাদী মত অনুযায়ী যখন শৈশবে কোনো ত্রুটিপূর্ণ আচরণ উপযুক্ত প্রবলকের সাহায্যে স্থায়ী আচরণে পরিণত হয়, তখন ঐ ত্রুটিপূর্ণ আচরণটি সামান্যীকরণের (generalisation) মাধ্যমে অবাঞ্ছিত আচরণ হিসেবে দেখা দেয়। একেই আমরা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা বা অসুস্থতা বলি।

৯.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝেন ?

২। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কী ধারণা পোষণ করেন ?

৩। প্রতিরক্ষা কৌশল কী ?

৪। লিবিডো বিকাশ বলতে কী বোঝেন ?

৫। ইডিপাস স্তর কী ?

৬। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বলতে কী বোঝেন ?

৭। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় ?

৮। মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্‌বেগ, প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা কী ? ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। ব্যক্তিত্বের মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব নিয়ে একটি রচনা তৈরি করুন।

৩। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংলক্ষণবাদী তত্ত্বগুলির সঠিক ছবি তুলে ধরুন।

৪। ব্যক্তিত্বের সামাজিক শিখন তত্ত্বর ব্যাখ্যা করুন।

৫। মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন। মানসিক সুস্থতার সাধারণ লক্ষণগুলি সহজ ভাষায় লিখুন।

৬। মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি আলোচনা করুন।

নিরাপত্তা (Security), একাত্মতা (Belongingness) ইত্যাদি সংক্রান্ত চাহিদাগুলি যথাযথ পূরণ না হওয়ার দরুণ আত্মসম্মানের চাহিদা অপূর্ণ থাকে তবে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। নেতিবাচক আত্মপ্রকৃতির দরুণ হীনমন্যতাবোধ ও মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। নিরাপত্তার চাহিদা ও একাত্মতার চাহিদা পূরণ না হলে উদ্‌বেগ প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে।

বঞ্চনা (Deprivation)—ছোটোবেলায় যদি শিশু মনে করে সে অবাঞ্ছিত, যদি স্নেহ বঞ্চিত হয়, যদি বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে অবিচার ও অবহেলার শিকার হয় তবে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। এ ছাড়াও ছোটোবেলায় তীব্র মানসিক আঘাত (Childhood Trauma), যেমন, পিতামাতার বিচ্ছেদ, যৌন নিপীড়ণ, শারীরিক নিপীড়ণ ইত্যাদি, মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণ।

শিশু প্রতিপালন (Child Rearing)—বঞ্চনার পাশাপাশি প্রতিপালনজনিত কারণে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। যে সব পিতামাতার অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ বা অতিরিক্ত উদাসীন অর্থাৎ যাঁরা শিশুর সবকিছু নিজেদের মর্জিমাফিক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন বা অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় দেন,তাদের সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সন্তানের জন্য অবাস্তব লক্ষ্যস্থাপন শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি সংক্রান্ত ত্রুটি বা অস্পষ্টতা, সন্তানের সঙ্গো খোলখুলি আলোচনা না করা বা অযথা দূরত্ব বজায় রাখা বর্তমান যুগে অসংখ্য কিশোর কিশোরীর মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণ। বলা বাহুল্য, পারিবারিক পরিবেশ, ভাইবোনেদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা একাকিত্ব, পিতা বা মাতার মানসিক রোগ বা অসামাজিক কার্যকলাপ, নেশাগ্রস্ত অবস্থা ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সঙ্গো যুক্ত।

৯.৫.৩.৩. সামাজিক কারণ (Social Causes) :

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা (Economic and Political disturbance)—ক্রমাগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে তা শিশুদের মনে নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্‌বেগের জন্ম দেয়।

অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ (Pathogenic Social Environment)—কিছু কিছু সামাজিক পরিবেশ মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার অনুকূল। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য, অশালীন পরিবেশ, অর্থনৈতিক কারণে স্বল্প বসবাসের স্থানে ছোটোদের ও বড়োদের খুব কাছাকাছি সহাবস্থান, গণমাধ্যমের প্রভাব (চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি) ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ব্যাহত করে।

এছাড়াও, কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য, প্রভৃতি বিষয়গুলিও পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গো সংশ্লিষ্ট।

৯.৫.৩.৪. বিদ্যালয়ঘটিত কারণ (Causes related to School) :

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় একটি সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিভূ। সে হিসেবে সামাজিক কারণ ও বিদ্যালয়ঘটিত কারণের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। আবার শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই কিছু কিছু মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ঘটিত কারণগুলি আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই জন্য যে এখনকার শিশুরা অনেক ছোটোবেলায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং বিদ্যালয় তাদের মানসিক স্বাস্থ্যগঠনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে।

বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ যদি আনন্দদায়ক হয়, চাপমুক্ত অবস্থায় শিশুরা যদি বিদ্যালয়ের সঙ্গো অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পারে তবে তা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক হয়। বিপরীতক্রমে, বিদ্যালয়ের ভীতিজনক পরিবেশ, শিক্ষক শিক্ষিকাদের হৃদয়হীন আচরণ ও অতিরিক্ত চাপ মানসিকস্বাস্থ্য বিঘ্নিত করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করা হয়। কিন্তু, তাদের অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, অনৈতিক আচরণ, নির্দেশদানের অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্য শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার বোধ

মনঃসমীক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লিবিডোর বিকাশ ও নির্জ্ঞান প্রেষণা থেকেই সমস্ত মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি। বর্তমানে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Interpersonal relation) ও মনঃসমীক্ষণী তত্ত্বের সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কার্যকর ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরা দিতে পেরেছেন।

আচরণবাদীরা মানসিক স্বাস্থ্যকে শিখনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেন। মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণ নির্ণয় ও তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও প্রজ্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগ ও তার কারণ সম্বন্ধে নিরন্তর গবেষণা চললেও সবকিছুর ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। শুধু এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে-কোনো একটি তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। বরং একাধিক তত্ত্বের সমন্বয় মানসিক অসুস্থতার কারণ ও তার চিকিৎসায় অধিক ফলপ্রসূ। বিষয়টি নিয়ে আরও একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার চারপ্রকার কারণ (Four types causes of mental ill health)—মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলি চারটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথম স্তর হল, প্রাথমিক কারণ (Primary Cause)। প্রাথমিক কারণ স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে কিন্তু, প্রাথমিক কারণ থাকলেই রোগ হবে তার কোনো অর্থ নেই। জীবাণু সংক্রমণ হলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তার ফলে রোগ হবে কি না তা আরও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় স্তরে আছে, অনুকূল পরিস্থিতিজনিত কারণ বা সহায়ক কারণ (Predisposing cause)। সহায়ক কারণগুলি রোগসৃষ্টির পথ সুগম করে এবং প্রাথমিক কারণের পূর্বথেকেই বর্তমান থাকে। যেমন, মা-বাবার মধ্যে চূড়ান্ত মনোমালিন্য একটি সহায়ক কারণ যা শিশুকে উদ্বেগপ্রবণ করে তোলে। তৃতীয় স্তরের কারণ হল, উপস্থিত কারণ (Precipitating Cause)। এই কারণগুলি তাৎক্ষণিকভাবে রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে। পূর্বোক্ত উদাহরণে উল্লিখিত শিশু পরীক্ষার আগে মানসিকভাবে যদি ভেঙে পড়ে তবে পরীক্ষার ভয় হল উপস্থিত কারণ, মা-বাবার মনোমালিন্য হল সহায়ক কারণ আর প্রাথমিক কারণ হল উদ্‌বেগপ্রবণতা। সর্বশেষ স্তরে আছে প্রবলক কারণ (Reinforcing Cause)। যে তিনটি কারণের কথা বলা হয়েছে তার দরুণ যে অভিজ্ঞতা হল, যদি তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তবে স্বাস্থ্যহীনতার প্রবলন ঘটে। যেমন, পূর্বের ক্ষেত্রে বারবার পরীক্ষার ফল খারাপ হতে থাকলে পরীক্ষার সময় ভেঙে পড়াটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়।

সামগ্রিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার উল্লেখ করা হল—

৯.৫.৩.১. জৈবিক কারণ (Biological Causes) :

শারীরিক পীড়ন (Physical Stress)—অনাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দীর্ঘকালীন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, দীর্ঘ রোগভোগ ইত্যাদি, মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার সহায়ক কারণ হতে পারে।

জিনগত ত্রুটি ও অস্বাভাবিক ক্রোমজোম (Defeetive Gene and Abnormal Chromosome)—অনেক ক্ষেত্রে মিউটেশন (Mutation) বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটিপূর্ণ জিন অথবা কোশ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম সমন্বয়ের অস্বাভাবিকতাজনিত কারণে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা ঘটতে পারে। এগুলি প্রাথমিক কারণ হিসেবে বিবেচিত।

শারীরিক গঠন ও গঠনগত ত্রুটি (Physique and Physical handicap)—এই জাতীয় কারণও প্রাথমিক কারণের পর্যায়ভুক্ত।

৯.৫.৩.২. মনোসামাজিক কারণ (Pshycho-social Causes) :

আত্মপ্রতিকৃতি (Self image) ও আত্মসম্মান (Self esteem)— মনোসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করা হয়, ছোটোবেলা থেকে যদি ত্রুটিপূর্ণ নেতিবাচক আত্মপ্রতিকৃতি গঠিত হয় এবং শরীরবৃত্তীয় (Physiological),

বিপরীতক্রমে আমি ক্ষমতাবান, শ্রেষ্ঠ, সকলেরই উচিত আমাকে স্বীকৃতি দেওয়া, আমার কথা মেনে চলা ইত্যাদি জাতীয় মনোভাব হল শ্রেষ্ঠত্বের গুঢ়ৈষা (Superiority Complex)। ফলে এই সব ব্যক্তি সর্বদাই সব কিছু সম্মান অসম্মানের, স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। অনেক সময় নির্জ্ঞান স্তরে হীনমন্যতাবোধ থাকলে বাইরে শ্রেষ্ঠত্বের গুঢ়ৈষা হিসেবে তার প্রকাশ ঘটে।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও গুঢ়ৈষা মানুষের ব্যক্তিত্বের সংহতির পরিপন্থী। কারণ এগুলি মানুষের আচরণকে অন্যের চোখে অযৌক্তিক, অবাঞ্ছিত বা বিরক্তিকর প্রতিপন্ন করে। ফলে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা পোষণ করার দরুণ বহুক্ষেত্রেই তাদেরই সিদ্ধান্তগুলি অনুপযোগী ও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে গুঢ়ৈষার অনুপস্থিতি ও দ্বন্দ্বের সীমিত প্রকাশ দেখা যায় এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে সংহত বলে সকলেই বুঝতে পারে।

মানসিক রোগলক্ষণের অনুপস্থিতি (Absence of any psychological symptom)—অনেক মানুষের মধ্যেই সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কিছু কিছু মানসিক রোগলক্ষণ খুব মৃদু বা প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়। যদিও এই সব রোগলক্ষণের দরুণ মোটের ওপর তার দৈনন্দিন জীবন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তবুও ঐ সব লক্ষণের উপস্থিতি সময়বিশেষে তার আচরণকে অন্যের কাছে অস্বাভাবিক করে তোলে। খাদ্যগ্রহণে অনীহা (Anorexa) বা অনিয়ন্ত্রিত ভোজনপ্রিয়তা (Bulimia), নিদ্রাহীনতা (Insomnia) অস্বাভাবিক নিদ্রা (Narcolepsy), অনিয়মিত নিদ্রা (Sleep cycle disorder), অখাদ্যভোজন (Pica), অযৌক্তিক তীব্রভয় (Phobia), বাধ্যতামূলক চিন্তা ও কাজ (Obsession and Compulsion) অলীকবীক্ষণ ও ধারণা (Hallucination and Delusion), আবেগের অস্থিরতা (Mood alteration), আত্মমগ্নতা (With drawal) ইত্যাদি অসংখ্য লক্ষণ সামান্যভাবে প্রকাশ পেলেও বোঝা যায় ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে।

সামগ্রিক সক্রিয়তার স্তর (Global Functioning Level)—এই ধারণাটি সামগ্রিকভাবে একজন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক হিসেবে গঠিত হয়েছে। এর মূল কথা হল, একজন মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেই সব কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারছে তার পরিমাপ। বলা বাহুল্য, এই সূচকটি পরিমাপ নির্ভর হওয়াতে সঠিক অর্থে একে মানসিক স্বাস্থ্যের সাধারণ লক্ষণের মধ্যে গণ্য করা যায় না।

৯.৫.৩ মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণ (Causes of Ill Mental Health) :

প্রতিটি মানসিক অসুস্থতার কারণ ভিন্ন। সাধারণভাবে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকাটা শিক্ষাবিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আবশ্যিক—এমন কি শিক্ষক ও অভিভাবকদের পক্ষেও। আলোচ্য অংশটিতে এই বিষয়টিই উল্লেখ করা হল।

মানসিক রোগ হল মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার চূড়ান্ত পরিণতি বা অবস্থা। এই কারণে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগের কারণগুলি একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার জীববিজ্ঞানের কথা। জীববিজ্ঞানের প্রথমদিকে মনে করা হত মস্তিষ্কের আঘাত বা ত্রুটি অথবা স্নায়ুতন্ত্রের অস্বাভাবিক কার্যকলাপই হল মানসিক রোগ তথা স্বাস্থ্যহীনতার কারণ। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং বর্তমান গবেষকরা জৈবরসায়ন (Biochemistry) বিষয়ক গবেষণায় মানসিক অসুস্থতার কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ আবিষ্কার করেছেন। তবে এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাস হল বংশগতির (Heredity) মধ্যে মানসিক অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করা। এ বিষয়েও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও পরিচিত ব্যাখ্যা এসেছে ফ্রয়েড ও তার অনুগামীদের

মানুষের সুসম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। যে মানুষ নিজেকে অকারণে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান বলে দাবি করে এবং চারপাশের সব মানুষকে অকারণে নির্বোধ বলে মনে করে, তার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক পারস্পরিক মেলামেশা, আদানপ্রদান ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে ঐ সব সামাজিক আদানপ্রদান গুরুত্বহীন বলেই আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

ব্যক্তিত্বের সংহতি (Integration of Personality)— এইটিও ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ব্যক্তিত্বের সংহতি তিনটি বিষয় দিয়ে বিচার করা হয়।

(১) প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য (Emotional Balance)—প্রক্ষোভ বিকাশ স্বাভাবিক হলে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বয়সোচিত প্রাক্ষভিক আচরণ করে। অর্থাৎ প্রক্ষোভের কারণ (Stimulus, Cognitive process), প্রক্ষোভের অনুভব (Feeling, affective process) এবং প্রক্ষোভের আচরণগত প্রকাশ (Response, conative process) বয়স, অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ফলে, মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে আমরা বয়স অনুযায়ী সংগত (Consistent), উপযুক্ত (Adequate) এবং সমাজ অনুমোদিত (Sociacially acceptable) প্রাভোক্ষিক আচরণ প্রত্যাশা করি।

(২) উদ্‌বেগ (Anxiety) – পূর্বোক্ত শর্তগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্‌বেগ প্রবণতার প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ হল বিপুল সংখ্যক মানসিক স্বাস্থ্যহীন মানুষ অতিরিক্ত উদ্‌বেগ প্রবণতার শিকার। অকারণ উদ্‌বেগ, তুচ্ছ কারণে অতিরিক্ত উদ্‌বেগ, দীর্ঘস্থায়ী তীব্র উদ্‌বেগ ইত্যাদি উদ্‌বেগ প্রবণতার লক্ষণ। উদ্বেগপ্রবণতা ব্যক্তিত্বের সংহতি নষ্ট করে এবং মানুষের আচরণকে অস্বাভাবিক করে তোলে। বিপরীতক্রমে, যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও উদ্‌বেগহীনতা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। মনে রাখা দরকার উদ্‌বেগহীনতা কথাটির অর্থ সংযত উদ্‌বেগ নয়, অনুভবহীনতা।

(৩) মানসিক দ্বন্দ্ব ও গূঢ়ৈষা (Conflicts and complexes)—মানসিক দ্বন্দ্ব মানবজীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

আমরা প্রতিনিয়ত সচেতনভাবে এবং নির্জ্ঞান মনে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি, তা আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে (Decision making process) বিলম্বিত করে। অতিরিক্ত মানসিক দ্বন্দ্ব আমাদের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে দেয় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং দ্বন্দ্বজনিত মানসিক অস্থিরতা অন্যান্য কাজকেও বিঘ্নিত করে। মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের অহং (Ego) যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় তারা দ্বন্দ্ব অনুভব করলেও, তা কাটিয়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে, দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতেও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। কারণ এর ফলে নির্বিচারে মানুষ হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপদ ডেকে আনে। একটি মন্তব্য করব কি করব না, এই দ্বন্দ্ব মানুষকে বিচার ও যুক্তির ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু বিনা বিচারে হঠকারী মন্তব্য মানসিক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিরাই করে থাকেন।

গূঢ়ৈষা (Complex) এক ধরনের যুক্তিহীন স্থায়ী মানসিক অবস্থা (Mental set) যা চারপাশের মানুষ ও ঘটনাবলির বিচার একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে করতে বাধ্য করায়। অর্থাৎ গূঢ়ৈষা যেন এমন একটি পরিস্রাবক (Filter) যার মধ্যে দিয়ে সব ঘটনাই একই বর্ণযুক্ত মনে হয়। সবুজ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেমন সব কিছুই সবুজ দেখায় বা বিকৃত বর্ণের দেখায়, তেমনি কোনো বিশেষ গূঢ়ৈষাও মানুষকে একমুখী বিচারে বাধ্য করে। হীনমন্যতাবোধ (Inferiority Complex) একটি গূঢ়ৈষা যা থাকলে ব্যক্তি সবসময়ই মনে করে অন্য মানুষরা অবহেলা করছে বা ছোটো করার চেষ্টা করছে। ব্যক্তির আচরণের মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। সর্বত্র সংকুচিত হয়ে থাকা, নিজেকে গুটিয়ে রাখা, অপরাধবোধ, ইত্যাদির প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে হীনমন্যতা বোধেরই প্রকাশ।

সফল অভিযোজনের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মনে সুখানুভূতি, ভালো থাকার অনুভূতি, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ইত্যাদি বজায় থাকে। সুতরাং সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্য সমার্থক না হলেও, প্রথটিকে দ্বিতীয়টির প্রধানতম শর্ত বলা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্য কোনো চিরস্থায়ী অবস্থা নয়। যদি পরিবেশ এমনই প্রতিকূল হয়, যে ব্যক্তির অভিযোজন ক্ষমতার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তখন ব্যক্তি আর সংগতিবিধান করতে পারে না। ক্রমাগত এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকলে, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে। কখনও কখনও স্থায়ীভাবে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হলেও তা উপযুক্ত চিকিৎসায় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। যার সংগতিবিধানের ক্ষমতা যত বেশি তার মানসিক স্বাস্থ্যও তত বেশি অটুট। বিপরীতক্রমে যে ব্যক্তির সংগতিবিধানের ক্ষমতা কম, পরিবেশের অল্প প্রতিকূলতাও তার মানসিক স্বাস্থ্যের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং এক কথায় সংগতিবিধান ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিদ্যমান।

৯.৫.২. মানসিক সুস্থতার সাধারণ লক্ষণ (General Criteria of Mental Health)

মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার মত সুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে একটি মাত্র লক্ষণ দিয়ে মানবিক সুস্থতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। অনেকে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক এই মানদণ্ড দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যকে বিচার করার পক্ষপাতী। এই মতানুসারে, যে সব আচরণ স্বাভাবিক অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ যে ধরনের আচরণ করে, তাই হল গ্রহণযোগ্য সংগতিবিধান তথা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু এই মত অত্যন্ত সরল। উপরোক্ত অর্থে মানুষের স্বাভাবিক আচরণ সমগ্র মনুষ্য সমাজে এক রকম নয়। দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এমনই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যে এক দেশের স্বাভাবিক আচরণ অন্য দেশের অস্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ একদেশে যাকে সংগতিসম্পন্ন মানুষ বলা হচ্ছে, আর এক দেশে তিনি সংগতিবিহীন মানুষ হিসেবে গণ্য হবেন।

আচরণের ভিত্তিতে মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বিচার করার চেষ্টায় মনোবিজ্ঞানীরা বহুমুখী লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। লক্ষণগুলি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও অনেকটা গ্রহণযোগ্য।

নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা (Realistic concept of self)— মানসিক সুস্থ ব্যক্তি নিজের দোষগুণ, ক্ষমতা-দুর্বলতা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন থেকে, নিজের আত্মপ্রতিকৃতি (Self Image) এমনভাবে গঠন করেন, যা অনেকটা তার প্রকৃত স্বরূপের কাছাকাছি, কিন্তু ইতিবাচক। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজেকে অসাধারণ প্রতিভাধর ভাবলে, তার মানসিক স্বাস্থ্যের অভাবই সূচিত করে। আবার কোনো মানুষ নিজের দোষ দুর্বলতা ইত্যাদিকে বাড়িয়ে একজন দীনহীন ব্যক্তি হিসেবে মনে করাটাও স্বাভাবিক নয়।

পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারণা (Realistic concept of environment)—চারপাশের মানুষ, অন্যান্য জীব, ভৌত জগৎ ইত্যাদি যা যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন করাটাই সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বা আনন্দের পরিবেশকে সেই ভাবে প্রত্যক্ষণ করাটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়,বাস্তবসম্মত প্রত্যক্ষণ কথাটির প্রকৃত অর্থ হল, যে উদ্দীপকের ক্ষেত্রে যে রকম প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, ব্যক্তির মধ্যে সেই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার সময় খাদ্য পরিবেশন করা হলে, কোনো সংগত কারণ ছাড়াই তার মধ্যে ময়লা আছে বলে ক্রমাগত খাদ্য প্রত্যাখ্যান করে তবে খাদ্যের মধ্যে ময়লা প্রত্যক্ষণ করাটাকে বাস্তব বলা যাবে না বা ঐ ব্যক্তিকে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যাবে না।

আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক (Inter personal Relation) সামাজিক মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রধান ভিত্তি হল সমাজের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গো সুসম্পর্ক বা খুব খারাপ হলে নিরপেক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখা। নিজের সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা পোষণ করলে বা পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষণ অবাস্তব হলে, পরিণতিতে মানুষের সঙ্গো

৯.৫ মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা (Concept of Mental Health))

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ‘স্বাস্থ্য’ কথাটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গো বলেছেন, স্বাস্থ্য একটি পরিপূর্ণ ইতিবাচক ধারণা, পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক ভালো থাকার অনুভূতি, শুধুমাত্র রোগ বা ব্যধির অনুপস্থিতি নয় (Health is a complete positive concept, a complete state of physical and mental wellbeing and not merely the absence of any disease or disorder)।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দু'টি স্বতন্ত্র বিষয় নয়। স্বাস্থ্য একটি পূর্ণাঙ্গা ধারণা, শরীর ও মনের সুস্থতার সম্মিলিত অবস্থা। তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে অনেক সময় স্বতন্ত্রভাবে চর্চা করা হয়। এর জন্য নির্ভর করতে হয় অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology) ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology) নামক মনোবিজ্ঞানের দুটি পরস্পর সম্পর্কিত শাখার ওপর।

মানসিক স্বাস্থ্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়। একটি সংজ্ঞা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতানুসারে মানসিক স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত সুস্থতাবোধ, ভালো থাকার অনুভূতিকে মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এদের মতে, যিনি আন্তরিকভাবে অনুভব করেন যে—আমি ভালো আছি, তিনিই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষ।

আমেরিকান মনোচিকিৎসা সমিতি (American Psychiatric Association) মানসিক রোগের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে পাঁচটি অক্ষ (মাত্রা) বিশিষ্ট যে নিদান ও পরিসংখ্যান নির্দেশিকা (Diagnostic and Statistical Mannual) প্রকাশ করেন, তার সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণে (DSM–III R) পঞ্চম অক্ষটিতে (Axis-V) মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপের একটি নির্দেশিকা স্থির করে দিয়েছেন। একে বলা হয় সামগ্রিক সক্রিয়তার পরিমাপ (Global Assessment of Functioning)। উক্ত পরিমাপ পদ্ধতিতে মানসিক স্বাস্থ্য কথাটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার না করলেও, চূড়ান্ত মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামাজিক, বৃত্তিমূলক ও মানসিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ও রোগলক্ষণ না থাকাই চূড়ান্ত সুস্থতার লক্ষণ।

মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রচলিত অর্থে ব্যক্তির সংগতিবিধান ক্ষমতার (Adjustment) সাহায্যেও সংজ্ঞায়িত করার পক্ষপাতী অনেকে। সংগতিবিধান করার ক্ষমতা বা সংগতিবিধানের মাত্রা (Degree of adjustment) কে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্যের সমার্থক বলে মনে করেন। সেজন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতি বিধানের প্রসঙ্গাটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৯.৫.১ মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতিবিধান (Mental Health and Adjustment)

সংগতিবিধান নামক প্রক্রিয়াকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। প্রথম দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সংগতিবিধান (Adjustment) ও অভিযোজন (Adaptation) সমার্থক। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, পরিবেশের দাবি অনুযায়ী নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিবর্তিত করে নিয়ে বেঁচে থাকার দক্ষতাই হল সংগতিবিধান। বলা বাহুল্য সংগতিবিধানের এই ধারণা ডারউইন প্রভাবিত।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংগতিবিধানকে বলা হয় ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংহতি বা ব্যক্তিত্বের সংহতি (Integration)। মানুষের যে সমস্ত মানসিক উপাদানগুলি তাকে সামাজিক বৃত্তিমূলক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের দক্ষতা যোগায়, তাদের পারস্পরিক সংহতিই হল সংগতিবিধানের মূল কথা। সংগতিবিধানের এই ধারণা শরীরবৃত্তীয় সুস্থিতির (Physiological Homeostasis) অনুরূপ। অর্থাৎ মানসিক উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য ও সুস্থিতি বজায় রাখাই হল সংগতিবিধানের উদ্দেশ্য।

মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন, একথা পরিষ্কার যে সামাজিক,বৃত্তিমূলক ও জৈবিক পরিবেশের সঙ্গো সুষ্ঠু অভিযোজন তখনই সম্ভব যখন, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংহতি ও সুস্থিতি বজায় আছে। আবার

আয়ত্ব করেছি তারই সমাহার। কিন্তু কীভাবে এই আচরণ মানুষ আয়ত্ত করে ? তিনি বলেছেন, সামাজিক প্রজ্ঞানমূলক শিখনের (Social Cognifive Learning) ফলে সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি আমাদের আয়ত্ব হয়।

তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বে সামাজিক কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে কারণ, ছোটোবেলা থেকে আমরা কোনো আদর্শকে (Model) সামনে রেখে তার সঙ্গো একাত্মতার মাধ্যমে বাঞ্ছিত আচরণগুলি আয়ত্ত করি। পিতা, মাতা, পরিবারের অন্য ব্যক্তি, শিক্ষক বা অন্য কোনো আদর্শ এক এক সময় এক এক আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। বাবার চলনভঙ্গি, শিক্ষকের বাচনভঙ্গি, মায়ের অকারণ উদ্বেগ প্রবণতা, এইভাবেই আয়ত্ত হতে পারে। আবার একে প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) বলা হয়েছে কারণ, আদর্শকে লক্ষ্য করে আমরা যে তথ্য (Information) পাই তাকে আমরা সরাসরি অনুকরণ করি না। প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যে আচরণ ব্যক্তি স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করে, তা তার নিজস্ব স্বতন্ত্র আচরণ।

বান্দুরার মতে আদর্শ অনুসরণ প্রক্রিয়াটি (Moedling) কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমে, মনোযোগ প্রদান, তারপর স্মৃতিতে সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষ অনুকরণ এবং সবশেষে প্রেষণার পরিবর্তন এই চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে নতুন আচরণ আয়ত্ত হয়ে থাকে। নতুন আচরণ আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন আত্মকার্যকারিতার (Self Efficacy) বিকাশ। এই কথাটির অর্থ হল নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে উপযুক্ত বিশ্বাস বা আস্থা তৈরি হওয়া। যদি আদর্শ কোনো আচরণ ব্যক্তির মনে এই আস্থা তৈরি করতে না পারে তবে সেই আদর্শ শিখনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। সম্প্রতি বান্দুরা বলেছেন চারটি শর্ত পূরণ হলে তবেই আত্মকার্যকারিতার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথম, পুনরানুষ্ঠানের দক্ষতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা (Enactive mastery experience) অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে আচরণটির সঙ্গো যুক্ত তথ্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তাকে নিজে করার অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয়, অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Vicarious experience), অর্থাৎ অন্যদেরও অনুরূপ আচরণ করতে দেখার অভিজ্ঞতা।

তৃতীয়, বাচনিক নির্দেশদান (Verbal persuasion) অর্থাৎ অনেক সময় আদর্শ (Model) কোনো আচরণ অনুষ্ঠান করতে নির্দেশ দিতে পারেন। যেমন, নিজে প্রণাম করে মা ছেকে প্রণাম করতে বললেন।

চতুর্থ, শরীরবৃত্তীয় এবং ভাবমূলক অবস্থা (Physiological and affective stage)। যখন কোনো আদর্শ অনুকরণ করা শারীরিকভাবে কষ্টকর বা ভীতিপ্রদ তখন অনুকরণ ব্যহত হয়। বিপরীত ক্রমে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দদায়ক অনুকরণ স্থায়ী হয়। এখনে স্কিনারের প্রচলন (Re in forcement) তত্ত্বেরই প্রয়োগ ঘটেছে।

সংক্ষেপে বান্দুরার তত্ত্বটি নিম্নরূপ :

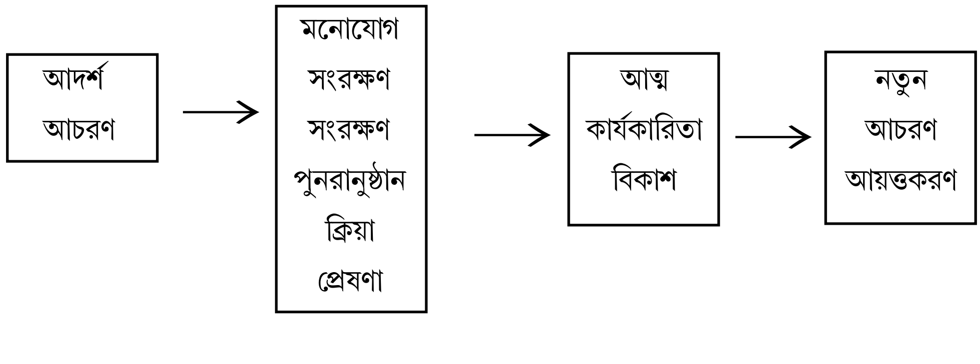

সংলক্ষণ—১ ঃ বহির্মুখিতা (Surgency) :

এই সংলক্ষণের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি হল :

বাক্পটু বনাম নীরব (Talkative vs. Silent), সামাজিক বনাম আত্মসমাহিত, (Sociable vs. Reclusive), উদ্যমী বনাম সতর্ক (Adventurous vs. Cautious), ইত্যাদি। পূর্ববর্তী তাত্ত্বিক বা যারা বহির্মুখিতা (Extraversion) বনাম অন্তর্মুখিতা (Introversion)-কে একটি সংলক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের উক্ত সংলক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে এই বৃহৎ সংলক্ষণেরই অন্তর্গত।

সংলক্ষণ—২ ঃ সহমত প্রবণতা (Agreeableness) :

এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মধুরস্বভাব বনাম খিটখিটে (Good natured vs. Irritable), নম্র, ভদ্র বনাম গোঁয়ার (Mild, Gentle Vs. Headstrong), সহযোগিতাপ্রবণ বনাম নেতিমনোভাবাপন্ন, (Co-operative vs. Negetivist), সরল বনাম ঈর্ষাপরায়ণ (Not jealous vs. Jealous), ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য।

সংলক্ষণ—৩ ঃ বিবেক পরায়ণতা (Conscientiousness) :

এই সংলক্ষণের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যগুলি হল, দায়িত্বশীল বনাম অনির্ভরযোগ্য (Responsible vs. Undependable), অধ্যবসায়ী বনাম অস্থিরমতি (Persevering vs. Fickle), পরিচ্ছন্ন, খুঁতখুঁতে বনাম বেপরোয়া (Tidy, Fissy vs. Careless), সৎ বনাম অসৎ (Serupulous vs. Unscrupulous) ইত্যাদি।

সংলক্ষণ—৪ ঃ প্রাক্ষোভিক সুস্থিতি (Emotional Stability) :

এতে আছে, শান্ত বনাম উদ্‌বেগপরায়ণ (Calm vs. Anxious), নিশ্চন্ত বনাম উত্তেজনাপ্রবণ (Composed vs. Excitable), অমূলক বিষণ্ণতামুক্ত—অমূলক বিষণ্ণতাপ্রবণ (Not Hypochondriacal vs. Hypochondriacal), ধীরস্থির বনাম নার্ভাস (Poised vs. Nervous, Tense) ইত্যাদি।

সংলক্ষণ-৫ ঃ সংস্কৃতি Culture)

পঞ্চম সংলক্ষণটির মধ্যে আছে, কল্পনাপ্রবণ বনাম কাঠখোট্টা (Imaginative vs. Simple, Direct) শিল্পবোধ সম্পন্ন বনাম শিল্পবোধহীন (Artistically sensitive vs. Insensitive), বিচারপ্রবণ বনাম বিচারবোধহীন (Intellectual বনাম Noureflective), সংকীর্ণ, সূক্ষ্ম, মার্জিত বনাম অমার্জিত (Narrow, Refened, Polished vs. Boorish) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য।

৯.৪.৩. ব্যক্তিত্বের সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory of Personality) :

সামাজিক শিখন সংক্রান্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন এ্যালবার্ট বান্দুরা (Albert Bandura)। তিনি শিখন ও শিক্ষণ প্রসঙ্গো যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তেমনি ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় তাঁর মতটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বান্দুরাকে অনেকে বলেন, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও স্কিনারের আচরণবাদী তত্ত্বের মধ্যে সংযোজক তাত্ত্বিক। কারণ, তিনি ফ্রয়েডের একাত্মতা (Identification) নামক ধারণাটিকে সামাজিক পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। আবার স্কিনারের শাস্তি ও পুরস্কার (Positive and Negative reinforcement) ধারণাকে একান্ত পরিবেশজাত বিষয় হিসেবে বিচার না করে তাকে ব্যক্তির সঙ্গো পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বান্দুরার তত্ত্ব ব্যক্তিত্ববিকাশের কোনো তত্ত্ব নয়। তাঁর তত্ত্বে কয়েকটি নীতির কথা বলা হয়েছে যা ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মতানুযায়ী, ব্যক্তিত্ব যেহেতু আচরণের সমন্বয় এবং যেহেতু আচরণ পরিবেশের সঙ্গো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, সেহেতু ব্যক্তিত্ব মূলত শিখনের ফলে আমরা যে আচরণ

পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত। অভীক্ষাটির সাহায্যে প্রত্যেকটি সংলক্ষণের মান নির্ণয় করার পর তাদের অবস্থানগুলি ছক কাগজে চিহ্নিত করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল (Personality Profile) যা প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রেই আলাদা।

আইজেঙ্কের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Eysencks Trait Theory)—

সংলক্ষণ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে আইজেঙ্কের স্থান স্বতন্ত্র কারণ তিনি পূর্ববর্তী ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ (Types of Personality) ও ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্বকে একত্র মিলিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। সর্বনিম্ন স্তরে আছে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট আচরণ। এগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়, কিন্তু এগুলি ব্যক্তিত্ব নয়। এর পরবর্তী স্তরে আছে অভ্যাসমূলক প্রতিক্রিয়া (Habitnal Response)। অনুরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ অভ্যাসবশত একই ধরনের আচরণ করে এবং অভ্যাসমূলক আচরণ সম্বন্ধে পূর্বানুমান যেমন করা যায় তেমনি এর সাহায্যে আমরা একটি মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করি। অনেকগুলি সমধর্মী অভ্যাসমূলক আচরণের সমন্বয়ে পরবর্তী উচ্চতর ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণ গঠিত হয় আর সর্বোচ্চ স্তরে একই ধরনের কয়েকটি সংলক্ষণ মিলে ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ (Type) সৃষ্টি হয়। ছবির সাহায্যে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

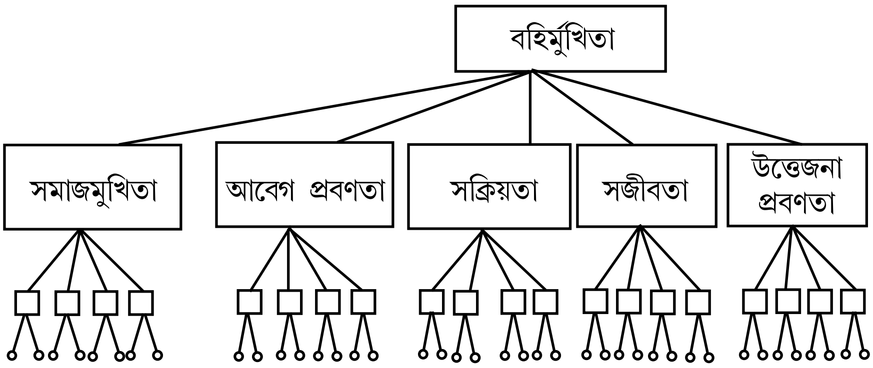

আইজেঙ্ক ব্যক্তিত্বের দুটি প্রধান শ্রেণি নির্ণয় করেন—বহির্মুখিতা-অন্তর্মুখিতা (Extroversion—Introversion) এবং উদ্বায়ু প্রবণতা (Neuroticism)। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আর একটি শ্রেণি—বাতুলতা (Pshychoticism)।

আধুনিক সংলক্ষণ তত্ত্ব (Modern Trait Theory) — আধুনিককালে ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানীরা সমস্ত সংলক্ষণ তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংলক্ষণ তত্ত্বের ধারণা দিয়েছেন। ডিগম্যান (Digman), ফিস্ক্ (Fiske) নর্মান (Norman), প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন মানুষের পাঁচটি প্রধান সংলক্ষণ ব্যক্তিত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। সেইজন্য এই তত্ত্বকে পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব বলা হয় (Five Factor Theory of Personality)। তাঁদের মতে সংলক্ষণগুলি হল—

তাঁর সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছেন যে, বাস্তবমুখিতা— কল্পনাপ্রবণতা যদি একটি ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হয় তবে যে ব্যক্তি বাস্তবমুখী, সে তার চারপাশের ঘটনাবলি থেকে উদ্দীকগুলিকে সবসময়ই বাস্তবমুখিতা দিয়ে বিচার করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে যার ফলে অন্যরা তাকে সহজেই বাস্তববাদী বলে চিহ্নিত করতে পারে। কিন্ত তাঁর মতে সংলক্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এই কথাটা ঠিক নয়। বরং তারা ক্রমোন্নত পদ্ধতিতে (Hieraschically) বিন্যস্ত। সর্বোচ্চ স্তরের সংলক্ষণকে তিনি বলেছেন প্রধান সংলক্ষণ (Cardinal trait)। এই সংলক্ষণগুলি অনেক আচরণের জনক। যেমন, যে মানুষ ক্ষমতাপ্রিয়, তার সারাজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতাই সবকিছু বিচারের মাপকাঠি। সংসারে, কর্মস্থলে, সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই সে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে চায়।

বিপরীতক্রমে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central traits) থাকে। আমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে পরিচ্ছন্ন, কৃপণ, বিশ্বস্ত ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করি, তখন এই গুণগুলির সবকয়টি সমস্ত আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু বিশেষণগুলি একটি মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। এগুলিই কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ। এ ছাড়াও অলপোর্ট তৃতীয় একপ্রকার সংলক্ষণের কথা বলেছেন। এগুলির অন্তর্গত আচরণ আরও সীমিত এবং এদের বহিঃপ্রকাশও খুব সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এদের বলা হয়, গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits)। পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদির মাধ্যমে গৌণ সংলক্ষণগুলির প্রকাশ ঘটে।

ক্যাটেলের উপাদান বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Cattell's Factor Analytic Theory)— অলপোর্টের মত সার্বিক বা প্রধান সংলক্ষণের তত্ত্ব ক্যাটেল মানতে চাননি। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দুই প্রকার মূল সংলক্ষণ (Source Trait) এবং প্রান্তিক সংলক্ষণ (Surface Trait)। মানুষের বাইরের আচরণ দেখে তার সম্বন্ধে অন্য মানুষরা যে ধারণা তৈরি করে নেয় এবং সেই ভাবেই তাকে চিহ্নিত করে। তাকে বলে প্রান্তিক সংলক্ষণ। যেমন, যে ব্যক্তি বাড়িতে, বাজারে, পাড়ায়, অফিসে প্রায়ই অন্যের সঙ্গো দুর্ব্যবহার করে, তাকে সবাই বদমেজাজি বলে চিহ্নিত করে। সুতরাং ভদ্রতা, অভদ্রতা একটি প্রান্তিক সংলক্ষণ।

অন্যদিকে মূল সংলক্ষণগুলি সরাসরি আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ এগুলির ব্যক্তি আরও বেশি। অনেক উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ পরিমাপ করে, তার ভিত্তিতে উপাদান বিশ্লেষণের গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই সংলক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। ক্যাটেলের মতে মোট ষোলোটি মূল সংলক্ষণ মিলে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। এই ষোলোটি সংলক্ষণ হল—

গম্ভীর—মিশুক (Reserved—Outgoing), ভোঁতা-বুদ্ধিমান (Less intelligent—Intelligent), আবেগপ্রবণ-সংযত আবেগ (Affected by feelings—Less affected by feelings), বিনয়ী-উগ্র (Humble-Assertive), সতর্ক-উচ্ছ্বাস প্রবণ (Sober-Happy-go-lucky), উচ্ছৃঙ্খল-বিবেক পরায়ণ (Expedient-Conscientious), লাজুক-উদ্যমী (Shy-Venturesome), কঠোর স্বভাব-নরমপ্রকৃতি (Tough minded-Tender minded), বিশ্বাস প্রবণ-সন্দেহ প্রবণ (Trusting-Suspicious), বাস্তববাদী-কল্পনাপ্রবণ (Practical-Imaginative), অমার্জিত-মার্জিত (Forthright-Astute), আত্মবিশ্বাসযুক্ত-শঙ্কাপ্রবণ (Self assured-Apprehensive), রক্ষণশীল-পরীক্ষণপ্রবণ (Conservative-Experimenting), দলমত নির্ভর-স্বমতনির্ভর Groupdependent-Self-sufficient), অব্যবস্থিত চিত্ত-সুস্থির (Uncontrolled self conflict-Controlled), প্রশান্ত-উত্তেজনা প্রবণ (Relaxed-Tense)।

এই ষোলোটি সংলক্ষণ পরিমাপ করার জন্য তাঁর বিখ্যাত অভীক্ষার নাম 16 Personality Factor Test সারা

লিবিডো বিকাশের সবস্তরগুলি যদি যথাযথভাবে অতিক্রম করতে পারে তা হলে শিশুর অহং উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোনো স্তরে লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) ঘটলে, অহং দুর্বল হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঠিকমত হয় না।

৯.৪.২ ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণবাদী তত্ত্ব (Trait Theories of Personality) :

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণাটি এসেছে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ থেকে। ইয়ুং এর অন্তর্মুখী বহির্মুখী ব্যক্তিত্বকে যদি আলাদা শ্রেণি হিসেবে গণ্য না করে একটি দ্বিমাত্রিক মাপনীর মত ধরে নেওয়া যায়, যার এক প্রান্তে অন্তর্মুখিতা ও অন্য প্রান্তে বহির্মুখিতাকে রেখে মাঝামাঝি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন মানুষের অবস্থান কল্পনা করা যায়, তবে তাই হবে ব্যক্তিত্বের একটি সংলক্ষণ।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হল কিছু সংখ্যক সদৃশ আচরণের মিলিত রূপ যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক করে (Personality trait is a set of similar behaviour that differentiates one person from another)। ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

● সংলক্ষণগুলি দ্বিমাত্রিক, এবং দুই বিপরীত মেরু দুইটি বিপরীত বিশেষণাত্মক শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (যেমন, সামাজিক—আত্মমগ্ন, অন্তর্মুখী—বহির্মুখী, শান্ত-বিচলিত, ইত্যাদি)।

● সংলক্ষণগুলি সীমিত সংখ্যক। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় সাধারণত অসংখ্য বিশেষণাত্মক শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষণের সাহায্যেই মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ধরা যায়।

● সংলক্ষণ কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ কেমন হবে তার একটি প্রত্যাশিত বর্ণনা। যেমন, যে ব্যক্তি খুব বেশি অন্তর্মুখী, তারপক্ষে দলবন্ধ যৌথ কাজ অপেক্ষা একা যে সব কাজ করা যায় তার প্রতি আকর্ষণ বেশি হবে।

● সংলক্ষণ ব্যক্তিত্বের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়ায়, ব্যক্তির আচরণ হবে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ অনুরূপ পরিস্থিতিতে তার আচরণ সবসময়ই একই ধরনের হবে বলে আশা করা যায়।

● ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ যেহেতু স্থায়ী এবং যেহেতু আচরণের মধ্যে দিয়েই তার প্রকাশ ঘটে, সেহেতু ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ পরিমাপ যোগ্য।

● ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ। অর্থাৎ একটি সংলক্ষণের মান, অপর একটি সংলক্ষণের মানের ওপর নির্ভর করে না।

সংলক্ষণবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের উপাদান হল সীমিত সংখ্যক সংলক্ষণ। সর্বপ্রথম অলপোর্ট (G.W. Allport) সংলক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে ক্যাটেল (R.B. Cattell) , আইজেঙ্ক (H. J. Eysenck) ও আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী তাঁদের নিজস্ব সংলক্ষণবাদী মত প্রকাশ করেন।

অলপোর্টের সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory of Allport) — অলপোর্ট মনে করেন সংলক্ষণ হল,

ব্যক্তির স্বকীয় কেন্দ্রীভূত সাধারণ মনোস্নায়বিক উপাদান যা অনেক উদ্দীপককে একটি প্রতিক্রিয়ায় সংহত করতে পারে এবং যা ব্যক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোজনমূলক ও প্রকাশ্য আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। (A generaliged and focalized neuropsychic system, peculiar to the individual, with the capacity to render many stimuli functionally equivalent, and to initiate consistent forms of adaptive and expressive behaviour)

এই সব প্রতিরক্ষা কৌশলের সমন্বয়ে মানুষের মধ্যে নানা বিচিত্র ধরনের আচরণের সৃষ্টি হয়। ফ্রয়েড প্রতিরক্ষণ কৌশলের ভিত্তিতে শুধু মাত্র যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি মানসিক ব্যাধির প্রতিটি লক্ষণেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর সাহায্যে।

প্রশ্ন হল, কেন এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অহং ভিন্ন পরিমাণের শক্তি সংগ্রহ করতে পারে, অর্থাৎ কেন অহংকে প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করতে হয়? ফ্রয়েড তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার লিবিডো বিকাশের (Libido development) তত্ত্বের সাহায্যে। তাঁর মতে লিবিডো নামে একটি যৌনমানস (Psychosexual) শক্তি আছে যা আমাদের সহজাত। জন্মের পর থেকে যে সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই শক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তার ওপর অহং-এর পরিণতি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়া কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। যেহেতু লিবিডো নামক যৌনমানসশক্তির উৎস নির্জ্ঞান মন, সেহেতু লিবিডোর পরিতৃপ্তি নির্ভর করে কোন্ কোন্ উৎস থেকে শিশু সুখভোগ করে তার ওপর।

প্রথম স্তরটিকে ফ্রয়েড বলেছেন, মৌখিক রতির স্তর (Oral erotic stage)। কারণ এই পর্যায়ে শিশু প্রথমে মুখের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের জন্য স্তন্যপানজনিত চোষণ প্রক্রিয়ায় প্রবল সুখ পায়। পরে তার মাড়ি শক্ত হয়ে দাঁত উঠলে তখন অপেক্ষাকৃত শক্ত জিনিস চিবিয়ে বা কামড়ে সুখ পায়। এই পর্যায়ে মৌখিক সুখ ব্যাহত হলে পরবর্তী স্তরের বেলায় শক্তির ঘাটতি থেকে যায়।

দ্বিতীয় স্তরটিকে বলা হয় পায়ুরতিস্তর (Anal erotic stage)। এই স্তরে সুখের উৎস মুখ ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হয়। তখন শিশু মলমূত্র ত্যাগ করে আরাম পায়। আরও কিছু পরে সে চেষ্টা করে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার মধ্যে দিয়েই সে সুখভোগ করতে চায়। এই সময় তাদের সামাজিকবোধ জাগ্রত হতে শুরু করে এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের শিক্ষার (Toilet training) এই হল প্রকৃষ্ট সময়।

তৃতীয় স্তরে সুখভোগের উৎস আরও বিস্তৃত হয়। এই স্তরকে লিঙ্গাস্তর (Phallic stage) বলা হয় কারণ যৌনাঙ্গা স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে শিশুরা এই পর্যায়ে সুখভোগ করে। এইভাবে সুখের উৎস ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকায় শিশু একধরনের আত্মরতিতে (Self love) মগ্ন হয়ে পড়ে। এই আত্মকেন্দ্রিক স্তরের নাম দেওয়া হয় নার্সিসিস্টিক স্তর (Narcissistic stage)। আত্মকেন্দ্রিক সুখ চরিতার্থ করার জন্য শিশুকে এবার বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয় কারণ সুখের প্রকৃত উৎস হল বাইরের জগৎ। ক্ষুধার খাদ্য, মায়ের আদর, সবই আসে বাইরে থেকে। এই উপলব্ধি থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর শুরু হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ইডিপাস স্তর (Oedipus stage)।

এই স্তরে প্রথম ভালোবাসার বস্তু হল মা। ফলে শিশু মাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে শিশুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তার বাবা। একদিকে বাবার প্রতি দ্বন্দ্বের অনুভূতি ও মার প্রতি ভালোবাসা আবার মা-বাবার পারস্পরিক ভালোবাসা—এই ত্রিকোণ সম্পর্ককে ফ্রয়েড বলেছেন ইডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex)। ইডিপাস গূঢ়ৈষার নিরসন কীভাবে হবে তার ওপর পরবর্তী ব্যক্তিত্ব গঠন অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিশু বাবার প্রতি তার নির্জ্ঞান দ্বেষ অবদমিত করে বাবার সঙ্গো একাত্মতা (Identification) অনুভব করে। বাবার আচরণ অনুকরণ করে বাবার মত হয়ে মাকে পেতে চায় এবং শেষপর্যন্ত সংজ্ঞান স্তরে বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসায় তার পরিণতি হয়।

ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত পিতৃপ্রতিম যে সত্ত্বা তাই শেষপর্যন্ত অধিশাস্তায় পরিণত হয়। আর

চরিতার্থ হতে চায়। কিন্তু এর সবটাই ঘটে নির্জ্ঞানে, আমাদের অগোচরে। তা সত্ত্বেও এগুলিই আমাদের মানসিক শক্তির মূল উৎস।

নির্জ্ঞান মনের দাবি ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়ে অহংকে অনেক সময়ই কিছুটা সমঝোতা করে চলতে হয়। কখনও কখনও হয়ত কিছুটা অন্যায় কাজকেও প্রশ্রয় দিতে হয়। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই এটা প্রয়োজন। সেজন্য অহংয়ের ওপর নজরদারি করার জন্য আর একটি সত্ত্বা আছে,যার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন, অধিশাস্তা (Superego)। অধিশাস্তার দুটি অংশ। একটি হল আমাদের উচিত-অনুচিত বোধ (Ego ideal) আর অপরটি হল আমাদের ন্যায় অন্যায়ের সতর্ক প্রহরী বিবেক (Conscience)। বিবেকের কাজ শাস্তি দেওয়া। অর্থাৎ দৈবাৎ কোনো অন্যায় করলে আমরা যে অপরাধবোধে ভুগি তা বিবেকের দেওয়া শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু বাস্তব জীবনে সমঝোতা ছাড়া বাঁচা যায় না। অধিশাস্তা অস্বাভাবিক শক্তিশালী হলে, সব কিছুকেই উচিত অনুচিত এইভাবে বিচার করতে চেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা দুরূহ হয়ে ওঠে। সুতরাং অহং-এর আর একটি কাজ হল, অধিশাস্তার সঙ্গো সামঞ্জস্যবিধান করা। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল কাঠামো অহং-এর এই তিন প্রকার সামঞ্জস্যবিধানের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে— এরা হল, অদস, বাস্তব এবং অধিশাস্তা। অহং যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তবে এই তিন শক্তির সঙ্গো সহজেই সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় এবং ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। আর অহং দুর্বল হলে, হয় অদস নতুবা অধিশাস্তা অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ডেকে আনে।

নিজের শক্তিতে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব না হলে অহং কতগুলি কৌশল অবলম্বন করে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। এগুলিকে বলা হয় প্রতিরক্ষা কৌশল (Defence Mechanism)। প্রতিরক্ষা কৌশল অনেক প্রকার কিন্তু এর অধিকাংশই অহং প্রয়োগ করে নির্জ্ঞান স্তরে। ফলে সচেতনভাবে ব্যক্তির প্রায়শই এগুলির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কয়েকটি প্রতিরক্ষা কৌশল নীচে দেওয়া হল ঃ

অবদমন (Repression) — অসামাজিক কামনাকে নির্জ্ঞান স্তরে আবন্ধ করে রাখা।

অস্বীকার (Denial) — জোর করে অসামাজিক কামনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা (আমার বাবার প্রতি কোনো আক্রোশ নেই)।

প্রতিক্ষেপণ (Projection) — নিজের অসামাজিক কামনা অন্যের ওপর আরোপ করা (বাবার আমার ওপর আক্রোশ আছে)।

প্রতিক্রিয়া গঠন (Reaction formation) — বিপরীত কামনা হিসেবে সংজ্ঞান স্তরে প্রকাশ করা (বাবার প্রতি আমার আক্রোশ নেই ভালোবাসা আছে)।

যুক্তিপ্রদান (Rationalisation) — অসামাজিক কামনাটিকে সামাজিক ও যুক্তিসংগত বলে প্রতিষ্ঠিত করা (বাবার প্রতি আমার রাগ আছে কারণ বাবা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন)।

উন্নয়ন (Sublimation) — অসামাজিক কামনাকে সৃজনশীল বা সমাজে প্রশংসিত পন্ধতিতে প্রকাশ করা (চিত্রকলা বা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ করা)।

প্রতিসঞ্চালন (Transference) — এক ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সঞ্চালিত করে কামনা চরিতার্থ করা (কারও ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ ইচ্ছায়, নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা)।

দীর্ঘকায় (Asthenic), হ্রস্বকায় (Pyknic) এবং অস্বাভাবিক (Dysplasitic) এই চারটি শ্রেণির কথা বলেন। পরবর্তীকালে শেল্ডনও (Sheldon) শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।

শুধুমাত্র মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগ করার প্রথম চেষ্টা করেন ইয়ুং (C.G. Jung)। তিনি বলেন অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ও তার স্থায়িত্ব বিচার করলে মানুষকে অন্তর্মুখী (Introvert) এবং বহির্মুখী (Extrovert পরবর্তীকালে Extravert) এই দুই শ্রেণিতে নাও হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের অবস্থানই মাঝামাঝি বা তার কাছাকাছি। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্বে পরবর্তীকালে ইয়ুং এর শ্রেণি বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র সংলক্ষণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

৯.৪.১ ব্যক্তিত্বের মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব (Psychodynamic Theory of Personality) :

মনঃসমীক্ষণী তত্ত্বের জনক ভিয়েনার চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। তাঁর মতে আমাদের মনোজগতে যত ভাব, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি আছে, তা তিনটি শ্রেণিভুক্ত। এক ধরনের উপাদান আছে যে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। অর্থাৎ আমরা জানি এগুলি আছে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইত্যাদি যা কিছু আমার 'আমি' ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আছে সেই সব মিলেই আমাদের সংজ্ঞান (conscious) মন। আর একধরনের উপাদান আছে, যা বিরাট এবং বিপুল, সেগুলি আছে আমাদের অজ্ঞাতে, সে সম্বন্ধে আমরা চেষ্টা করলেও সহজে সচেতন হতে পারি না, কিন্তু নানাভাবে তারা আমাদের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই উপাদানগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind)। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একধরনের উপাদান আছে যা একসময় আমাদের গোচরে ছিল কিন্তু এখন আগোচরে। প্রয়োজন হলেই আবার তাদের সংজ্ঞান স্তরে আনা যাবে। যেমন, স্মৃতিতে সংরক্ষিত অভিজ্ঞতা। এদের বলা হচ্ছে আসংজ্ঞান (Pre-conscious)।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মন হল আদিম অন্ধ অসামাজিক কামনা বাসনার আধার। এই কামনাগুলি জীবন প্রবৃত্তি (Eros or Life Instinct) এবং মরণপ্রবৃত্তি (Thanatos or Death Instinct) প্রসূত। অসামাজিক যৌন কামনা (Sexual drives) ও আক্রোশ (Aggressive drives) প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নির্জ্ঞানস্তর থেকে সংজ্ঞান স্তরে উঠে আসার চেষ্টা করে কারণ এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে-কোনো উপায়ে কামনা চরিতার্থ করা। এরা সামাজিক রীতিনীতি, বাস্তব, সময় ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্ধ, শুধুমাত্র সুখভোগের নীতি দ্বারা (Pleasure Principle) পরিচালিত।

কিন্তু সত্যি সত্যি যদি আদিম কামনাগুলি সংজ্ঞান স্তরে উঠে আসে তবে তা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেজন্য অহং (Ego) নামক একটি সত্ত্বা নির্জ্ঞানস্তরে এগুলিকে আবন্ধ করে রাখে কারণ অহং বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার সূত্রে বাস্তব নীতি দ্বারা (Reality Principle) পরিচালিত। 'আমি' বলতে যা বোঝায় Ego হল তাই। কিন্তু তার ক্রিয়াতৎপরতা সংজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞান স্তরে বিস্তৃত। সেখানে অহং-এর কাজকে বলা হয় সেনসর (Censor) যার অর্থ হল অসামাজিক কামনাগুলিকে নির্জ্ঞানে আবন্ধ করে বাছাই করা কিছু নির্দোষ কামনাকে সংজ্ঞানে আসতে দেওয়া। এই আটকে রাখার কাজটাই হল অবদমন (Repression)।

নির্জ্ঞানস্তরে অহংকে নির্জ্ঞানের অধিরাজ আর একটি সত্ত্বার সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। তার নাম অদস (Id)। অদসের কাজগুলি নির্জ্ঞান কামনার ধর্মপ্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। শুধু অদসের ভূমিকাটি এখানে বলা দরকার। অদসও অন্ধ সত্ত্বা সুখভোগের নীতি দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু অদসের নিজস্ব সুখভোগ বলে কিছু নেই। সে শুধু নির্জ্ঞান কামনাগুলিকে শক্তিশালী করে পরিচালিত করে এবং তাদের চরিতার্থতার মধ্যে দিয়েই নিজে

ভিন্ন হলেও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের নিরিখে প্রতিক্রিয়া করতে পারে যার উদ্দেশ্য হল পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সংগতিবিধান করা। সংগতিবিধান প্রক্রিয়াটি অনন্য কারণ, একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যজনের সংগতিবিধান ভিন্ন। সহজ কথায়, প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্বের দিক থেকে স্বতন্ত্র বা অনন্য, যদিও মূল উপাদানগুলি অভিন্ন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাক্সলার (A. E. Traxler) ব্যক্তিত্বের পরিমাপযোগ্য একটি কার্যকর সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, ব্যক্তিত্ব হল সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক রূপ। আচরণ বলতে শুধু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়। ঐ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত আন্তরিক অনুভব যা ব্যক্তি অন্তদর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাও আছে (Personality will be defined as the sumtotal of an individual's behaviour in social situations. Behaviour includes not only overt acts but inward feeling tone produced by the situation as interpreted by the individual through introspeation)

বিগত পঞ্চাশ বছরে আরও যত সংজ্ঞা পাওয়া গেছে তার সারকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাদুটির মধ্যেই নিহিত আছে।

৯.৪ ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব (Theories of Personality)

ব্যক্তিত্ব সম্ভবত মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রসঙ্গ। সেজন্য ব্যক্তিত্বকে জানার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। পারভিন (L. A. Pervin) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত তাঁর "ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব" (Theories of Personality) বইতে বলেছেন, ব্যক্তিত্ব এমন একটি মনোবৈজ্ঞানিক বিষয় যার সবটা একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেজন্য ব্যক্তিত্বের একাধিক সংজ্ঞা ও তত্ত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক।

ব্যক্তিত্ববিদরা ব্যক্তিত্বের তত্ত্বগুলিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল,—

(১) মনঃসমীক্ষণী মতবাদ (Psychodynamic Theory)

(২) সংলক্ষণ তত্ত্ব (Trait Theory)

(৩) আচরণবাদী তত্ত্ব (Behaviouristic Theory)

(৪) মানবাত্মিক তত্ত্ব (Humanistic Theory)

(৫) অস্তিত্ববাদী তত্ত্ব (Existential Theory)

(৬) সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory)

এর মধ্যে মনঃসমীক্ষণী মতবাদ, সংলক্ষণ তত্ত্ব এবং সামাজিক শিখন তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়ার পূর্বে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আর একধরনের চিন্তাধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ তার নিজের সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে অন্য মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে অভ্যস্ত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা মানুষকে শ্রেণি বিভাগ করে নেওয়ার পক্ষপাতী। যেমন, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ ইত্যাদি। এই প্রবণতা প্রাচীনকাল থেকেই নানা দেশে নানা সময়ে লক্ষ করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে হিপোক্রেটিস (Hippocrates) মানুষকে শারীরিক রসায়নের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা, উৎফুল্ল, কোপনস্বভাব, বিষণ্ণ এবং শ্লথ। ভারতীয় চিকিৎসায় (আয়ুর্বেদে) মানুষকে বায়ুপ্রধান, পিত্তপ্রধান, কফপ্রধান এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হত। ক্রেশমার (Kretschmer) শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে পেশিবহুল (Atheletic),

৯.৩.১ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা (Common People's Concept of Personality) :

সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝেন একজন মানুষের অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাকে। যে মানুষকে সবাই সমীহ করে চলেন, যার উপস্থিতিতে অন্য সকলেই কিছুটা ম্লান ও অনুজ্জ্বল, যার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য অনস্বীকার্য এই রকম মানুষের ব্যক্তিত্ব খুব বেশি বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের চোখে। অপরদিকে যারা পরমত নির্ভর, সর্বদাই সমঝোতা করে চলেন নিজের মতামত জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন না, সহজেই মত পরিবর্তন করেন, সাধারণ মনুষের মতে তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং ব্যক্তিত্বহীন এই দুই বিপরীত প্রকৃতির মানুষের মাঝামাঝি যাদের অবস্থান তারা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের বেলায় ব্যক্তিত্ববান কিন্তু বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উপস্থিতিতে তারা ব্যক্তিত্বহীন।

মনোবিজ্ঞানে কারও ব্যক্তিত্ব থাকা বা না থাকার প্রশ্নটি অবান্তর কিন্তু ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক বিচারের যে কথা বলা হল তা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণাটি জানা দরকার।

৯.৩.২ ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণা (Psychological Concept of Personality) :

প্রাচীন গ্রিসে নাটকের কুশীলবরা নানাধরনের মুখোশ পরে অভিনয় করতেন। এই মুখোশগুলিই একটি চরিত্র থেকে আর একটি চরিত্রকে পৃথক করত। এই মুখোশগুলিকে বলা হত Persona আর তা থেকেই Personality শব্দটির উৎপত্তি। এর তাৎপর্য হল, মানুষের বাইরের যে রূপটা অর্থাৎ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে মেলামেশা করে আমরা একটা মানুষের রূপটা ধারণা করে নিই, সেটাই হল তার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার অন্তর ও বাইরের প্রকৃতি যদি আলাদা হয়, ঠিক যেমন মুখোশের আড়ালে থাকে আসল মুখটি, সেটি নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন একজন মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তার যে সত্যিকারের প্রকৃতি গড়ে উঠেছে তাই হল তার ব্যক্তিত্ব। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বই অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা দেওয়া হল।

ব্যক্তিত্বের প্রথম দিককার সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মে (M.A.May) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিত্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

ব্যক্তিত্ব হল সেইগুণ যা ব্যক্তিকে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করায়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সামাজিক উদ্দীপনার মান (Personality is that which makes one effective, or gives one over other. In the language of Psychology it is ones social stimulus value)।

পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা তার মধ্যে অলপোর্টের (G.W. Allport) দেওয়া ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সংজ্ঞাটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয় তার কারণ এই সংজ্ঞাটি ব্যক্তিত্বের সঠিক স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করতে সক্ষম।

অলপোর্টের মতে— ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির মধ্যে যেসব শারীর মানসিক উপাদান তার পরিবেশের সঙ্গো অনন্য সামঞ্জস্য বিধানে নিয়োজিত তাদের একটি পরিবর্তনশীল সংগঠন (Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment)। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিত্বে উপাদানগুলির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দুই প্রকার উপাদানই বিদ্যমান। এই উপাদানগুলির যে সংগঠন তা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল এবং সেই কারণেই। পরিবেশ

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সামাজিক মানুষে পরিণত হবেন এটাই আশা করা হয়। সেজন্য শিক্ষার উপাদানগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয় যাতে শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত সহায়ক হতে পারে। এখানে ব্যক্তিত্ব মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রসূত নয়, বরং একটি আদর্শবাদী দার্শনিক ধারণা হিসেবে গৃহীত হয়।

অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব শিক্ষার অন্যতম নিয়ন্ত্রণকারী একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ ব্যক্তিত্বের অনেক উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ যখন মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হয়, তখন তার শিক্ষা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি সেই মানসিক স্বাস্থ্যউদ্ধারও শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে যায়।

বিপরীতক্রমে, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব তার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পাঠক্রমে অনেক সময়ই ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক চর্চা ও অনুসন্ধান করেছেন। মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানী (Abnormal Psychologist) ও মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানীরা (Clinical Psychologist) বিপুল জ্ঞান আহরণ করেছেন। আলোচ্য পাঠ্যাংশে তার কিছু নির্বাচিত বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের মনঃসমীক্ষণী মতবাদ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের সংজ্ঞা ও সংলক্ষণ মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিত্বের সামাজিক শিখন তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- মানসিক স্বাস্থ্য ও সংগতিবিধান কাকে বলে বলতে পারবেন এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.৩ ব্যক্তিত্বের ধারণা (Concept of Personality)

ব্যক্তিত্ব এমন একটি শব্দ যা আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি। মনোবিজ্ঞানীরা বিগত একশত বৎসরেরও বেশি সময় ধরে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে আসছেন, কিন্তু এখনও তার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা স্থির করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন জটিল ও তাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। ঠিক যেমন একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে আলাদা ধরনের বলে প্রতিভাত হন। তবে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞাগুলি উল্লেখ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা ও মনোবিজ্ঞানীদের ধারণার সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য আছে।

একক ৯ ❑ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য (Learner's Personality and Mental Health)

গঠন

9¡1 ¼÷æì (Introduction)

9¡2 Åí ! Ðồ (Objectives)

9¡3 ûốè k í&ë Óìëˆì (Concept of Personality)

9¡3¡1 ûốè k& ¼@·ía ¼ìÓìëË âìæí»ë Óìëˆì (Common People's Concept of Personality)

9¡3¡2 ûốè k í&ë âíæìèûÚìæ ¼@‡ç Óìëˆì (Psychological Concept of Personality)

9¡4 ûốè k í&ë ç+ (Theories of Personality)

9¡4¡1 ûốè k í&ë âæ¥¼âéáËé ç+ (Psychodynamic Theory of Personality)

9¡4¡2 ûốè k í&ë ¼¤ÜáËûìóé ç+ (Trait Theory of Personality)

9¡4¡3 ûốè k í&ë ¼ìâìèäô èÐÔæ ç+ (Social Learning Theory of Personality)

9¡5 âìæè¼ô t·íóồë Óìëˆì (Concept of Mental Health)

9¡5¡1 âìæè¼ô t·ìồ ß ¼¤ùèçèûÓìæ (Mental Helath and Adjustment)

9¡5¡2 âìæè¼ô ¼òçìë ¼ìÓìëË ÜáË (General Criteria of Mental Health)

9¡5¡3 âìæè¼ô Ì¼òçìë ôìëË (Causes of Ill Mental Helath)

9¡5¡3¡1 ¾äèûô ôìëË (Biological Causes)

9¡5¡3¡2 âíæì¼ìâìèäô ôìëË (Psycholosical Causes)

9¡5¡3¡3 ¼ìâìèäô ôìëË (Social Causes)

9¡5¡3¡4 èûóồìÜúÙèåç ôìëË (Causes related to school)

9¡5¡3¡5 âìæè¼ô ôìëË (Psychological Causes)

9¡6 «xìûèÜ (Questions)

৯.১ সূচনা (Introduction)

ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গাটি শিক্ষায় দুই রকম ভাবে যুক্ত। একদিক থেকে তাত্ত্বিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকে অন্যতম প্রধান বিষয় বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি সুসংহত

তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গো সম্পৃক্ত করে তার নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে তবে কোন্‌টির প্রতি সে মনোযোগ দেবে বা দেবে না তা সে নিজেই স্থির করে নিতে পারবে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পুস্তকগুলিতে গ্রন্থকার বা মনোযোগের জন্য আর কোনো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করে রাখেন না।

৮.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) মনোযোগের সংজ্ঞা কী ?

(২) মনোযোগের বিচলন বলতে কী বোঝায় ?

(৩) মনোযোগের বিদোলন কী ?

(৪) মনোযোগের পরিসর নিয়ে আলোচনা করুন।

(৫) মনোযোগের নির্ধারক শর্ত কী কী ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) মনোযোগ বলতে কী বোঝায় ? মনোযোগের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন।

(২) মনোযোগের নির্ধারক শর্ত নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করুন।

(৩) (ক) ব্রডবেন্টের তত্ত্ব (খ) সম্পদ বন্টনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করুন। কোন্ তত্ত্বটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

(৪) মনোযোগের আধুনিক মতবাদ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করুন।

সবটা মনোযোগ তার ওপর নিবদ্ধ রাখার দরকার হয় না। একটি অংশ সেখানে নিয়োগ করে বাকি মানসিক ক্ষমতা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রথম কোনো কিছু লিখতে শুরু করার পর পূর্ণ মনোযোগ সেখানেই নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু একবার লেখার কাজটি স্বাভাবিক হয়ে এলে, তখন লিখতে লিখতে গানশোনায় কোনো বাধা থাকে না। তখন লেখার কাজ ও গান উপভোগ করার কাজ একযোগে চলতে পারে। এই তত্ত্বটিকে নিম্নলিখিত চিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

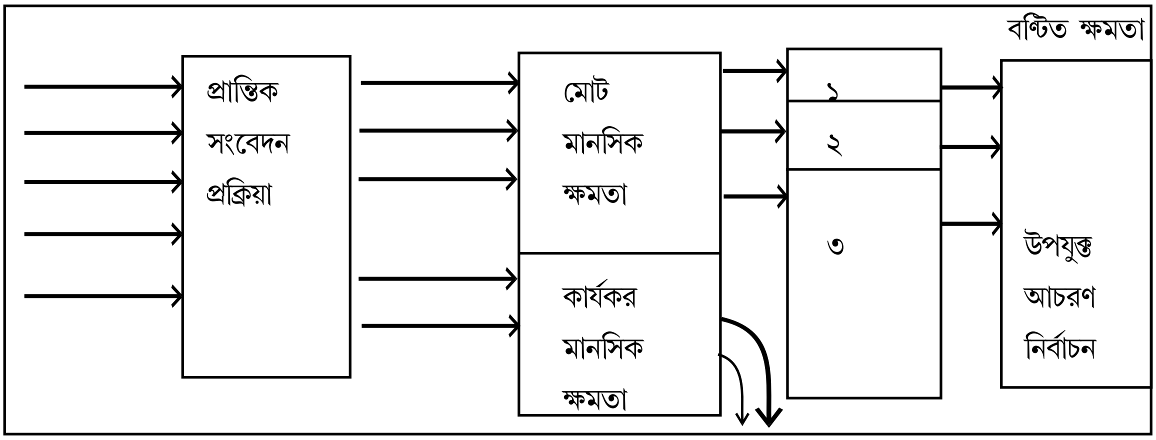

বলা বাহুল্য এই তত্ত্বটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

৮.৬.৩ মনোযোগের আধুনিক মতবাদ (Modern views of Attention) :

প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞানীরা (Cognitive Pshychologists) আমাদের স্মৃতি, চিন্তন, শিখন প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলিকে একটি ধারাবাহিক পরস্পর সম্পর্কিত সংহত মানসিক অংশ হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ এই সব মানসিক ক্রিয়াগুলির কোনোটিই স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে না। তারা একটি একীভূত (Unified) প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। যেমন, কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে (উদ্দীপক) নামটি বলার (প্রতিক্রিয়া) মধ্যবর্তী সময়ে, স্মৃতি, মনোযোগ, চিন্তা সবই একযোগে কাজ করে বলেই আমরা প্রত্যুত্তর দিতে পারি। যে-কোনো একটি ব্যর্থ হলে প্রত্যুত্তর সৃষ্টি হবে না।

এই দিক থেকে তাঁরা মনে করেন মনোযোগ একটি স্বাভাবিক মধ্যবর্তী স্তর যা উদ্দীপক ও পরবর্তী প্রজ্ঞামূলক মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সংযোগ সূত্র হিসেবে কাজ করে। এই কারণে মনোযোগ ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক এই বিচার ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং কোনো কোনো শর্তে কীসের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হবে তাও বিচার্য বিষয় নয়। কারণ, কোনো একটি উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ না থাকার অর্থ অন্য একটি উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ আছে। অর্থাৎ মনোযোগ প্রতিনিয়তই কোনো উদ্দীপকের সঙ্গে এক বা একাধিক মানসিক ক্রিয়া শৃঙ্খলের সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষা ও শিক্ষণের দিক থেকে মনোযোগের এই ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও ধরে রাখার জন্য শুধুমাত্র কৃত্রিম ভাবে মনোযোগের শর্তগুলির প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সাময়িক সাফল্যলাভ করতে পারি কিন্তু সঠিকভাবে প্রজ্ঞার সংগঠন, যার নির্মাণ ব্যক্তিনির্ভর, উদ্দীপিত করতে পারলে মনোযোগ স্বতঃক্রিয়ভাবে সংযোগসেতু হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ সহজ কথায় শিক্ষার্থী যদি

যেমন আর কোনো বস্তু সেখান দিয়ে যেতে পারে না, মনোযোগও তেমনি। চিত্রের সাহায্যে ব্রডবেন্টের তত্ত্বটি দেখানো হল।

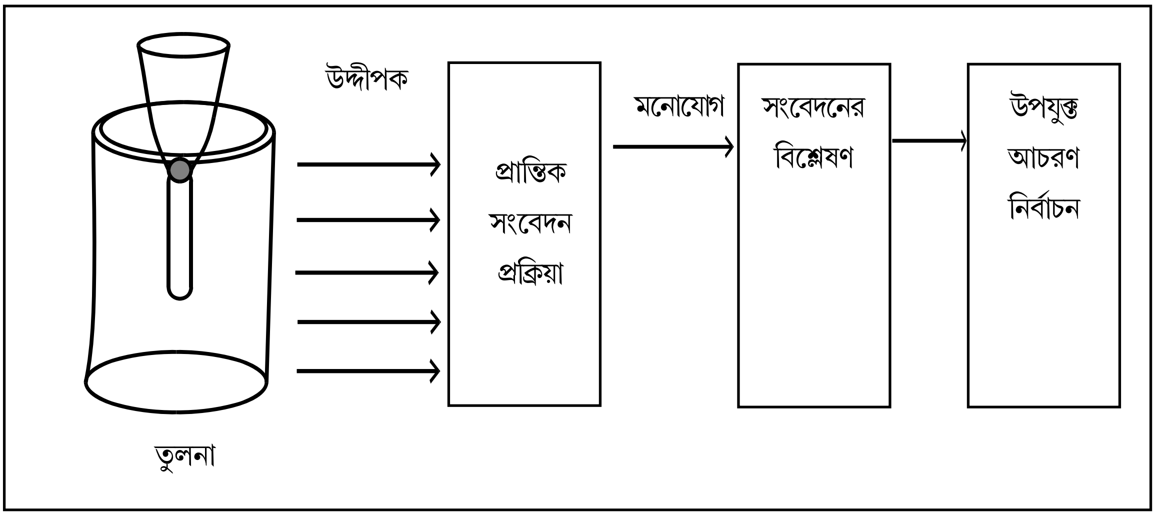

ব্রডবেন্টের তত্ত্ব

এই তত্ত্বেরই পরবর্তী পরিমার্জিত রূপটি নীচে দেওয়া হল।

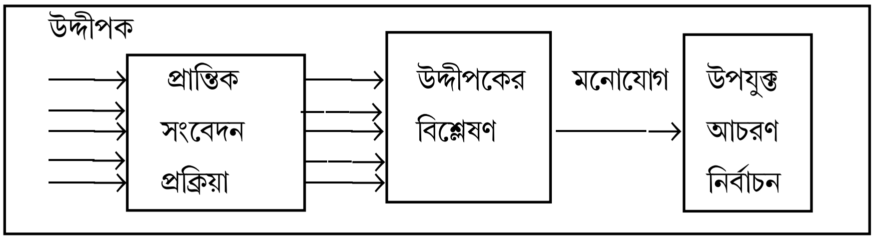

উপরোক্ত চিত্রদুটির সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে প্রাথমিক (প্রান্তিক) সংবেদনের পর একাধিক উদ্দীপক চেতনায় এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যখন উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার জন্য অন্যসব উদ্দীপককে সরিয়ে একটিমাত্র উদ্দীপককে বেছে নিতে হয়। ক্লাসের মধ্যে কোনো ছাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, অন্যজন বাইরের দিকে চেয়ে দেখছে, কেউ পাশের ছাত্রর সঙ্গো কথা বলছে, কিন্তু প্রাত্যুত্তর দেওয়ার জন্য একে বারে একটিকেই বেছে নিতে হবে শিক্ষককে। হয় তিনি ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর দেবেন, না হলে বাইরে চেয়ে থাকা ছাত্রটির মনোযোগ ফেরাতে সচেষ্ট হবেন নতুবা কথা বলার জন্য ছাত্রটিকে তিরস্কৃত করবেন। যে-কোনো একটি প্রতিক্রিয়ার সময় অন্যগুলির প্রতি তাঁর মনোযোগ থাকবে না।

৮.৬.২ সম্পদ বণ্টনের তত্ত্ব (Resource Allocation Theory) :

নিসার (Neisser, 1976) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন মনোযোগ এতটা নির্বাচনধর্মী নয়। আমাদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ (limited mental capacity)। যখন প্রথম কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় তখন প্রায় সবটা ক্ষমতাই কাজে লাগানো হয়। কিন্তু একবার প্রতিক্রিয়াটি সহজ হয়ে গেলে আর

জন্য প্রচলিত ধারার পোষাকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া এর উদাহরণ। অনেকে প্রবৃত্তির (Instinct) কথাও বলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমাদের মধ্যে যে প্রেষণার সৃষ্টি হয়, তাই আমাদের মনোযোগের নির্ধারক। যেমন, যূথবদ্ধতা (Gregariousness) একটি প্রবৃত্তি যার দরুণ আমরা অন্যের অনুপস্থিতিতে একাকিত্ব বোধ করি। ফলে সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে একটা প্রেষণা সৃষ্টি হয় আর তার ফলে ভিড়ের মধ্যে চেনা মানুষের প্রতি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

প্রক্ষোভ (Emotion) — রাগ হলে আমরা আক্রমণ করার উপযোগী জিনিসের প্রতি সহজেই মনোযোগ দিই বা ভয় পেলে পালানোর রাস্তা সহজেই খুঁজে পাই। সুতরাং আমরা যখন প্রক্ষোভজনিত কারণে অস্থির তখন আমাদের মনোযোগ উপযুক্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যা আমাদের প্রক্ষোভজনিত প্রতিক্রিয়ায় সাহায্য করবে।

আগ্রহ (Interest) — অনেকে বলেন মনোযোগের ফলে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় আবার আগ্রহ সৃষ্টি হলে আগ্রহের বিষয়ে প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে মনোযোগ দিলেই কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সব ছাত্রছাত্রীকেই গভীর মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক কষতে হয়। কিন্তু তাদের সকলেরই অঙ্কের প্রতি আগ্রহ জন্মায় না। অর্থাৎ আগ্রহ সৃষ্টির একটি শর্ত মনোযোগ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র শর্ত নয়। তবে যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ যে সহজে আকৃষ্ট হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ম্যাকডুগালের কথা অনুযায়ী আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অংশ (Interest is latent attention and attention is interest in action)। কিন্তু এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

ছোট শিশুরা বাহ্যিক শর্তে বেশি মনোযোগ নির্ধারণ করে কিন্তু বড়োদের মনোযোগ তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ শর্তে বেশি নির্ধারিত হয়। এই কারণে ছোটোদের পাঠ্যপুস্তক উজ্জ্বল রঙে, বড়ো অক্ষরে ছাপা হয়। তাদের পাঠদান করার সময় বাহ্যিক শর্তগুলি বেশি করে প্রযোগ করা যায়। আর বড়ো ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে আগ্রহ, প্রেষণা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ শর্তগুলি পঠনপাঠনে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৮.৬ মনোযোগের তত্ত্ব (Theories of Attention)

মনোযোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা নানা তত্ত্বে সাহায্য নিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি তত্ত্ব এখানে উল্লেখ করা হল। প্রথম দুটি সরাসরি আলোচ্য পাঠ্যাংশটিতে দেওয়া হল। তৃতীয়টি দেওয়া হল পরবর্তী মনোযোগের আধুনিক মতবাদ অংশে।

৮.৬.১. ব্রডবেন্টের তত্ত্ব (Broadbent's Theory) :

এই তত্ত্বটি মনোযোগের নির্বাচনধর্মীতাকে সমর্থন করে। একে অন্য নামে বলা হয় মনোযোগের পরিস্রবণ তত্ত্ব (Filtor theory)। ১৯৫৮ সালে ব্রডবেন্ট বলেন মনোযোগ হল ছাঁকনির মত, কারণ অনেকগুলি উদ্দীপক যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় আঘাত করে তখন মনোযোগ বাকি সবগুলিকে প্রতিহত করে একটিকে আমাদের চেতনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। একটি ফানেলের (Funnel) মুখে কোনো বস্তু আটকে গেলে

নির্বাচন যে সমস্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তাকেই বলে মনোযোগের নির্ধারক শর্ত। প্রধানত এই শর্তগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—উদ্দীপক সংক্রান্ত বা বাহ্যিক শর্ত এবং ব্যক্তিসংক্রান্ত বা অভ্যন্তরীণ শর্ত।

৮.৫.১ মনোযোগের বস্তুগত বা বাহ্যিক শর্ত (Objective or External Conditions of Attention) :

উদ্দীপকের কিছু কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগের প্রধান কারণ। যথা,

তীব্রতা (Intensity) — তীব্র আলো, তীক্ষ্ণ শব্দ, ইত্যাদি সহজেই অন্য সবকিছু থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে ঐ দিকে নিবন্ধ করে।

আকৃতি (Size) — স্বাভাবিক থেকে অত্যন্ত বড়ো বা ছোটো আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। খুব দীর্ঘকায় বা হ্রস্বকায় মানুষ সহজেই চোখে পড়েন।

আকস্মিকতা (Suddenness) — হঠাৎ আচমকা কিছু ঘটলে আমাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

পরবির্তন (Change)—প্রতিদিন যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত তার মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন হলে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পৌনঃপুনিকতা (Frequency) — বারবার কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি হলে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেজন্যই বিজ্ঞাপনদাতারা একই বিজ্ঞাপন বারবার দেখান।

অভিনবত্ব (Novelty) — অভিনব অর্থাৎ নূতন অপ্রচলিত, দুর্লভ ইত্যাদি অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

ধারাবাহিকতা (Continuity) — বিচ্ছিন্ন বস্তু অপেক্ষা ধারাবাহিক উদ্দীপক সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে।

গতিশীলতা (Movement) — গতিশীল বস্তু স্থির বস্তুর চেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণকারী। এই কারণে স্থির বিজ্ঞাপন অপেক্ষা চলমান বিজ্ঞাপন বা ক্লাসে স্থির চিত্র সম্বলিত চার্ট অপেক্ষা প্রোজেক্টারের সাহায্যে গতিশীল দৃশ্য দেখালে বেশি কার্যকর হয়।

৮.৫.২ মনোযোগের ব্যক্তিগত বা অভ্যন্তরীণ শর্ত (Subjective or Internal Conditions of Attention) :

মনোযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী, শুধুমাত্র বাইরের শর্তই যথেষ্ট নয়। মানুষের নিজস্ব তাগিদ থেকেও প্রাথমিক মনোযোগের সূত্রপাত হয়। এইসব তাগিদ নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে।

চাহিদা (Need) — কোনো কিছুর চাহিদা সৃষ্টি হলে চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ক্ষুধায় খাদ্য, পিপাসায় পানীয় ইত্যাদির প্রতি যেমন মনোযোগ সৃষ্টি হয় তেমনি কৃত্রিম চাহিদার ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য। কোনো একটি বিশেষ বই দরকার, বা একটি কলম দরকার তখন ওইটিই আমরা বেছে নিই কারণ সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

প্রেষণা (Motivation) — চাহিদা থেকে আসে এক নিজস্ব তাগিদ বা প্রেষণা। প্রেষণার তাগিদেই প্রেষণার সন্তোষবিধানের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সহপাঠীদের স্বীকৃতি পাওয়ার

বিশ্লেষণ ক্রিয়া শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই আবার শুরু হয়। অর্থাৎ মনোযোগ ছাড়াও স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদিও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

৮.৪.৫ মনোযোগের প্রকারভেদ (Types of Attention) :

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী মনোযোগকে নানা প্রকার ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ঐচ্ছিক মনোযোগ (Voluntary attention) ও অনৈচ্ছিক মনোযোগ (Nonvoluntary attention) এই দুই ভাগে ভাগ করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে আমরা ঐচ্ছিকভাবে মনোযোগের বিষয় নির্বাচন করে তার প্রতি মনোযোগ দিই। আবার কখনও কখনও মনোযোগ দিতে প্রস্তুত না থাকলেও নানা শর্তে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তেমনি দীর্ঘকাল ধরে কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দিতে দিতে সেটি আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন তাকে বলা হয় অভ্যাস প্রসূত মনোযোগ (Habitual attention)।

মনোযোগের এই জাতীয় শ্রেণি বিভাগত আধুনিক চিন্তায় খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। আমাদের মনোযোগ কোনো কিছুর প্রতি যেভাবেই আকৃষ্ট হোক না কেন, মনোযোগের মৌলিক প্রকৃতিতে তার জন্য কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আমরা মনোযোগের শর্তগুলির শ্রেণিবিভাগ করতে পারি কিন্তু মনোযোগকে নয়। এছাড়াও যে কারণে কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই কারণ মনোযোগের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু নয়। আমাদের সমস্ত রকম অভ্যাস গঠনের পিছনে যে প্রক্রিয়া কাজ করে মনোযোগের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং অভ্যাসপ্রসূত মনোযোগ নামে স্বতন্ত্র শ্রেণির মনোযোগের চিন্তা খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়।

৮.৪.৬ মনোযোগের পরিসর (Span of Attention) :

এক সঙ্গে কতগুলি উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব এই বিষয়টি নিয়েও মনোবিজ্ঞানরীরা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। খুব সামান্য সময়ের জন্য অনেকগুলি চিত্র দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করে পরে ওইগুলি চিহ্নিত করতে বললে দেখা যায়, খুব সরল আকৃতির চিহ্ন হলে, ৫-৬টির বেশি উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যায় না। মনোযোগের পরিসর কম বা বেশি হলে প্রত্যক্ষভাবে তার প্রভাব পড়ে চলমান কোনো উদ্দীপকের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া ও তার অর্থবোধ হওয়ার ওপর। যেমন, টেলিভিশনের পর্দায় খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল ছবি বা লেখা, কথোপকথনের সময় অন্যের কথা অনুধাবন করা, ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা অনুধাবন করা, এমনকি দ্রুত কোনো বইপড়ার ক্ষেত্রেও মনোযোগের পরিসর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গেছে যার মনোযোগের পরিসর বেশি, সে অনেক দ্রুত বই পড়তে ও তার অর্থ বুঝতে পারে। তবে মনোবিজ্ঞানীরা একথাও মনে করেন, চেষ্টা করলে মনোযোগের পরিসর কিছুটা বাড়ানো যায়।

৮.৫ মনোযোগের নির্ধারক শর্ত (Determinats of Attention)

মনোযোগের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে যে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মনোযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা আসলে মনোযোগের নির্ধারক শর্তগুলির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। যদি ধরে নেওয়া হয় যে মনোযোগ নির্বাচনধর্মী, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল কীভাবে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়। মনোযোগদানের উদ্দীপক

ক্রমাগত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাড়ে এবং কমে। ঠিক শব্দ তরঙ্গো মতই মনোযোগের হ্রাসবৃদ্ধি তরঙ্গাকারে একবার গভীরতম অবস্থায় পৌঁছায় এবং পরক্ষণেই তা কমতে কমতে নিম্নতম অবস্থায় পৌঁছায়। যতই মানুষ গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে ততই মনোযোগের এই হ্রাসবৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে ঘটতে থাকে। মনোযোগের এই ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধিকে বলা হয় মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of attention)। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন বিচলন মনোযোগের অধিকতর নিশ্চিত পরীক্ষা (fluctuation is the surer test of attention)।

একটি ঘড়িকে যদি কানের কাছে ধরে টিক্ টিক্ আওয়াজ শোনা যায় এবং যদি ঘড়িটিকে ধীরে ধীরে মাটির সমান্তরালে কান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় তবে এমন একটা দূরত্ব পাওয়া যাবে যেখানে ঘড়ির আওয়াজটি ক্ষীণভাবে শোনা যায় কিন্তু আরও দূরে সরালে আর শোনা যায় না। এই অবস্থানে ঘড়িটিকে ধরে রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে শব্দটি শোনার চেষ্টা করলে দেখা যাবে ঘড়ির শব্দটি একবার মিলিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। নীচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হল।

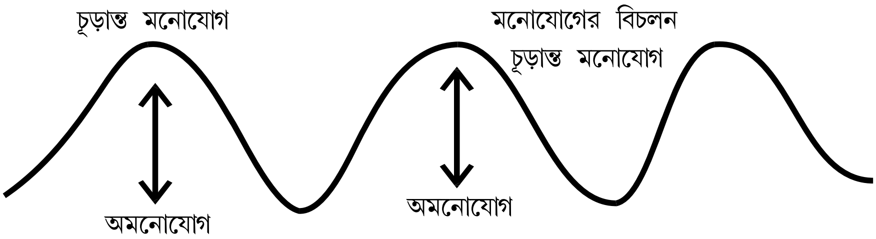

৮.৪.৩ মনোযোগের বিদোলন (Oscillation of Attention) :

মনোযোগের একটি দ্রুত সঞ্চরণশীলতা আছে। খুব দ্রুত একটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোযোগ সঞ্চালিত হতে পারে। আবার পূর্বের বিষয়টিতে ফিরে আসতেও পারে। কখনও এই প্রক্রিয়া স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। কখনও আংশিকভাবে হলেও বাহ্যিক কারণে মনোযোগ পূর্ববর্তী উদ্দীপক থেকে সরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। মনোযোগের এই সঞ্চারণশীলতাকে বলা হয় মনোযোগের বিদোলন। মনোযোগ সহকারে কোনো পুস্তক পড়তে পড়তে পাঠক দেখে নিলেন ঘরে কে ঢুকল, আবার পড়ায় মন দিলেন কিংবা দুটি ছবির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি থেকে অন্যটিতে মনোযোগের সঞ্চালন, এগুলি মনোযোগের বিদোলনের উদাহরণ।

৮.৪.৪ মনোযোগের বিশ্লেষণধর্মিতা (Analytical property of Attention) :

পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন মনোযোগের একটি বিশ্লেষণধর্মী ও সংশ্লেষণধর্মী গুণ আছে। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন আমাদের পারিপার্শ্বিক তথ্যগুলিকে জানার জন্য মনোযোগ সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। কিন্তু যুক্তি সহকারে বিচার করলে এই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণকে মনোযোগের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, মনোযোগ আমাদের মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা যাই হোক না কেন, সংজ্ঞা অনুযায়ী তা শুধু আমাদের চেতনাকে সংহত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের জন্য মনোযোগ প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ আরও জটিল প্রজ্ঞামূলক প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, মনোযোগ এককভাবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করলে, যখনই মনোযোগ বিঘ্নিত হবে তখনই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়ার পর আবার মনোযোগ দিলে যেখানে

concentration) ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংজ্ঞার যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক গভীর অভিনিবেশের সঙ্গো প্রত্যক্ষণ হলে চেতনায় আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। অধিকাংশ সময়ই কিন্তু মনোযোগ কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য নিবিষ্ট হয় এবং তা কেন্দ্রীভূত একমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে না।

মনোযোগের সংজ্ঞা হিসেবে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি মনোযোগকে একটি মানসিক অবস্থা (Mental State) হিসেবে বর্ণনা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক অবস্থা যখন পারিপার্শ্বিক কোনো উদ্দীপনাকে সার্থকভাবে প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রস্তুতি তৈরি হয়। (Attention is a mental state when we are ready to perceive an environmental stimulus meaningfully) প্রথম সংজ্ঞার সঙ্গো দ্বিতীয়টির যে খুব বেশি পার্থক্য আছে তা নয়। প্রথমটিতে বলা হয়েছে মনোযোগ ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত হলেই প্রত্যক্ষণ সম্পন্ন হবে, অর্থাৎ উভয় প্রক্রিয়া একযোগে সম্পন্ন হয়। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মনোযোগ নামক মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষণের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

আধুনিক প্রজ্ঞামূলক মনোবিজ্ঞানে (Cognitive Psychology) মনোযোগকে প্রত্যক্ষণ ও তথ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যিক অঙ্গা হিসেবে গণ্য করা হয়, একটি স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়া বা অবস্থা হিসেবে নয়। সেজন্য সংজ্ঞা হিসেবে মনোযোগের পরিস্রবণ (Filtration) ক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি মনোযোগের তত্ত্ব প্রসঙ্গো আলোচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে মনোযোগ একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া বা অবস্থা। যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি ততক্ষণ কোনো না কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবন্ধ থাকে।

৮.৪ মনোযোগের প্রকৃতি (Nature of Attention)

মনোযোগের সংজ্ঞার মাধ্যমে মনোযোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার ওপর বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁরা যে সব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন তার কয়েকটি এখানে দেওয়া হল।

৮.৪.১ মনোযোগ নির্বাচনধর্মী (Attention is selective) :

মনোযোগের নির্বাচনধর্মীতাকে অস্বীকার করা যায় না। মনোযোগের ফলে পরিপার্শ্বিক থেকে একটি ক্ষুদ্রতর অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার ওপর সমগ্র চেতনা নিবিষ্ট হয়। তখন অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়। মহাভারতে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষায় পাখির চোখের ওপর মনোযোগ নিবিষ্ট করার গল্পটি মনোযোগের নির্বাচন ধর্মীতার প্রতিই ইঙ্গিত করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর কাজ অন্য সব উদ্দীপক থেকে শিক্ষকের বক্তব্য বিষয়কে আলাদা করে নিয়ে তার ওপর মনোনিবেশ করা। নির্বাচনধর্মিতার ওপর গুরুত্ব দিলে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল মনোযোগের ক্ষেত্রটি কতটা প্রসারিত সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। কারণ পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি একাগ্র হয়ে শিক্ষকের চলাফেরা দেহভঙ্গি বা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখার প্রতি মনোনিবেশ করে তবে হয়তো শিক্ষকের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগ না থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রায়ই তা হয় না।

৮.৪.২ মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of Attention) :

মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কোনো কিছুর প্রতি গভীর মনোযোগ দিলে, মনোযোগের গভীরতা

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনোযোগের স্বল্পতাজনিত ব্যধি (Attention Deficiency syndrome) ভিন্ন কারণে আলোচিত হয় কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিক্ষণ প্রক্রিয়া সঠিক হলে বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি সঠিকভাবে প্রযুক্ত হলে মনোযোগের কোনো স্বতন্ত্র গুরুত্ব নেই। মনোবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) পরীক্ষাগারে মনোযোগ ছিল একটি প্রধান চর্চার বিষয়। অনেক সময় মনোযোগকে প্রায় চেতনার (Consciousness) সমার্থক বলে গণ্য করা হয়েছে। এখনও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ অন্যতম চর্চার বিষয়। কিন্তু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে এর স্থান সংকুচিত। সেজন্য আলোচ্য পাঠ্যাংশটিতে মনোযোগ সংক্রান্ত পুরানো ধারণাগুলি উল্লেখ করা হবে। সবশেষে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- মনোযোগের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মনোযোগের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মনোযোগের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত নির্ধারক শর্তগুলির বর্ণনা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।
- মনোযোগের সনাতন তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- মনোযোগের আধুনিক মতবাদ বলতে পারবেন।

৮.৩ মনোযোগের সংজ্ঞা (Definition of Attention)

দুটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোযোগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মনোযোগের চর্চায় মনোবিজ্ঞানের আদি পর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মনোযোগকে মানসিক ক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিক থেকে মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক ক্রিয়া যার সাহায্যে উদ্দীপকের একটি বিশেষ অংশকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষণ করা ও জানার জন্য চেতনাকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত করা হয়। (Attention is mental function or process by which the consciousness is focussed on a small segment of stimulus for better perception and Knowledge)।

সুতরাং আমাদের চারপাশের অসংখ্য উদ্দীপকমালার মধ্যে অংশ বিশেষের পর চেতনাকে সংহত করার মধ্যে দিয়ে আমরা ঐ অংশ বিশেষ সম্বন্ধে আরও ভালো করে জানার জন্য যে মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করি তাই হল মনোযোগ। এই সংজ্ঞার মধ্যে যে কথাটি নিহিত আছে, তা হল কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করলে, আর সবকিছু ক্রমশ চেতনা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ মনোযোগ একটি নির্বাচনী মানসিক ক্রিয়া এবং এই নির্বাচন যতই সংকীর্ণ হতে থাকবে ততই আমাদের প্রত্যক্ষণজনিত জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাবে।

এই ধারণাটি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। একমাত্র গভীরতম মনঃসংযোগের (Deep

একক ৮ ❑ শিক্ষার্থীর মনোযোগ (Learner's Attention)

গঠন

8¿1 ¼÷æì **(Introduction)**

8¿2 Åí ! Ðö **(Objectives)**

8¿3 âíæìíöìíùë ¼¤Úì **(Definition of Attention)**

8¿4 âíæìíöìíùë «ôèç **(Nature of Attention)**

8¿4¿1 âíæìíöìíùë èæûì÷æÓèâçì **(Selective nature of Attention)**

8¿4¿2 âíæìíöìíùë èû÷Üæ **(Fluetuation of Attention)**

8¿4¿3 âíæìíöìíùë èûíóìÜæ **(Oscillation of Attention)**

8¿4¿4 âíæìíöìíùë èûíx»ËÓèâçì **(Analytical property of Attention)**

8¿4¿5 âíæìíöìíùë «ôìëíÛó **(Types of Attention)**

8¿4¿6 âíæìíöìíùë øèë¼ë **(Span of Attention)**

8¿5 âíæìíöìíùë èæÓìëô Ðç **(Determinats of Attention)**

8¿5¿1 ûìèðöô ûì û·t·ùç èæÓìëô **(External or Objective Conditions)**

8¿5¿2 ì Ûö·QëéË ûì ûöèkùç èæÓìëô **(Internal or Subjective Conditions)**

8¿6 âíæìíöìíùë ç+ **(Theories of Attention)**

8¿6¿1 ûõíûí`åë ç+ **(Broadbent's Theory)**

8¿6¿2 ¼@øóû-åíæë ç+ **(Resource allocation Theory)**

8¿6¿3 âíæìíöìíùë ì ìÓèæô âçûìó **(Modern views of Attention)**

8¿7 «xìûèÜ **(Questions)**

৮.১ সূচনা (Introduction)

একথা ঠিক যে শিক্ষার্থীর মনোযোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত পুস্তক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে মনোযোগের কোনো স্বতন্ত্র স্থান প্রায় নেই বলতে গেলেই চলে। এর কারণ মনোযোগ মানুষের প্রজ্ঞামূলক মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার একটি

শ্রেণিকক্ষে প্রেষণার তত্ত্বগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা ও শিক্ষাবিদরা গবেষণা করেছেন। এইসব গবেষণার সারকথা হল—

(১) শ্রেণিকক্ষের পরিমণ্ডল (Classroom Climate) নিয়ন্ত্রণ।

(২) বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থির করায় সহায়তা করা ও দলগত সাফল্যের দিকে জোর দেওয়া।

(৩) পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য, মূল্যায়ন ও পুরস্কার পূর্বাহ্নেই স্থির করে নেওয়া।

(৪) পঠন-পাঠনকে মনোগ্রাহী করে তোলার সচেতন প্রয়াস।

(৫) ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাফল্য অর্জনে সহায়তা করা।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত সাফল্যের চাহিদা জাগ্রত করার চেষ্টা।

(৭) সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা।

(৮) প্রকাশ্য মূল্যায়ন।

(৯) ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব না দেওয়া।

(১০) নিবিড় শিক্ষণের লক্ষ্য (Instructional objectives) স্থির করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ।

৭.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) প্রেষণা বলতে কী বোঝেন?

(২) নিরাপত্তার চাহিদা কী?

(৩) আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বলতে কী বোঝায়?

(৪) প্রেষণা কাজের অনুপ্রেরণার উৎস—যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

(৫) সাফল্যলাভের প্রেষণা বলতে কী বোঝেন?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) প্রেষণার সংজ্ঞা দিন। প্রেষণার তত্ত্বগুলি আলোচনা করুন।

(২) এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন্ তত্ত্বটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

(৩) শ্রেণিকক্ষে প্রেষণার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন।

হয়, যদিও বাড়িতে প্রথাগত শিখনের ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষকার্থীর মধ্যে সরাসরি প্রেষণার সঞ্চার করতে পারেন না। তিনি শুধুমাত্র পরিবেশও পরিস্থিতির আনুকূল্য সৃষ্টি করতে পারেন।

ম্যাসলোর তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের পরিমণ্ডল প্রেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ভয়মুক্ত, নিরাপদ আনন্দদায়ক পরিবেশ শিক্ষার্থীর ইতিবাচক প্রেষণার অনুকূল। তেমনি ভালোবাসার চাহিদা নিরাপত্তার চাহিদা পূরণের পরিপূরক। শিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা পূরণ হবে। কিন্তু এই চূড়ান্ত পূরণের পক্ষে প্রতিটি চাহিদাই পূরণ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রম, পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই একমাত্র শারীরবৃত্তীয় চাহিদা বাদে অন্য সব চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

জনসন (Johnson, 1991) ও স্লেভিন (Slavin, 1991) বলেছেন সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যক্তিমুখী লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের প্রেষণায় এবং সাফল্যে যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও দলগত প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার ও দলগত পুরস্কার ক্ষেত্র বিশেষে উভয়ই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

সহযোগিতামূলক শিক্ষার জন্য স্লেভিন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

(১) ব্যক্তিগত পুরস্কারের পরিবর্তে দলগত পুরস্কার।

(২) দলের মধ্যেও প্রত্যেকের সক্রিয়তা নিশ্চিত করা।

(৩) সাফল্যলাভের সমান সুযোগ।

(৪) ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দলগত প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দান।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক পরিমণ্ডল বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর প্রেষণা কমিয়ে দেয়, বিশেষত যাদের মধ্যে ব্যর্থতার আশঙ্কা বেশি।

আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তখনই অগ্রসর হবে যখন তার পূর্ববর্তী চাহিদাগুলি ধাপে ধাপে পূরণ হওয়ার প্রত্যাশা থাকবে। সাফল্যলাভের তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির প্রেষণা নির্ভর করে তার সাফল্যের আশা ও ব্যর্থতার আশঙ্কা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকার ওপর। কারণ নির্দেশক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেষণা নির্ভর করে কোনো মানুষ তার সম্ভাব্য সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে কী ধরনের ধারণা অগ্রিম পোষণ করে তার ওপর। প্রেষণার প্রতিটি শর্তই শ্রেণিকক্ষের শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন ব্রফি (J. Brophy) বলেছেন, শিক্ষার্থীর প্রেষণা বৃদ্ধি পায় যখন নির্ধারিত কাজটি তার পক্ষে মধ্যমরকম কঠিন বলে মনে হয়। তাঁর মতে নিরুদ্বেগ কিন্তু সাফল্যমুখী হলে প্রেষণা উপযুক্তভাবে নির্ধারিত হয় এবং প্রকৃতই সাফল্য আসে। তীব্র ও অতি উচ্চ প্রেষণা সাফল্য অপেক্ষা ব্যর্থতার কারণই বেশি।

শ্রেণিকক্ষের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশই প্রজ্ঞামূলক। সুতরাং সরাসরি পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলির কোনো স্বাভাবিক ভূমিকা নেই। কিন্তু উপযুক্ত প্রয়োগে এগুলি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। ব্রফির মতে গোপন মূল্যায়ন অপেক্ষা প্রকাশ্য মূল্যায়ন প্রেষণা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে অধিক সহায়ক। অতিমাত্রায় বেশি প্রেষণা মানুষকে সাফল্যের আবেগে তাড়িত করে ; ফলে ব্যর্থতাই আসে বেশি।

উদ্দীপক ভবিষ্যৎ আনন্দ বা যন্ত্রণার নির্দেশ দেয়। যে ধরনের উদ্দীপক অতীতে আনন্দের সন্ধান দিয়েছে সেগুলির দিকে ব্যক্তি এগিয়ে যায় আর যে ধরনের উদ্দীপক অতীতে যন্ত্রণার উৎস হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে ব্যক্তি সেগুলির নিকট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। সংক্ষেপে প্রেষণা সম্পর্কে ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের এই হল মূল বক্তব্য।

ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ড প্রেষণার তত্ত্বকে যে মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন অনুভূতিমূলক সক্রিয়তার মডেল (Affective arousal model) হিসেবে। আচরণ করে 'আনন্দ পাওয়াই ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য' এই মডেলটিতে এই বক্তব্যটিই বিধৃত।

ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণার (Achievement motivation) ওপর। যে সকল ব্যক্তি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো রকম পুরস্কারের তোয়াক্কা না করে নিজের উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান (সাফল্যলাভের) প্রেষণায় তারা উচ্চস্তরের বলে পরিগণিত হন। উচ্চতর (সাফল্যলাভের) প্রেষণা সেই সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায় যে সব পরিবারে ছেলে মেয়েদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রাথমিক ব্যর্থতায় মা-বাবা বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বিরক্ত না হয়ে বরং ধৈর্য-সহকারে তাদের প্রচেষ্টা বারংবার চালিয়ে যেতে আদেশ উপদেশ দেন। অর্জন (সাফল্য লাভের) প্রেষণা সম্পর্কে ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের বক্তব্যের এটি হল সারসংক্ষেপ। তাঁর মতে অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণা জন্মগত নয় বরং পরিবার ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেরণায় অর্জিত বিশেষ শক্তি— যে শক্তি ব্যক্তিকে উন্নীত করবে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে।

৭.৪.৪ জন্ অ্যাট্‌কিনসনের (সাফল্যলাভের) তত্ত্ব (John Atkinson's Theory of Achievement Motivation) :

কোনো বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির কিছু অর্জন করার বিশেষ **প্রবণতা** নিয়ে জন্ অ্যাট্‌কিন্‌সনের এই তত্ত্ব। এখানে ব্যক্তি বিশেষভাবে অবগত যে তার কর্মসম্পাদন (অর্জন) একটা উৎকর্ষমানের কর্মসম্পাদনের সঙ্গে তুলনা করে তার কর্মের মূল্যায়ন করা হবে। উল্লেখ্য এখানে ব্যক্তি নিজেও তার মূল্যায়ন নিজেই করতে পারে। অ্যাট্‌কিন্‌সনের মতে অর্জন প্রবণতা নির্ভর করে যা ব্যক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করছে তাতে বিফল হলে তা কতটা দুঃখজনক হবে কিংবা তাতে সফল হলে তা কতটা আনন্দদায়ক হবে তার ওপর। অ্যাট্‌কিন্‌স অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অতি সহজ কাজে সফল হলে তা খুব একটা আত্মসন্তুষ্টির কারণ হয় না বা বিশেষ কিছু অর্জন করা হয়েছে বলে ব্যক্তির কাছে মনে হয় না। অপরপক্ষে অতি কঠিন কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এই তত্ত্বের সার কথা হল অর্জন (সাফল্যলাভের) প্রেষণার উচ্চস্তরে যারা অবস্থিত তারা এমন কাজ নির্বাচন করে থাকে যা অতি কঠিনও নয় আবার অতি সহজও নয় অর্থাৎ তারা মাঝামাঝি ধরনের কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। পক্ষান্তরে যারা অর্জন প্রেষণায় নিম্নস্তরে অবস্থিত তারা ব্যর্থতার ভয়ে ভীত। এরা এমন নিম্নমানের কাজে আত্মনিয়োগ করবে যাতে ব্যর্থতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই কিংবা এমন কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করবে যাতে ব্যর্থ হলেও অন্য কেউ তাদের নিন্দা করবে না।

৭.৫ প্রেষণা ও শিখন (Motivation and Learning)

প্রধানত বিদ্যালয়ভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত

প্রয়াস (Effort) : ছাত্রের কোনো প্রাথমিক ধারণা থাকে না কতটা প্রয়াস কতটা সাফল্য এনে দেবে। ফলে সফল হলে সে মনে করে যারা তার থেকে কম সফল, তাদের থেকে সে বেশি প্রয়াসী হয়েছে আর এই জন্যই এসেছে সাফল্য। ফলে সে আরও বেশি প্রয়াসী হয়। এর দরুন একটা চক্রাকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাফল্য বৃদ্ধি করে পরবর্তী প্রয়াস, তাতে আসে আরও সাফল্য, তখন প্রয়াস আরও বৃদ্ধি পায়। আকস্মিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও এই তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ভাগ্য (Luck) : যদি অর্জিত লক্ষ্য ও আচরণের মধ্যে কোনো বোধগম্য সম্পর্ক খুঁজে না পাওয়া যায় তখন ভাগ্যের দোহাই দেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এই কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। অপ্রত্যাশিত ভালো পরীক্ষার ফল বা খারাপ ফলের কারণ অনেক সময় এই ভাবেই নির্দেশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা।

নির্ধারিত কাজের কাঠিন্য (Task Difficulty) : সাফল্য ও ব্যর্থতার দ্বারা নির্ধারিত কাজের কাঠিন্য বিচার হয়। যদি অনেকে সফল হয় তবে মনে করা হয় কাজটি সহজ বা যদি অনেকে ব্যর্থ হয় তবে মনে করা হয় কাজটি কঠিন। যদি কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত সাফল্য লাভ করে তবে তার মনে হয় বিষয়টি সহজ। অনুরূপভাবে ক্রমাগত ব্যর্থ হলে মনে হয় বিষয়টি কঠিন।

ওয়াইনারের এই তত্ত্বও শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

৭.৪.৩ ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের প্রেষণার তত্ত্ব (McClelland's Theory of Motivation) :

ডেভিড ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ড মারের (Murray) গবেষণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মারের গঠনমূলক পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি মানুষকে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক, মানুষের চাহিদার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও চাহিদার পরিমাপের দিকেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন মারের অনুপ্রেরণাতেই।

ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের প্রথম দিককার গবেষণামূলক কাজে ব্যক্তিত্ব, প্রেষণা, প্রলক্ষণ (trait) এবং স্কিমা (Schema) ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাঁর মতে মানুষ যেভাবে আচরণ করছে তা **কেন** সেইভাবে করছে তার নির্ধারক হল প্রেষণা। মানুষ **কীভাবে** আচরণ করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে তার নির্ধারক হল প্রলক্ষণ (frait)। স্কিমা হল পৃথিবী সম্বন্ধে ও ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে বিশেষ মনোভাব ও ধারণা। সংক্ষেপে বলা যায় প্রেষণা হল আচরণের কারণ, প্রলক্ষণ হল আচরণের কীভাবে প্রকাশ ঘটবে তার পদ্ধতি এবং স্কিমা হল নিজের ও অন্যের সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা।

প্রেষণা হল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস। প্রেষণাই ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণের মূল চাবিকাঠি। ম্যাক্‌ক্লিল্যান্ডের মতে বাহ্যিক জগতের উদ্দীপকসমূহ অনুষঙ্গের আকারে আমাদের অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গরম চুল্লি যে ভয়ের উদ্রেক করে তার কারণ অতি উত্তাপ যন্ত্রণাদায়ক। যে সকল কাজ সফলতার সঙ্গে অতীতে সম্পাদিত হয়েছে তাদের সঙ্গে সদর্থক অনুভূতি (গর্ব) জড়িত। তেমনি যে সকল কাজ ব্যর্থতা এনে দিয়েছে তাদের সঙ্গে নঞর্থক অনুভূতি (লজ্জা) জড়িত। আনন্দমিশ্রিত উদ্দীপক বা কাজের দিকে আমরা সোৎসাহে এগিয়ে যাই আর দুঃখ যন্ত্রণা মিশ্রিত উদ্দীপক বা কাজের থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিই। অর্থাৎ অতীতের অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণের দিক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর দ্বারা এটি বোঝায় না যে অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা বা আবেগই প্রেষণা বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় আবেগ হল প্রেষণার ভিত্তি।

চতুর্থ স্তর, **আত্মপ্রত্যয়ের চাহিদা** (Self-esteem Need) — পূর্বোক্ত চাহিদাগুলি পূরণের মাধ্যমে, মানুষের নিজের সম্বন্ধে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। সে সচেতন হয় অন্যেরা যাতে তাকে যথেষ্ট মূল্য দেয় এবং নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, গুণাবলি ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা প্রত্যয় তাকে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে। শিক্ষার্থীরা এরই ফলে সাফল্যের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

পঞ্চম স্তর, **জ্ঞানার্জনের চাহিদা** (Need to Know)—এই স্তরে কি, কেন, কখন, কিভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজে মানুষ। সত্যানুসন্ধানে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ জ্ঞানান্বেষণ করে। 'যত দিন বাঁচি ততদিন শিখি' এই নীতির অনুসরণে আত্মতৃপ্তির জন্য মানুষের এই জ্ঞানান্বেষণ। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্যে শিক্ষালয়ে শিক্ষকের আশ্রয় নেয়।

ষষ্ঠ স্তর, **নান্দনিক চাহিদা** (Aesthetic Need)— মানুষ সুন্দরের পূজারী কেননা যা সত্য তাই সুন্দর এবং যা সুন্দর তা মঙ্গল প্রদায়ক। এই স্তরে মানুষ যা কিছু করে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে চায়, শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসংগঠিত ও সুসংহতভাবে করতে চায়। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। তাই ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের কাজ যাতে সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারে তার সুযোগ বিদ্যালয়ে করে দেওয়া অত্যাবশ্যক। সহপাঠক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নান্দনিক চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়।

সপ্তম স্তর, **আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা** (Self-actuatlization Need) — পূর্বোক্ত সমস্ত চাহিদা পূরণ হলেও মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে যায় যার ফলে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা কাল্পনিক চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা মানুষের জীবনের অধিকাংশকাল জুড়ে তাকে সক্রিয়তায় নিয়োজিত রাখে।

৭.৪.২ বার্নার্ড ওয়াইনারের কারণ নির্দেশক তত্ত্ব (Weiner's Attribution Theory) :

সাফল্যের চাহিদা থাকা এবং সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, কখনও সাফল্য এবং কখনও ব্যর্থতা আসবে। বার্নার্ড ওয়াইনার (Bernard Weiner) তাঁর কারণ নির্দেশক তত্ত্বে বলেছেন, সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই হোক মানুষ চায় তার কারণকে কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করতে। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তার ব্যর্থতার জন্য প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল, শিক্ষক আমাকে দেখতে পারেন না বা আমার পড়াটা ঠিকমত হয়নি এরকম একটা সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজতে চায়। এই কারণ নির্দেশ একটা আকস্মিক বা এলোপাতাড়ি ব্যাপার নয়। কারণ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও খাড়া করার চেষ্টা করা হয়। তা ছাড়াও, একবার কারণ নির্দেশ করা হয়ে গেলে তা তোমাদের পরবর্তী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ছাত্র যদি মনে করে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের জন্যই তার ব্যর্থতা এসেছে, তবে শিক্ষকের প্রতি তার বিরাগমূলক আচরণ দেখা দেবে।

কারণ নির্দেশক তত্ত্ব সাফল্যের চাহিদার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ওয়াইনার মনে করেন সাফল্য লাভের চাহিদা জাগ্রত হলে আমরা যে ফলাফলই লাভ করি না কেন তাকে চারটি উপাদানের কোনো একটির সঙ্গে সংযুক্ত করি। এগুলি হল—

সক্ষমতা (Ability) : ছাত্র যদি বার বার ব্যর্থ হয় তবে কারণ হিসেবে সক্ষমতাকেই দায়ী করতে পারে। বার বার অঙ্কে ব্যর্থ হয়ে সে মনে করতে পারে অঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার (Mathematical ability) অভাব, তাই সে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এতে অঙ্কের প্রেষণা কমে এবং সে অঙ্কের জন্যে চেষ্টা করা থেকে বিরত হয়।

actualization) কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এর অর্থ ব্যক্তির সুপ্ত সক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহার। এই অর্থে আত্মপ্রতিষ্ঠা একটি বিকাশমূলক ধারণা। মানুষে পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে যে সব চাহিদা পূরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ম্যাস্‌লো তাদের কয়েকটি ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যাস করেছেন।

প্রথম স্তর, **শারীরবৃত্তীয় চাহিদা** (Physiological Needs) —ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদি চাহিদাগুলি এই নিম্নস্তরে প্রবল। এই চাহিদাগুলি না মিটলে মানুষের শক্তির অভাব ঘটে ও পরবর্তী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তার সক্রিয়তা ব্যাহত হয়। দুর্বল শরীরে শিখন সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় স্তর, **নিরাপত্তার চাহিদা** (Security Need)—এই চাহিদার স্থান শারীরবৃত্তীয় চাহিদার উপরে। নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সুস্থিতি, ভয় ও উদ্‌বেগ থেকে মুক্তি ইত্যাদি মানুষের আত্মরক্ষার ও সক্রিয়তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। যে ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয় শিক্ষক বা সহপাঠীদের ভয় পায় অথবা যাদের পরিবারের নিরাপত্তার অভাব আছে তাদের পড়া শেখায় ব্যাঘাত ঘটে।

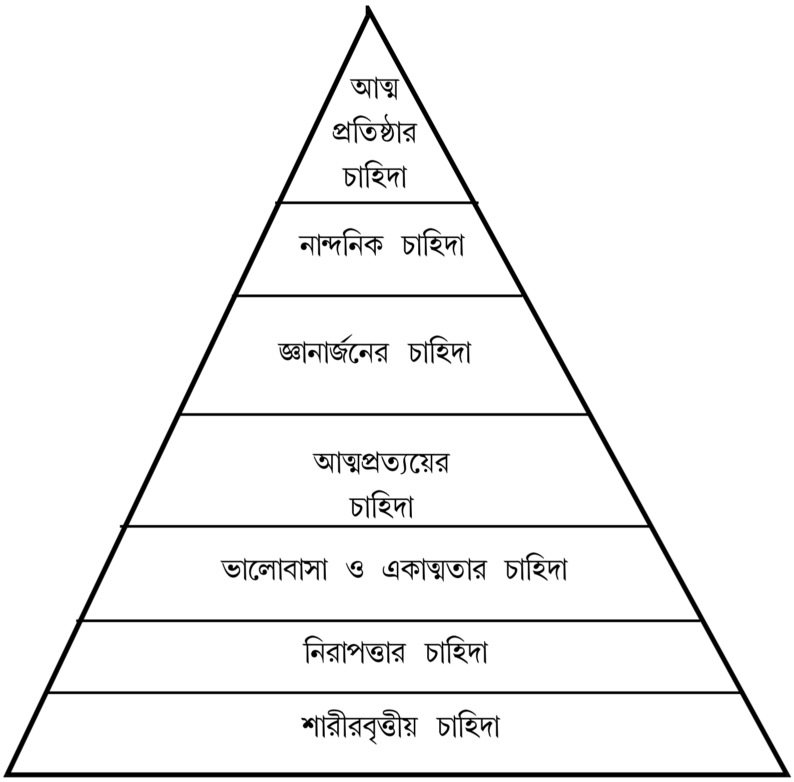

চাহিদার পিরামিড আকৃতির ক্রমোচ্চ পর্যায় এই চিত্রে দেখানো হল

তৃতীয় স্তর, ভালোবাসা ও একাত্মতার চাহিদা (Need for love and belongingness)—পরিবার, স্বজন, বন্ধু ইত্যাদি ও তাদের সঙ্গো পারস্পরিক ভালোবাসার আদানপ্রদানের চাহিদা এই স্তরের অন্তর্গত। মানুষ একা থাকতে পারে না। একাকিত্ববোধ থেকে সৃষ্টি হয় সঙ্গালাভের চাহিদা। বিদ্যালয়, সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গো একাত্মতাবোধ না করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না।

- প্রেষণার প্রবৃত্তিবাদী তত্ত্ব বলতে পারবেন।
- প্রেষণার আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বলতে পারবেন।
- প্রেষণার কারণ নির্দেশক তত্ত্ব বলতে পারবেন।
- ম্যাক্ক্লিল্যান্ড ও অ্যাট্কিনসনের তত্ত্ব বলতে পারবেন।

৭.৩ প্রেষণার ধারণা (Concept of Motivation)

ওয়াইনার (Weiner, 1990) প্রেষণার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রেষণা হ'ল এমন একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা আমাদের বিশেষ একটি কাজে উদ্বুদ্ধ করে, কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী করে এবং লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের কাজে ব্যাপৃত রাখে।

এই সংজ্ঞা থেকে প্রেষণার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়।

১। প্রেষণা মানুষের সক্রিয়তা ও সক্রিয়তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বাড়ায়।

২। প্রেষণা মানুষের আচরণকে কোনো লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করে।

৩। প্রেষণা শুধুমাত্র বিশেষ সক্রিয়তায় প্ররোচিত করে না, সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য শেষ পর্যন্ত সক্রিয় রাখে।

৪। প্রেষণা কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রয়োজন মত সক্রিয় রাখে বা নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন, মনোযোগ, স্মৃতি, শিখন ইত্যাদি)।

প্রেষণা মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। সুতরাং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রেষণার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু কেউ অন্য কোনো মানুষকে জোর করে বা ইচ্ছামত প্রেষণার বশবর্তী করতে পারে না। যেমন, প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করার প্রেষণা প্রবল হল। কিন্তু খাদ্য পাওয়ার পর দেখা গেল তা অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন। প্রবল ক্ষুধা সত্ত্বেও প্রেষণা হ্রাস পেল।

৭.৪ প্রেষণার তত্ত্ব (Theories of Motivation)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিগত একশত বৎসরে প্রেষণার অনেক তত্ত্ব বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা পরিবেশন করেছেন। উইলিয়াম জেম্স ও ম্যাকডুগাল (William James and McDougall) যে তত্ত্বের কথা বলেন তার নাম সহজাত প্রবণতার তত্ত্ব (Instinct Theory)। তারপর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ভিত্তিতে, সামাজিক ভিত্তিতে এবং প্রজ্ঞামূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রেষণার। তার সবকিছু আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধুমাত্র চারটি তত্ত্বের কথা এখানে উল্লেখ করা হবে।

৭.৪.১ আত্মপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব (Theory of Self actualization) :

এই তত্ত্বের জনক আব্রাহাম ম্যাস্লো (Abraham Maslow)। তিনি তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self

একক ৭ ❑ শিক্ষার্থীর প্রেষণা (Learner's Motivation)

গঠন

7¿1 ¼÷æì **(Introduction)**

7¿2 Åí ! Ð **(Objectives)**

7¿3 v«»Ëìë ÓìëËì **(Concept of Motivation)**

7¿4 v«»Ëìë ç+ **(Theories of Motivation)**

- 7¿4¿1 Ì ìK«èçVìë ç+ **(Theory of Self-actualization)**
- 7¿4¿2 ßúìÈæìíëë ôìëË èæíóÐô ç+ **(Weiners Attribution Theory)**
- 7¿4¿3 âìôèôÜìíwë v«»Ëìë ç+ **(MeClelland's Theory of Motivation)**
- 7¿4¿4 äæ Ì ìåèôæ¼íæë ¼ìØÜÜìíÛë ç+ **(John Atkinsons Theory of Achievement Motivation)**

7¿5 v«»Ëì ß èÐÔæ **(Motivation and Learning)**

7¿6 «xìûèÜ **(Questions)**

৭.১ সূচনা (Introduction)

যে-কোনো প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যা হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর কাছে সেটা অর্জন করার জন্য একটা অভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা তাগিদ কাজ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আচরণটি সম্পন্ন হবে না বা আচরণের মধ্যে একটা সংহতি ও ধারাবাহিকতা আসবে না। পাখিরা বাসা বাঁধে, প্রাণীরা খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, হস্তিমুখের দখল নেওয়ার জন্য দুই দাঁতাল হাতির লড়াই হয়, মানুষ সন্তান প্রতিপালন করে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এসব কাজ করার জন্য তাদের কেউ বড়ো একটা বাধ্য করে না, অন্তরের তাগিদে স্বেচ্ছায় তারা এই রকম অসংখ্য কাজ করে। এই অভ্যন্তরীণ তাগিদটা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। কখনও শুধুই শারীরিক তাগিদ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা আবার কখনও আত্মরক্ষার তাগিদ, কখনও বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পাওয়ার তাগিদ। এই তাগিদের সাধারণ নাম হল প্রেষণা (Motivation)।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। প্রতিভাবান শিশু কাদের বলা হয়?

৪। মানসিক প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিন।

৫। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৬। কী করে মানসিক প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করতে পারা যায়?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুর সংজ্ঞা দিন। তাদের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করুন।

২। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন পাঠ্যসূচির সমৃদ্ধিকরণ, শিক্ষাস্তরে ত্বরণ এবং বিশেষ শ্রেণিকরণের মধ্যে দিয়ে এই শিশুদের সমস্যা সমাধান সম্ভবপর। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৩। মানসিক প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা কী? তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) (For all Units)

1. Chauhan, S.S. (1997)—Advanced Educational Psychology (6th. Ed.), Vikas Publishing House, Pvt. Ltd., New Delhi.
2. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M. (1988), Exceptional Children (4th Ed), Prentice Hall International, Inc.
3. Kundu, C.L. and Tutoo, D.N. (2004), Educational Psychology, Sterling Publisher Pvt. Ltd.
4. Sharama, R. N. and Sharma, R. K. (2002), Educational Psychology, Atlantic Publishers and Distributors.
5. রায় সুশীল, (অষ্টম সংস্করণ-১৯৯৬-৯৯), শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৯।
6. সেনগুপ্ত, প্রমোদ বন্ধু, হালদার, গৌরদাস রায়, ঋতেন্দ্র কুমার (১৯৯৩-৯৪), শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯।

অপরের সঙ্গো যোগাযোগ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই ছয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে সহজতমভাবে শুরু করে ধাপে ধাপে এই সমস্ত দক্ষতাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে তারা তাদের নিজস্ব কাজকর্মগুলি অপরের সাহায্য ছাড়াই সম্পাদন করতে পারে। আর বৃত্তিমূলক দক্ষতার দিকে নজর দিতে গেলে তাদের বৃত্তির প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এই শিশুদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয় এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়।

মৃদু মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম। কিন্তু তাদের শিক্ষা প্রথম থেকে সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গো করালে অনেক অসুবিধা হয়। তাই প্রাক্ প্রাথমিক পর্যায়ে এই শিশুদের শিক্ষার প্রস্তুতি পর্বে কিছু দক্ষতার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন। যেমন, ধীর, স্থির হয়ে বসা, কথায় ও কাজে মনোযোগ দেওয়া, নির্দেশ মত কাজ করা, শ্রবণ ও দর্শন উদ্দীপকের পার্থক্য করা, ভাষার বিকাশ ও অন্যের সঙ্গো কথপোকথন করা, সমবয়সিদের সঙ্গো মেলামেশা করা, নিজের কাজ নিজে করা ইত্যাদি। এই দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে।

সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গো পড়াশোনা করতে গেলে সাধারণত দুই শ্রেণি নীচুতে পড়াশোনা করতে পারে। সুতরাং এই সময়ে পূর্বোক্ত দক্ষতাগুলি করায়ত্ত হয়ে গেলে প্রকৃত বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে মনোযোগ দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরে একটু বেশি বয়সে পৌঁছালে এই শিশুদের দক্ষতার প্রস্তুতি বন্ধ করে দিয়ে পাঠ্যসূচিতে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা হয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয় যাতে করে ভবিষ্যৎ জীবনে রুটি রোজগার করে এই শিশুরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রসঙ্গো একটা কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধীদের মূলস্রোতে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেলায় তার অন্য হওয়ার কথা নয়। তাই কিছু কিছু দেশ এই পথ ধরে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গো একই বিদ্যালয়ে রিসোর্স কক্ষে ভ্রাম্যমান শিক্ষকের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করেছে। আবার কিছু দেশ মূলস্রোতে ফেরাতে অনীহা না থাকলেও তারা মনে করে প্রগতির সাথে স্বাভাবিকীকরণ, সমন্বয়সাধন জনপ্রিয় ব্যবস্থা হলেও মানসিক প্রতিবন্ধীর মাত্রা অতিরিক্ত হলে বিশেষ বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত বিশেষ শিক্ষা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এখন সমন্বয়ের চেষ্টা সেরকম ভাবে অগ্রসর হয়নি। বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু আছে। এই শিশুদের ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ধৈর্য সহকারী বাস্তবধর্মী কৌশল প্রয়োগ করে জনগোষ্ঠী থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন না করে তাদের সমাজের একজন করে তুলতে হবে। এই দায়িত্ব বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার দ্বারাই সম্ভবপর।

১০.৬ প্রশ্নাবলী (Questions)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ব্যতিক্রমী কারা ?

২। প্রতিভাবান শিশু কীভাবে বোঝা যায় ?

পারে না। তাই অভিভাবকদের মাধ্যমে তাদের পরিণমনের দিক নির্ণয় করে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

(গ) ক্রমবিকাশ ইতিহাস সংগ্রহ (Collection of Case History) : এই শিশুদের চিহ্নিত করার জন্য ক্রমবিকাশ ইতিহাস সংগ্রহ একটি অতি আবশ্যক অংশ। এই তথ্য সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে তাদের বিকাশ ধারার সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় যার মাধ্যমে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়।

১০.৬.৪. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mentally Retarded Children) :

মানসিক প্রতিবন্ধীদের শ্রেণিগত পার্থক্য আছে। তাই অনেকে মনে করেন এই শ্রেণিগত পাথক্যের জন্য তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এটা ঠিক নয়, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের এই শ্রেণিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনেক মিল পাওয়া যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

(i) দৈহিক বৈশিষ্ট্য—স্বাভাবিক শিশুদের থেকে মানসিক শিশুদের দৈহিক বিকাশ অত্যন্ত মন্থর গতিতে হয়। পেশি সমন্বয় ত্রুটিপূর্ণ এবং শ্লথ গতি দেখা যায়। অনেকের মধ্যে চোখ, নাক, কান এবং বাচন ক্ষমতার ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

(ii) মানসিক বৈশিষ্ট্য — এই শিশুদের বুদ্ধিমত্তার অভাবই প্রধান। অমূর্ত চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ ক্ষমতা নাই বললেই চলে। কৌতূহল, যুক্তিক্ষমতা, যথাযথ ভাষা প্রয়োগ, মনোযোগের অভাব, ধীর স্থির হয়ে বসার অভাব লক্ষ করা যায়।

(iii) সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য— সামাজিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করার ক্ষমতা না থাকায় এই শিশুদের সামাজিক বিকাশ তাদের বয়সের থেকে অনেক কম হয়। আর কোন্‌টা নৈতিক, কোন্‌টা অনৈতিক এই বিচর করার শক্তি তাদের থাকে না। বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্র বিচার করে ওঠার শক্তি না থাকায় সাধারণত মেলামেশা করতে ভালোবাসে না।

১০.৫.৫. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা (Educational Programme of the Retarded Children) :

বিশেষ শিক্ষাপ্রণালী অতি তীব্র এবং তীব্র প্রতিবন্ধকতায় বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না। তার কারণ বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি এতই কম যে মোটামুটিভাবে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা পরিমাণ না থাকারই সমান। কিন্তু তাও এই অতি তীব্র এবং তীব্র প্রতিবন্ধকতার শিকার যে শিশুরা তাদের সামগ্রিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Persondised) শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে এই শিশুদের সংবেদন সঞ্চালন উদ্দীপনা, শারীরিক বিকাশ, নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং অভ্যাস তৈরি, পারস্পরিক উত্তর-প্রত্যুত্তর পরিচিত ব্যক্তিতে চেনা ইত্যাদি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা হয়। এই শিক্ষার পরের পদক্ষেপ শারীরিক গতিশীলতা, ভাষার বিকাশ—নাম শুনে ব্যক্তি বা বস্তুকে চিহ্নিত করা, নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ইত্যাদি শিক্ষার চেষ্টা যাকে বিদ্যালয়ের স্তর বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক স্তরে আর একটু কঠিন সংবেদন সঞ্চালন সমন্বয় যেমন বাছাই করা, স্থানান্তর করা, ভাঁজ করা, শারীরিক দক্ষতা, নিজের য-নেওয়া—নিজের কাজ নিজে করা, কথা বলার দক্ষতা—অন্যের কথা শোনা, উত্তর দেওয়া এবং নিজের কাজ নিজে করা ইত্যাদি।

মধ্যম মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রমে সাধারণত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। সেই কাজগুলি হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করা, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত, শরীরশিক্ষা, কাজ চালানোর মত বিদ্যালয়ে শিক্ষা,

নিরাপত্তা, পড়াশোনা, অবসর বিনোদন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রতিযোজ ক আচরণেও সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায় তারাই হল মানসিক প্রতিবন্ধী, এই অবস্থার নাম মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেটি অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধকতা মানে হল, "একজন ব্যক্তির মনের অসম্পূর্ণ বা বাধাপ্রাপ্ত বিকাশ, যার মূল বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের চেয়ে কম বুদ্ধিমত্তা।"

১০.৫.২. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Mentally Retarded Children) :

৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের সেই মানুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধ্যঙ্ক বলা হয়। যদি কারুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০-এর নীচে এবং ৭০-এর উপরে হয় তবে সেই মানুষকে প্রান্তিক অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়। বুদ্ধ্যঙ্কের বিচারে এই সমস্ত শিশুদের একটু চেষ্টা করলে স্বাভাবিক শিক্ষা দেওয়া যায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনও করতে পারে। কিন্তু যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০-এর নীচে তাদেরই মানসিক প্রতিবন্ধী হিসাবে ধরা হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ৭০-এর নীচে বুদ্ধ্যঙ্ক শিশুদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) বুদ্ধ্যঙ্ক ২০—২৫-এর নীচে — অতি তীব্র প্রতিবন্ধকতা (Profund)

(২) বুদ্ধ্যঙ্ক ২০—২৫ থেকে ৩৫—৪০ — তীব্র প্রতিবন্ধকতা (Severe)

(৩) বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৫—৪০ থেকে ৫০—৫৫ — মধ্যম প্রতিবন্ধকতা (Moderate)

(৪) বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০—৫৫ থেকে ৭০ — মৃদু প্রতিবন্ধকতা (Mild)

২০—২৫-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা অতি তীব্র প্রতিবন্ধকতার শিকার। এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। জন্মাবস্থা থেকে এই শিশুদের জীবনে নেমে আসে অক্ষমতা এবং এদের পরনির্ভরশীল জীবনযাপন ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০—২৫ থেকে ৩৫—৪০-এর নীচে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজ চালানোর মত কিছু কৌশল শেখানো যায় যাতে পরনির্ভরতার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পায়। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৫—৪০ থেকে ৫০—৫৫-এর নীচে, যাদের বলা হয় প্রশিক্ষণযোগ্য (trainable)। এদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালানোর শিক্ষার সঙ্গো কিছু সাধারণ বৃত্তিমূলক কাজ শেখানো যায়। ৫০—৫৫ থেকে ৭০-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক সেই সব শিশুদের শিক্ষণযোগ্য (educable) বলা হয়। এরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হয় না। এদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

১০.৫.৩ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Mentally Retarded Children) :

এই শিশুদের দৈহিক বিকাশের হার খুবই শ্লথ গতি। শিশুদের বিকাশধারার প্রতি সেজন্য সমস্ত পিতা-মাতার লক্ষ রাখা উচিত এবং ত্রুটি নজরে এলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মনোবিদদের সঙ্গো যোগাযোগ করলে অতি সহজেই তাদের চিহ্নিতকরণ করা যায়। সাধারণত নিম্নলিখিত ভাবে এই শিশুদের চিহ্নিতকরণ করা হয়।

(ক) বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ (Application of Intelligence Test) প্রমিত করা বুদ্ধি অভীক্ষা ভাষাযুক্ত বা ভাষাবিমুক্ত অভীক্ষা প্রয়োগ করে এই শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করে সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব হয়।

(খ) সামাজিক পরিণমন অভীক্ষা প্রয়োগ (Application of Social Maturity Test) : অনেক সময় এই শিশুরা যথাযথ প্রশ্নের উত্তর ও নির্দেশ বুঝে উঠতে পারে না। তাই বুদ্ধি অভীক্ষা সব সময় সার্থক রূপ নিতে

বলেছেন। তারই ফসল হচ্ছে মডেল স্কুল বা নবোদয় বিদ্যালয় ইত্যাদি। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (IIT) গুলি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (IIM) গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্টর ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার সহজে করা যায় তা, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নির্বাচিত হতে হয় এবং বহু অর্থ ব্যয়ে উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ বিদ্যালয় বা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করে নি। কারণগুলি নীচে তুলে ধরা হচ্ছে।

১। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যয়সাধ্য প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ গ্রহণ করতে পরে না।

২। নির্বাচন পদ্ধতি সর্বত্র প্রশ্নাতীত নয়।

৩। অহমিকাবোধ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মগরিমাসম্পন্ন কিছু মানুষ তৈরি হয় যারা সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে।

৪। অনেকেই দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে বসবাস করে। ফলে বহু ব্যয়ে শিক্ষিত প্রতিভাবানদের প্রতিভা ভোগ করে অন্য দেশের মানুষ।

৫। এই প্রতিভাবানদের সৃজনশীল বৈজ্ঞানিকও প্রযুক্তিগত কার্যকলাপের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরিশেষে, এই কথা বলা যায় এখনও এই উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি।

১০.৫ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা (Education of the Retarded Children)

যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া তাদের শিক্ষা ধারা নিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন। কারণ সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এই ছেলেমেয়েরা এতটাই পিছিয়ে পড়া, যে সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গো তাল দিয়ে কোনো ক্ষেত্রেই চলতে পারে না। তাই শিক্ষাবিদরা এই মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—তারই রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে এই অংশে।

১০.৫.১. মানসিক প্রতিবন্ধীকতার অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Mental Retardation)

বেশির ভাগ মানুষই মনে করে থাকেন মানসিক প্রতিবন্ধকতা একটা অসুখ। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা কোনো অসুখ নয়, এটা অবস্থান। এই প্রতিবন্ধকতার শিকার যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা বয়স অনুপাতে বাড়ে না, ফলে স্বাভাবিক সমবয়সী সব ছেলে মেয়েদের থেকে সর্বক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে। সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গো মিলেমিশে, কাজকর্মে ব্যস্ত থেকে জীবনযাপন করতে পারে না। তাদের নিজেদের একটা জগৎ তৈরি হয়। যার কিনারা খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই সমস্ত ছেলে মেয়েদের মানসিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানীরা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং বহুল প্রচলিত সংজ্ঞাটি উপস্থাপন করেছে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল রিটার্ডেসন (AAMR)। এই সংজ্ঞাটি তুলে ধরা হল : বর্তমান অবস্থায় কাজকর্মে যথেষ্ট অক্ষম এবং সেই সঙ্গো স্বাভাবিকের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতি অল্প। তা ছাড়া অন্যের সঙ্গো যোগাযোগ স্থাপন, নিজের পরিচর্যা নিজে করা, পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গো মিলেমিশে বসবাস করা, সামাজিক তৎপরতা, নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও

(২) শিক্ষাস্তরে ত্বরণ (Grade Accelaration)

(৩) বিশেষ শ্রেণি (Special Class)

(১) পাঠ্যসূচির সমৃদ্ধিকরণ (Enrichment of Syllabus) :

শিক্ষাবিদরা বলেছেন যদি পাঠ্যসূচি সমৃদ্ধিকরণ হয় তাহলে এই শিশুরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। তাঁদের বক্তব্য পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন উভয়েই উপকৃত হতে পারে। অর্থাৎ পাঠ্যসূচিতে কঠিন বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। যাতে করে প্রতিভাবান শিশুরা সেই বিষয়ে মনোনিবেশ ঘটিয়ে তাদের কৌতূহল ও জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাতে পারে। আর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও তাদের পড়াশোনা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে চালিয়ে যেতে পারবে। একই সঙ্গে দুই ধরনের ছাত্রছাত্রীকে পরিচালনা করতে শিক্ষক-শিক্ষিকার কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ প্রতিভাবান শিশুর সংখ্যা তো বেশি নয়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে তারা বেশি উপকৃত হচ্ছে না কারণ সংখ্যায় যারা বেশি তাদের দিকেই শিক্ষকেরা বেশি মনোনিবেশ করেন। সুতরাং শ্রেণিকক্ষে যে পরিবেশ থাকা উচিত সেই শ্রেণিকক্ষে তৈরি হয় নানা সমস্যা। ফলে যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা তারাই পড়াশোনার আগ্রহ ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। তাদের পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপর অনীহা তৈরি হতে থাকে। নষ্ট হয়ে যায় তাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রেরণা।

(২) শিক্ষাস্তরে ত্বরণ (Grade Accelaration) :

কিছু শিক্ষাবিদের ধারণা এই প্রতিভাবান শিশুদের সর্বস্তরের বিকাশ ধারা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং এদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তাই বিষয়বস্তু স্মরণে রাখতে কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং একশ্রেণি বা দুইশ্রেণি উঁচুতে এই ছেলে মেয়েদের পড়ার সুযোগ দিলে তারা তাদের মানসিক ক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনেও কোনো অসুবিধা হবে না।

কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে এই ধরনের ছেলে মেয়েদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের উন্নতির চেয়ে বিঘ্নিত হচ্ছে বেশি মাত্রায়। কারণ বেশি বয়সের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে পড়তে গিয়ে তাদের সামাজিক অভিযোজন ও মানসিক পরিপক্বতা আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। উন্নতির পরিবর্তে তারা সাধারণ মানে নেমে আসছে। ফলে এই শিক্ষাস্তরে ত্বরণ প্রক্রিয়া এই ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সার্থক রূপ নিতে পারেনি বরং প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে।

(৩) বিশেষ শ্রেণি (Special Class) :

আবার কিছু শিক্ষাবিদ বিশেষ শ্রেণিকক্ষে এই উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের একত্রিত করে পড়াশোনার সুপারিশ করেছেন। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন পৃথক শ্রেণিকক্ষে সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে আলাদা করে উন্নত মানের পাঠ্যসূচি প্রয়োগ করা সম্ভব এবং এই প্রতিভাবান শিশুরা দ্রুত হারে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, তাদের চাহিদা পূর্ণ হবে এবং মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে। এই পদ্ধতিতে হয়তো তাদের শিক্ষাগত মান উন্নত হতে পারে কিন্তু সাধারণের সঙ্গে মেলামেশায় ঘাটতি ঘটবে। ফলে সামাজিক অভিযোজনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। তার ফলে সমাজজীবনে নানারকম সমস্যা তৈরি হয়। আধুনিক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিভাবান শিশুদের জন্যও সমৃদ্ধ শ্রেণিকক্ষের (Resource Room) কথা বলা হয়েছে। এতে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে, প্রতিভাবন শিশুরা দিনের কিছুটা সময় এই বিশেষ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষালাভ করে তাদের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম হবে।

এই তিন ধরনের পদ্ধতি ছাড়াও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এদের জন্য উচ্চমানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা

(গ) ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা প্রয়োগ (Application of Personlity Test) :

এই অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিভাবান শিশুদের আত্মবিশ্বাস, সংকল্প, সংযম, রুচি, প্রবণতা নির্ধারণ করা সম্ভব, যা প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভীক্ষা আছে যা দিয়ে প্রতিভাবান নির্ধারণ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৃজনশীলতার অভীক্ষা (Crcativity Tests), বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা (Special Aptitude Tests) ইত্যাদি। অবশ্য এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজনে অভীক্ষা প্রয়োগ করবেন। অভীক্ষা প্রয়োগ ছাড়াও প্রতিভাবান শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করেও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হতে পারে।

১০.৪.৩. উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Gifted Children) :

সমস্ত প্রতিভাবান শিশুরা একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা কিন্তু নয়। কারণ হিসাবে বলা যায় ব্যক্তিগত বৈষম্য। কিন্তু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রতিভাবান শিশুদের :

(১) বিকাশধারা দ্রুত গতিতে হয়—শারীরিক ও ভাষার।

(২) অদম্য কৌতূহল স্পৃহা।

(৩) স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়।

(৪) বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়।

(৫) প্রক্ষোভিক দিক থেকে সংযত এবং পরিপক্কতা দেখা যায়।

(৬) সমস্ত কাজেই বিশেষ মনোযোগ এবং নিজস্বতা দেখা যায়।

(৭) যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উচ্চমানের হয়।

(৮) সারাজীবন ধরে সৃজনশীল কাজের দক্ষতা বজায় থাকে।

১০.৪.৪ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা (Educational Programme of the Gifted Children) :

শিক্ষাবিদরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। প্রতিভাবান শিশুদের কী উপায়ে কী পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিভার বিকাশ ঘটান যায় তাই নিয়ে সমস্যা। ফলে নানা ধরনের প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কী ধরনের শিক্ষক শিক্ষিকা এদের পড়াবেন যার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার পরিপূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কী ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি এই ধরনের শিশুদের সম্পূর্ণ বিকাশের সাহায্য করবে আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কী ধরনের পাঠক্রম এই শিশুদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারবে। এটা সত্য এই ধরনের শিশুদের পড়ানোর জন্য পরিণত ও আত্মবিশ্বাসী শিক্ষকের প্রয়োজন যাঁরা এই শিশুদের মেধা বিকাশের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। শিক্ষকদেরও জ্ঞানের পরিধির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে করে এই শিশুদের কৌতূহল ও জ্ঞানের ক্ষুধা প্রশমিত করা যায়। সব ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের সহযোগিতা ও অন্তরঙ্গ মনোভাবের প্রয়োজন কিন্তু প্রতিভাবান শিশুদের ক্ষেত্রে আরও অধিক মাত্রায় তার প্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

প্রতিভাবান শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সেই রকম কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির রূপরেখা আছে বলে মনে হয় না, তবে শিক্ষাবিদরা কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন তা নিম্নে বিবৃত হল :

(১) পাঠ্যসূচির সমৃদ্ধিকরণ (Enrichment of Syllabus)

শিশুর শতকরা দুই ভাগ। সংখ্যা দেখে হয়তো খুব নগণ্য বলে মনে হবে কিন্তু এই দুই ভাগকে যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় এনে তাদের সার্বিক মানসিক বিকাশ ধারা বজায় রাখতে পারলে জাতীয় সম্পদের পথ মসৃণ হবে। এই প্রতিভাবানদের বোঝার জন্য তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তিনটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) বুদ্ধ্যঙ্ক [Intelligence Quotient (I.Q)] : সাধারণত বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী প্রতিভাবান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মনোবিদ প্রতিভা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণি নির্ধারণ করেছেন। এল. এম. টারমান (L.M. Terman) তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় ১৪০ কে প্রতিভাবানের বুদ্ধাঙ্কের নিম্নসীমা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আবার অনেক মনস্তত্ত্ববিদ ১১০-১৪০ এবং আরও বেশি বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রতিভাবানদের নিম্নসীমা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

(২) সামাজিক সম্ভাবনা (Social Potentiality) : সামাজিক নিরিখে অনেকে প্রতিভার বিচার করেন। উইটির (Witty) সংজ্ঞাতে তার দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল। "প্রতিভাবান শিশু তারাই যারা সঙ্গীত, শিল্প, নেতৃত্ব বা অন্যান্য ধরনের প্রকাশের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে চমকপ্রদ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে"। আর. ডব্লিউ. টাইলারের (R. W. Tyler) মতে, প্রতিভাবানশিশু তার সৃষ্টির পরিমাণ, হার ও মানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী।

(৩) পরিসংখ্যান (Statistical) : অনেক শিক্ষাবিদরা বলেন বুদ্ধিমত্তার ২% থেকে ৪% এর মধ্যে যারা পড়ে তারাই প্রতিভাবান। এল. এক্স. ম্যাগনিফিস (L. X. Magnifice) প্রতিভাবান শিশুদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

(i) বুদ্ধি অভীক্ষা অনুযায়ী যে শিশুর ক্ষমতা জনসংখ্যার ২.২ থেকে ৩.২-এর মধ্যে।

(ii) শিল্প ও বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট শাখায় যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সে প্রতিভাবান। আবার কিছু শিক্ষাবিদ অধ্যয়নের নিরিখে তাদের প্রতিভাবান মনে করেন যারা মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ ১৫% থেকে ২০% এর মধ্যে আছে।

১০.৪.২ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Gifted Children) :

জীবনের প্রারম্ভিক স্তরে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং মনস্তত্ত্ববিদদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি প্রতিভাবান শিশুদের চিহ্নিত করতে পারা যায় তা হলে এই শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারা সহজ হয়। এই চিহ্নিতকরণের বিজ্ঞানসম্মত মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যদি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সঠিক পথে এই প্রতিভাবানদের চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর।

(ক) বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ (Application of Intelligence test) : প্রথম পর্যায়ে তার বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজন। সঠিক বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা (Individual Intelligence Test) প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। তার সঙ্গে প্রয়োজনে যৌথ বুদ্ধি অভীক্ষাও প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কাজে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

(খ) আদর্শায়িত সম্পাদনী অভীক্ষা প্রয়োগ (Application of Standarised Achievement Test) :

(i) সম্পাদনী অভীক্ষা প্রয়োগের মধ্যে দিয়েও এই প্রতিভাবান শিশুদের চিহ্নিত করা যয়।

(ii) বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের ক্রম পুঞ্জিত নথির (Cumulative record) যেমন বিতর্ক সভা, সাহিত্য বা বিজ্ঞান আলোচনা বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই শিশুর চিহ্নিত করা যায়।

(iii) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনেকে প্রতিভাবান শিশুদের চিহ্নিত করেন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। এই প্রসঙ্গে মনোবিদ টারমানের বিশ্বাসটা তুলে ধরা যুক্তিযুক্ত। তাঁর মতে এই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা তিন ভাগের একভাগ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভাবান বলে চিহ্নিত করতে পারেন।

১০.৩ ব্যতিক্রমী শিশুর অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Exceptional Children)

ব্যতিক্রমী শিশুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। অনেকে এই ব্যতিক্রমী শব্দটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কখনও চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে শ্রেণিকরণ করা হয় আবার কখনও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করা হয়। যদিও ব্যতিক্রমী শিশুদের নানা ধরন আছে, কোনো কোনো মনোবৈজ্ঞানিক ব্যতিক্রমী শিশু বলতে বুঝিয়েছেন উন্নত বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন শিশুদের, আবার কারও কারও মতে বৌদ্ধিক বিকাশের দিক থেকে যারা খুব অবনত এবং শিক্ষায় বেশ অনগ্রসর।

ডব্লিও. এম. ক্রুইস্‌ স্যাঙ্ক—এর (W.M. Cruickshank) সংজ্ঞা অনুযায়ী "ব্যতিক্রমী শিশু দৈহিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে এতটা বিচ্যুত যে এই শিশুরা সাধারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে বিশেষ উপকৃত হয় না, বরং এদের জন্য বিশেষ পাঠদান পদ্ধতির অবলম্বন প্রয়োজন।"

মনোবিজ্ঞানীরা ব্যতিক্রমী শিশুর সংজ্ঞা নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন নি। কার্ক (Kirk) এই ব্যতিক্রমী শিশুদের একটি সামগ্রিক সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন তা তুলে ধরা হচ্ছে, "ব্যতিক্রমী শিশু হ'ল সে যে স্বাভাবিক বা গড় শিশুর মানসিক, দৈহিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে এতটাই পৃথক যে তার সর্বাধিক বিকাশের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের পরিবর্তন দরকার কিংবা বিশেষ শিক্ষা পরিসেবার দরকার কিংবা সাধারণ শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে অনুপূরক নির্দেশাবলির ব্যবস্থার দরকার।" এই ব্যতিক্রমী শিশুদের সাধারণত বৌদ্ধিক দিক থেকেই চিহ্নিত করা হয় এবং এই দিক বিচার করলে দেখা যায় একাংশ খুব অবনত আর অপরাংশ খুব উন্নত। শিক্ষার সার্বিক দিক দিয়ে দেখলে এই দুই ধরনের ব্যতিক্রমী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় খুবই ভিন্ন ধরনের। সুতরাং এই ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন।

১০.৪ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুদের শিক্ষা (Education of the Gifted Children)

যে-কোনো দেশের উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে মেধা নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষে এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। ভারতবর্ষকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভাকে যথাযথ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির যুগে এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মনোনিবেশ করতে পারলে ভবিষ্যতে সেই আলোক দিশা প্রজ্জ্বলিত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক মান আরও উন্নততর হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—ইতিহাস তাই বলে। এই প্রতিভাবান ছেলে মেয়েদের দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সময়োপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাদের যথার্থ বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভবপর হয়।

১০.৪.১ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান শিশুর অর্থ এবং সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Gifted Child)

প্রতিভার সংজ্ঞাকে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। এই প্রতিভাবান শিশুর সংখ্যা প্রায় সমগ্র

বর্তমানে শিক্ষা জগতে পরিমাপের প্রয়োগ হওয়ার ফলে দেখা যায় সাধারণের চেয়ে কিছু ছেলে বা মেয়ে উচ্চমানের আবার কিছু ছেলে মেয়ে নিম্নমানের। এই সাধারণ, উচ্চমানের ও নিম্নমানের শিশুদের যদি যে-কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রে (Normal Probability curve) উপস্থাপন করা যায় তা হলে ছবিটি দেখা যাবে এই রকম শতকরা ৬৮.২৬ এই সাধারণ শ্রেণি পড়বে আর শতকরা ১৫.৮৭ ভাগ এই দুই প্রান্তে পড়বে।

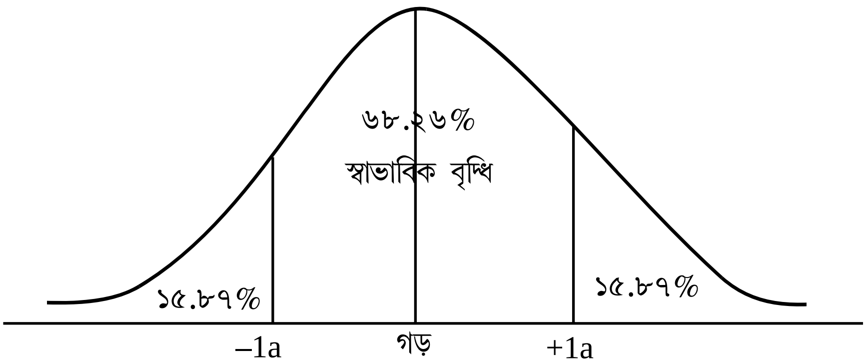

শিক্ষাবিজ্ঞানে বুদ্ধি পরিমাপের মাধ্যমে এই বৈষম্য নিরূপণ করা হয় কারণ বুদ্ধ্যঙ্কের (IQ) পরিমাপ স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম মেনে চলে। এই বণ্টনের মাঝের অংশে (৬৮.২৬%) যারা থাকে তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। এই বণ্টনের ডান দিকে যারা থাকে (১৫.৮৭%) তারা সাধারণের চেয়ে বেশি বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের বলা হয় উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু (Gifted Children) আর বাঁ দিকে (১৫.৮৭%) যারা থাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের থেকে কম বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের বলা হয় ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু। (Feeble-minded children) বা মানসিক প্রতিবন্ধী (Mentally Retarded & Children) সুতরাং যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যারা মানসিক প্রতিবন্ধী এই দুই বিপরীত মেরুর শিশুদের শিক্ষা প্রণালী এক ধরনের হতে পারে না। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে এদের শিক্ষার ভিন্নতর রূপরেখা। এই রূপরেখার সঙ্গে যাঁরা শিক্ষকতা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে আগ্রহী তাঁদের এই ব্যতিক্রমী শিশুদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই আলোচনা।

১০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- ব্যতিক্রমীর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ব্যতিক্রমীদের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন।
- ব্যতিক্রমীদের চিহ্নিতকরণ করতে পারবেন।
- ব্যতিক্রমীদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সম্যক ধারণায় পৌঁছাতে পারবেন।

একক ১০ ❑ ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা (Education of the Exceptional Children)

গঠন

10¿1 ¼÷æì (Introduction)
10¿2 Åí!Ðô (Objectives)
10¿3 ûôèç¹âé èÐ™ë ÌÇ ß ¼¤Úì (Meaning and definition of Exceptional Child)
10¿4 Å^ç ûèº¼@ø^ ûì «èçÛìûìæ èÐ™íóë èÐáì (Education of the Gifted Children)
10¿4¿1 Å^ç ûèº ûì «èçÛìûìæ èÐ™ë ÌÇ Íû¤ ¼¤Úì (Meaning and Definition of Gifted Child)
10¿4¿2 Å^ç ûèº ûì «èçÛìûìæ èÐ™íóë è÷èÿçôëË (Identification of Gifted Children)
10¿4¿3 Å^ç ûèº¼@ø^ ûì «èçÛìûìæ èÐ™íóë ¾ûèÐ,ô (Characteristics of the Gifted Children)
10¿4¿4 Å^ç ûèº¼@ø^ ûì «èçÛìûìæ èÐ™íóë èÐáìûôûòì (Educational Programmes of the Gifted Children)
10¿5 âìæè¼ô «èçûaéíóë èÐáì (Education of the Mentally Retarded Children)
10¿5¿2 âìæè¼ô «èçûaé èÐ™íóë vxèËèûÛìù (Classification of Mentally Retarded Children)
10¿5¿3 âìæè¼ô «èçûaé èÐ™íóë è÷èÿçôëË (Identification of Mentally Retarded Children)
10¿5¿4 âìæè¼ô «èçûaé èÐ™íóë ¾ûèÐ,ô (Characteristics of Mentally Retarded Children)
10¿5¿5 âìæè¼ô «èçûaé èÐ™íóë èÐáìûôûòì (Educational Programmes of the Mentally Retarded Children)
10¿6 «xìûèÜ (Questions)
10¿7 †pøèJ (Bibliography)

১০.১ সূচনা (Introduction)

একটা কথা প্রায়ই অনেকে বলে থাকেন যে এই শিশুটি যেন অন্য ভাই বা শিশুদের থেকে একটু আলাদা। এই তুলনা বিভিন্ন দিক বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়ে থাকে। এটা তো সত্যি যে কোনো দুটি শিশু এক রকমের নয়। তাদের মধ্যে নানা দিক থেকে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় সেটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত বৈষম্য। এই বৈষম্য যমজ ভাই বোনেদের মধ্যেও দেখা যায়।